প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের জীবনসংকট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

২০০৬

403773

Dhaka University Library

403773

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মোঃ জহিরুল ইসলাম

রেজি. ৪৩১/১৯৯৯-২০০০ (পুনঃ)

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ৮৬২৪৬৬৬
৯৬৬১৯০০-৫৯/৬০২১ (অ)
০১৫২৪১৪১৪৩ (মো)

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মোঃ জহিরুল ইসলাম**, আমার তত্ত্বাবধানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের জীবনসংকট' শীর্ষক বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোনো পরিচ্ছেদ এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয় নি অথবা এর অংশ-বিশেষ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নি বা প্রকাশ করার জন্য জমা দেয়া হয় নি। আমি অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

২৩/১১/২০০৮

(ড. সৌমিত্র শেখর)

ড. সৌমিত্র শেখর
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা ছোটগল্পের যে সার্থক রূপায়ণ ঘটেছিল সেই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে অনেক গল্প লেখক বাংলা সাহিত্যের এই ধারাকে ঋদ্ধ করার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। এঁদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, রাজশেখর বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল' (১৩৩০) পত্রিকা একটি নতুন সাহিত্যধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তিরিশের আধুনিকতার পথিকৃৎদের অনেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এঁদের অন্যতম। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) এই 'কল্লোল' পত্রিকার সাধনার একজন উত্তরসাধক।

403773

সাহিত্যশিল্পী হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী। কবিতা,গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সকল শিল্পমাধ্যমেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। তবে গল্পরচনার ক্ষেত্রে তাঁর সময় থেকে অদ্যাবধি এই শিল্পীর যে কীর্তি ও কৃতীর পরিচয় পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম ছোটগল্পগ্রন্থ *বেনামী বন্দর* ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকেই তাঁর ছোটগল্পে অভিনব আঙ্গিক, ভাষার নতুনত্ব ও শব্দ চয়নে অসাধারণ সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনকে বেছে নেন। নতুন যুগচেতনার চিহ্ন ও সাম্যবাদের প্রভাবও তাঁর ছোটগল্পে লক্ষ করা যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের তরুণ লেখকদের অন্যতম। সে সময়কার হতাশা ও নৈরাশ্য, অবসাদ ও শ্রান্তি, উজ্জ্বল স্বপ্ন ও গভীর সাহস, বিদ্রোহ ও বিহ্বলতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে আলোড়িত করেছিল। মূলত এমনি একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল রুশ বিপ্লব (১৯১৭), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সাম্যবাদী আন্দোলন (১৯১৯-১৯২১), মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বহু রাজনৈতিক কর্মির দণ্ড (১৯২৯), কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৮), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১), বাংলায় মার্কসের দর্শন ও ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের ব্যাপক প্রচারের ফলে।

বস্তুত নতুন যুগে অভাবিত ব্যথার কাঁপন নবীন সৃষ্টি দোলা জাগিয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের হৃদয়াসনে। লেখকের সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসে চরম অভিঘাত সৃষ্টি হয়। সেই অভিঘাত তাঁর লেখায় স্পষ্ট। একটি যুগ চেতনার প্রতীক ভঙ্গুরকালের চোরাবালিতে আশাহত বিক্ষুব্ধ তারুণ্যের আক্ষেপ আলোড়ন এবং প্রচ্ছন্ন উজ্জীবন-আকাঙ্ক্ষার সবটুকু নিয়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সামুদ্রিক বিস্তার। আর এই চিত্রপট সে সময়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে বিদ্যমান। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী তাঁর ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এই সংগ্রাম ও ব্যর্থতা বিচিত্র ভাষায় মধ্যবিত্তকে ঘিরে রচনা করেছেন গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুভবের মধ্যে যুগের এক অনির্দেশনীয় বেদনা পুঞ্জিত হয়েছিল। তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিকাশের ধারাবাহিকতায় যন্ত্রসভ্যতা বিকাশের ফলে অবিভক্ত বাংলাদেশে একটি ব্যাপক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণির মানুষের মনোযন্ত্রণা, চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য, হতাশা সর্বোপরি জীবনকে সার্বিকভাবে ভোগ এবং উপভোগ করার অতৃপ্তি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে উঠে এসেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প আকারে বড়। এটা তাঁর ছোটগল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও। বর্তমান অভিসন্দর্ভে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিভিন্ন গ্রন্থভুক্ত ছোটগল্প অবলম্বনে সেখানে মধ্যবিত্তের জীবনসংকটের প্রতিফলন অনুসন্ধান করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি অনেকের সহায়তা পেয়েছি। আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক সহযোগী অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরকে। তাঁর অধীনে আমি 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের জীবনসংকট' শীর্ষক গবেষণাকর্ম শুরু করি। এ কাজে তিনি অনেক মূল্যবান সময় নিয়ে আমাকে গবেষণা কাজে নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক উপদেশ, নির্দেশ ও সুচিন্তিত মূল্যায়ন-পরামর্শ এ অভিসন্দর্ভ রচনার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমার গবেষণাকর্ম সংশোধনে সহায়তা করেছেন। তাঁর এই ঋণ অপরিশোধ্য।

এই গবেষণা কাজে আমাকে প্রথমে উৎসাহ দান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন ও ঢাকা কলেজের শিক্ষিকা ফেরদৌসী মাহমুদা।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হকের প্রেরণা পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কাজে সফল হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ জানিয়ে আসছেন আমর মা জয়নাব বেগম ও পিতা ফজলুর রহমান। তাঁদের প্রতিও আমি ঋণী। আমার শাশুড়ি আমেনা বেগমও আমাকে গবেষণা কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে। তাই তাকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সঙ্গে। আমার সহধর্মিণী হাসনা আল হুমায়রা ধৈর্য ও কঠিন শ্রমে সংসারের দায়িত্ব পালন করে অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করেছেন।

গবেষণা কাজে আমি ব্যক্তিগত সংগ্রহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় গ্রন্থাগার , বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এছাড়া আমার ছোট বোন ফারহানা আখতার ও ছোট ভাই জাকিরুল ইসলাম, অন্য ভাই-বোনসহ বেশ কজন সুহৃদ কিছু বই সংগ্রহ করে দিয়ে সহায়তা করেছে। গবেষণা কাজে আমার সহকর্মী সাংবাদিক ও শিক্ষকবৃন্দের সহায়তা পেয়েছি। এ কাজে আরো অনেকের সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছি যাদের নাম স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। আমি এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, কর্মচারীবৃন্দ ও সুহৃদদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোঃ জহিরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ১

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও কল্লোলের লেখকগোষ্ঠী : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ৩৭

তৃতীয় অধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা ৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মধ্যবিত্তের জীবনসংকট নিরীক্ষণ ৭৪

অর্থনৈতিক সংকট ৭৪

মানসিক সংকট ১০৪

জীবনের বিচিত্র সংকট : ব্যক্তিজীবনের সংগ্রাম ১৬৮

জীবনের বিচিত্র সংকট : স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৭৭

জীবনের বিচিত্র সংকট :ব্যক্তিস্বার্থের টানাপড়েন ১৮৫

স্নেহ বাৎসল্য ও প্রেম ভালোবাসার সংকট ২১৩

উপসংহার ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি একথা সত্য। একইভাবে সেখানে প্রতিবিম্বিত হয় ব্যক্তির মন, চিন্তন ও ভাবনা। পুরো মানুষকে তো সাহিত্য ধারণ করেই। দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান লেখক সমাজে যা ঘটে সাহিত্য-শিল্পে শুধু তারই রূপায়ণ করেন না। লেখক মননের পরিশীলিত রঙতুলিতে ভাবনা, স্বপ্ন ও কল্পনায় শিল্পসত্যের রূপময় জগৎ গড়ে তোলেন। সমাজসত্যের চিত্রকল্প সৃজনের তাগিদকে অস্বীকার না করেও এমন মন্তব্য অবিবেচনা প্রসূত নয়। কালজয়ী শিল্পী ব্যক্তিমনের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তনলব্ধ প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটান তাঁর সাহিত্যকর্মে। যা যেভাবে আছে সব ঠিক আছে এমন ধারণাকে তমসঘরে রেখে তিনি সমাজকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে চান এবং এর প্রকাশ ঘটান। এই স্বপ্নসাধনা সাহিত্যকর্মে রূপায়িত হয়ে তার তরঙ্গ-তাড়ন পাঠক হৃদয়েও ছড়িয়ে যায়। এভাবে কাল পরিক্রমায় সমাজ ও সাহিত্য ভাবনার পরিবর্তন আসে।

সমাজসত্যের উপর নির্ভর করে শিল্পসত্যের ভিত নির্মিত হয়। শিল্পসত্য সমাজসত্যকে অবিকল গ্রহণ করবে এমন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সেই লেখকই শক্তিশালী ও কালোত্তীর্ণ শিল্প রচনা করতে সক্ষম হন, যিনি সৃষ্টিকর্মে শিল্পসত্তার উজ্জ্বল প্রভা দান করতে পারেন। এছাড়া সমাজ ও প্রতিবেশের বাইরের ঘটনাপ্রবাহ ও গড়ে ওঠা নতুন মতবাদ লেখককে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও রুশ বিপ্লবের কথা বলা যেতে পারে। মার্কস বা ফ্রয়েড এদেশের লেখকদের নানা সময়ে প্রভাবিত করেছেন। অন্য ভাষী লেখকদের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এই সত্যের সমর্থন দিয়েছেন বিভিন্ন ভাষার অনেক শক্তিমান লেখক। শক্তিমান লেখক সমাজসত্যের চেয়ে শিল্পসত্যকে সবসময় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলা যায়, সমাজসত্যের চেয়ে শিল্পসত্যের মূল্য অনেক বেশি।[১] সেজন্য শিল্প-সাহিত্যে লেখকের মনন ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হওয়াকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা যায় না।

সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ শাখা ছোটগল্প ও তাঁর লেখক সম্পর্কে এ বক্তব্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো সমানভাবে প্রযোজ্য। উনিশ শতকে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনার ভিত্তি তৈরি হয়। নতুন চিন্তা চেতনার সমাজসংলগ্ন একটি শিক্ষিত শ্রেণি ছোটগল্প সৃজনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। অবশ্য শিক্ষা ও মননের এই রূপান্তর শুরু হয় উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকদের সময়েই বাংলা ছোটগল্প একটি সমৃদ্ধ শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয়। তবে ছোটগল্পের ভুবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Dhaka University Institutional Repository

অদ্বিতীয় আলো। তিনি ছোটগল্পকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত—

> "বাংলা ছোটগল্পের জনক ও প্রধান শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর হাতেই এর পত্তন, পরিচর্যা, বিকাশ। এই ঐতিহাসিক সত্য আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। বাংলা উপন্যাসের প্রথম শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র; মহাকাব্য, সনেট আর নাটকের স্রষ্টা মধুসূদন; আধুনিক গীতিকবিতার জনক বিহারীলাল। কিন্তু ছোটগল্পের প্রবর্তক ও প্রথম শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো পূর্বসূরী নেই।"[২]

এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নের ভাঙা-গড়া ও ব্যাপক পরিবর্তনশীল অস্থির ও সংকটাপন্ন সময়ে বাংলা ছোটগল্পে আসে নতুনত্ব। এ সময় বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। বিশেষ করে বেনিয়া পুঁজির বিকাশ ঘটায় বাঙালিদের একটি অংশ সেই পুঁজির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। এ প্রসঙ্গটি সমকালীন সাহিত্যে উঠে এসেছে।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। এ সময়ের নতুন লেখকদের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তি ও শ্রেণিগত ভাবনা, পারিবারিক ও ব্যক্তিসংকট, পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাত ও তার স্বদেশভাবনা সবকিছু উঠে এসেছে। বলা যায় একালের লেখকদের হাতে মধ্যবিত্তের জীবনের স্বরূপ প্রকৃতরূপে প্রাণ পায়। এক্ষেত্রে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। এ সফলতার পেছনে কাজ করেছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁরা শুধু মধ্যবিত্তের ছবি অবলোকন করে আঁকেন নি, তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তা সিক্ত হয়েছে। এই ধারার শিল্পীদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৭) একজন অসাধারণ ছোটগল্প লিখিয়ে। ছোটগল্প লেখক হিসেবে ১৯৩৩-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। *পঞ্চশর* (১৯২৯), *বেনামী বন্দর* (১৯৩০), *পুতুল ও প্রতিমা* (১৯৩২) এবং *মৃত্তিকা* (১৯৩৫) গল্পগ্রন্থ ১৯৩৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, মধ্যবিত্তের যাপিত জীবনসংকটকে তিনি ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ও সমাজমনস্ক-অনুসন্ধিৎসু মনের তুলিতে অঙ্কন করেছেন। আবেগরিক্ত মননে তিনি অসাধারণ অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর শিল্পীসত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "পটের উপর দৃঢ়মুষ্টি অধিকার, বিশ্লেষণের অভ্রান্ত নৈপুণ্য, অনুচ্ছ্বসিত সংযত ভাষা মর্মভেদী দৃষ্টির সাহায্যে গল্প লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের রহস্য সন্ধান করে ফিরেছেন। তাঁর সহযোগী বুদ্ধদেব বসুর মতো গল্পের মধ্যে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করেন না, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো আবেগের তরঙ্গশীর্ষে উপনীত হন না। 'গোটা মানুষের মানে' খুঁজেছেন, ভাঙাচোরা মানুষের ব্যবচ্ছেদ করেছেন।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমেন্দ্র মিত্র একশত পঞ্চাশটিরও বেশি গল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম ছোটগল্প *শুধু কেরাণী* (চৈত্র ১৩৩০। এপ্রিল ১৯২৪) *প্রবাসী*তে প্রকাশিত হয়। তিনি মধ্যবিত্তের আর্থিকসংকটের প্রেক্ষাপটে অসাধারণ কিছু ছোটগল্প রচনা করেছেন। তবে তাঁর যথাযথ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় দাম্পত্য জীবনের সংকট রূপায়ণে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে সমাজের বাস্তব রূপের চিত্রই ফুটে উঠে নি তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নচিত্রও তিনি অঙ্কন করেছেন।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল বিষয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের জীবনসংকট। আমরা গবেষণার সুবিধার্থে বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও কল্লোলের লেখক গোষ্ঠী : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অংশে বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও কল্লোল লেখকগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি অংশে মধ্যবিত্তের সামাজিক বিকাশের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা অংশে তাঁর ছোটগল্পের বিষয়-ভাবনা কিভাবে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের জীবনসংকট নিরীক্ষণ অংশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাপিত জীবনের সংকটের চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এ অংশে তাঁর সঙ্কলিত গল্পগ্রন্থের তিন খণ্ড থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু বেছে নেয়া হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ :

১। "সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা সব সত্য নহে। কবি,তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান,অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত : *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা* ,(ঢাকা ,১৯৯৭), পৃষ্ঠা : ২৯৮

২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের পুত্তলিকা* , (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা : ২৩

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও কল্লোলের লেখক গোষ্ঠী : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ছোটগল্প সাহিত্যের আধুনিকতম সৃষ্টি। কথাসাহিত্য বা উপন্যাসের হাত ধরে ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হয় শিল্পবিপ্লবের পর। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ছোটগল্পের সার্থক পথচলা শুরু। এ সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত—

> "'ছোটগল্প' (শর্ট স্টোরি) একটি আধুনিক সাহিত্যিক রূপ বা 'ফর্ম' রূপে দেখা দিয়েছে মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দে। ঘটনার বিবৃতি মাত্র নয়, নীতিশিক্ষা নয়, রূপক রচনা নয়, বৃত্তান্ত নয়; ছোটগল্প এক স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি।"[১]

ছোটগল্পের উৎপত্তি সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—

> "ছোটগল্পের ইতিহাসগত সূচনা হল উত্তর আমেরিকায়—ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপভ্যান উইঙ্কল', এডগার অ্যালান পো-র 'ম্যানুসক্রিপ্ট ফাউণ্ড ইন এ বট্‌ল', আর নথানিয়েল হথর্ন-এর 'সিলেশ্চিয়াস ওমনিবাস'-এ।"[২]

এরপরেই ইউরোপীয়, আমেরিকান, ফরাসি ও রুশ সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্প এসেছে সে সময়েই। আর ছোটগল্প নির্মাণোপযোগী বাংলা গদ্য সৃষ্টি হয়েছিল উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। সে কৃতিত্বের দাবিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)।

ছোটগল্পের আবির্ভাব দেরিতে হলেও অসংখ্য লেখকের সম্মিলিত সাধনায় ছোটগল্প আজ বাংলা সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তবে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১-১৯০৪) হাতেই ঘটে বাংলা ছোটগল্পের অঙ্কুরোদগম। উল্লেখ্য, ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) *বেতাল পঞ্চবিংশতি* গ্রন্থের মাধ্যমেই বাঙালি প্রথম পায় সীমিত গল্পরসের আস্বাদ। এতে গল্পরসের আস্বাদ থাকলেও, গল্প বলতে যা বোঝায়, *বেতাল পঞ্চবিংশতি*— তে তা ঐতিহাসিক কারণেই দুর্লক্ষ। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *ইন্দিরা* (১৮৭২), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *রাধা রাণী* (১৮৭৫) প্রভৃতি রচনার কথাও কোনো কোনো সমালোচক উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমের রচনাগুলো হচ্ছে 'নভেলা' শ্রেণির সৃষ্টিকর্ম বা ছোটগল্পধর্মি কয়েকটি রচনা মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

চট্টোপাধ্যায়ের সহোদর পূর্ণচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূচনালগ্নে ছোটগল্প লেখেন। তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "১৮২০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' [বঙ্গদর্শন, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা] গল্প দিয়েই বাংলা গল্পের যাত্রা শুরু।"[৩]

গল্পটি বৃহদায়তনের কারণে অনেকেই একে সার্থক ছোটগল্প হিসেবে মানতে রাজি হন নি। তবে এ কথা বলা যায় যে, এ গল্প ছোটগল্পের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী ছোটগল্প *দামিনী* (১৮৭৪) প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ (১৮৭৪) সংখ্যা *ভ্রমর*—এ এবং *রমেশ্বরের অদৃষ্ট* (১৮৭৭-*ভ্রমর* পত্রিকা)। ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঘটনার একমুখিতা ও সমাপ্তির ইঙ্গিতময়তা এসব ছোটগল্পে নেই।

সমসাময়িক কালে বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটগল্পধর্মি দুটি আখ্যান প্রকাশিত হয়। এর একটি *ইন্দিরা* (১৮৭৩), চৈত্র (১২৭৯) সংখ্যা *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত হয়। প্রমথনাথ বিশী দুটো *ইন্দিরা* 'র কথা বলেছেন। একটিকে তিনি ছোট *ইন্দিরা* বলেছেন। অন্যটিকে তিনি বলেছেন বড় *ইন্দিরা*। ছোট *ইন্দিরা* সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন হচ্ছে এমন—

> "১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫ এর মধ্যে এক ঝাঁক ক্ষুদ্রায়ত কাহিনী লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গরীয়, লোক রহস্য, রাধারাণী ও কমলাকান্তের দপ্তর, কোন কারণে খণ্ডীভূত অজ্ঞাত গ্রহরাজের টুকরা।"[৪]

ইন্দিরা সম্পর্কে শ্রী সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত—

> '"ইন্দিরা,' যুগলাঙ্গরীয়' ও 'রাধারাণী' এই তিনটি রচনাকে ঠিক উপন্যাসের মধ্যে ফেলা চলে না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রকাশের পরবর্তীকালে 'উপকথা' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করেন।"[৫]

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই *ইন্দিরা'র* সংস্কার সাধন করেন এবং *ইন্দিরা* উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ স্বর্ণকুমারী দেবীও (১৮৫৫-১৯৩২) কিছু ছোটগল্প লিখে বাংলা ছোটগল্পের প্রস্তুতি পর্বে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম সচেতন শিল্পী। স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্প সংকলনের নাম *নব কাহিনী বা ছোটগল্প* (১৮৯২)। তাঁর সার্থক ছোটগল্পগুলোর মধ্যে *সন্ন্যাসিনী, লজ্জাবতী, কেন, গহনা* উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পের শিল্পরূপ বিচারে তাঁর সব গল্পই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। তিনি নারীর সমস্যাশঙ্কুল জীবন নিয়ে ছোটগল্প লিখেছেন। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুতে বাংলা সাহিত্যে অনেকেই ছোটগল্প রচনায় উদ্যোগী হন। রবীন্দ্র-যুগের লেখক বলে এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রধারার প্রভাব মুক্ত নন। তবে দু একজন স্বতন্ত্রধারার গল্প রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই সময়ের ছোটগল্পকারদের মধ্যে তারকানাথ

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৯৯১) স্বতন্ত্রধারার গল্প লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তারকানাথের একটি মাত্র সংকলন (১৮৮৮) রয়েছে। এ সময়ের গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম ত্রৈলোক্যনাথ (১৮৪৭-১৯১৯)। তিনি রূপকধর্মি গল্প লিখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাও অঙ্কিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। ভণ্ডামী, প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। এ সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত—

> "---ভণ্ডামি, প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতার ব্যবসায়ীদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ তাঁর লেখনীমুখে অগ্নিবর্ষণ করেছে। উদ্ভট কল্পনার অবাধ প্রকাশ ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে অসামান্য নৈপুণ্য তাঁর গল্পকে দিয়েছে বিশিষ্টতা।"[৬]

ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সংকলন ভূত ও *মানুষ* (১৮৯৬), *মজার গল্প* (১৯০৬)। তাঁর সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য—

> "বাংলা সাহিত্যে গল্প-শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ কোন উদ্দেশ্যমূলক রচনার স্রষ্টা নন। এদেশের চিরগত গল্প বলিয়ের সহজ উত্তরাধিকারী তিনি, নূতন যুগের শিল্পী হিসেবে তাঁর রচনাশৈলী জ্বালাতপ্ত (Satirist)- এর নয়— বাংলা গল্পে দৃশ্যমান জীবনকে তিনি কৌতুকের স্মিতহাস্যে সঞ্জীবিত করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা গল্পের প্রথম সার্থক হিউমারিস্ট।"[৭]

এই সময়ের আর একজন গল্পকার নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)। রবীন্দ্র সমবয়সী এই লেখকের একটি সংকলন *রথযাত্রা ও অন্যান্য* (১৯৩২)। *ভারতী* পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই নগেন্দ্রনাথের পথ চলা শুরু হয়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়—

> "নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রোমান্স দৃষ্টি ও রহস্য প্রবণতা। ইতিহাস, গোয়েন্দা রহস্য, পতিতা নারী, শিশুতোষ কৌতূহল ইত্যাদি নানা বিষয়ে গল্প রচনা করে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তিনিই প্রথম বাংলা গল্পে বৈচিত্র্যের সন্ধান করেন।"[৮]

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের মধ্যে আছে—*লক্ষ্মীছাড়া, জাল কুঞ্জলাল, গল্প ও অল্প, চুরি না বাহাদুরি* ইত্যাদি। বসুমতী প্রকাশিত *নগেন্দ্র রচনাবলী* (১৯২৫)-তে তাঁর সব গল্প সংকলিত হয়েছে। নগেন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো যদিও ছোটগাল্পিক সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, তবু রবীন্দ্রযুগের ছোটগল্পকারদের মধ্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের নামের পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০-১৯২১) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সুরেশচন্দ্র একটি বিশেষ ধারার গল্প রচয়িতা হিসেবে পরিচিত। নীতি আর আদর্শ প্রচারের বাহন হিসেবেই তিনি ছোটগল্পকে বেছে নিয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র সম্পর্কে অভিমত—

> "রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সুরেশ সমাজপতির প্রধান নালিশ ছিল; প্রেম ও পূর্বরাগ প্রভৃতি সমাজগর্হিত ছবি এঁকে তাঁর সহধর্মীরা নাকি বাংলাদেশের সহজ নৈতিক পরিবেশকে ঘোলাটে করে তুলেছিলেন।"[৯]

Dhaka University Institutional Repository

সুরেশচন্দ্রের গল্পের সংখ্যা সব মিলিয়ে তেরোটির মতো। এসব গল্পে নীতিগত জীবনচিন্তার রক্ষণশীলতা এত বেশি প্রকাশ পেয়েছে যে, তা কখনো কখনো গল্প থাকে নি, প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁর একমাত্র গল্প সংকলন *সাজি* (১৯০০)-এতে দশটি গল্প স্থান পেয়েছে।

সমসাময়িক সময়ের আরো কয়েকজন গল্পকারের মধ্যে আছেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯)। তাঁর গল্প সংকলন *মঞ্জুষা* (১৯০৩), *চিত্রলেখা* (১৯১০) ও *চিত্রালী* (১৯১৯) ইত্যাদি। তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে বলা হয়—

> "সুধীন্দ্রনাথের গল্পের বিন্যাস এতো অতুল্য, এবং এই বিন্যাস-এর ওপরেই তার ছোটগল্পের গুণ এত বেশি নির্ভর করে আছে যে, গোটা গল্প তুলে না দিলে বক্তব্য কেবল অস্পষ্ট থাকে।"[১০]

সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— তাঁর গল্প সংকলন *ঘরের কথা* (১৯৯০), *পরিকথা* (১৯১১) ও *নবান্ন* (১৯১২)। ছোটগল্প শিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। রবীন্দ্রভক্ত হয়েও তিনি আগা-গোড়াই রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক। তাঁর প্রমাণ মেলে *দেবী* গল্পটিতে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *নবকথা* (১৮৯৯), *দেশী ও বিলাতী* (১৯০৯), *গল্পাঞ্জলি* (১৯১৩), *গল্প বিথী* (১৯১৬), *পত্রপুষ্প* (১৯১৭), *গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প* (১৯২৪), *যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প* (১৯২৪), *জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প* (১৯৩১) ইত্যাদি। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। ছোটগল্পকার হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন—

> "বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাতকুমার একটি অবিস্মরণীয় নাম। সমাজ-রুচি ও সাহিত্য-রুচির দ্রুত আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর গল্পের উপভোগ্যতা আজো কমে নি।"[১১]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) বাংলা ছোটগল্পের ধারাকে নতুন ধাপের সীমানায় পৌঁছে দিয়েছেন। বিচিত্রকর্মা চারুচন্দ্র বাংলা সাহিত্য আনলেন নতুন নতুন আঙ্গিক। তাঁর গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-*পুষ্পমাত্র* (১৯১০), *সওগাত* (১৯১১) *পঞ্চদশী* (১৯২৭) ইত্যাদি। গল্পকার হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের (১৮৭৬-১৯৬২), গল্প সংকলন- *প্রেম মরিচিকা* (১৯০৯), *হৃদয় শ্মশান* (১৯১৯)। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮-১৯২৯) রচনাবলির প্রধান বাহন ছিল *ভারতী* এবং তাঁর শিল্পকর্ম গদ্য-পদ্য উভয় মাধ্যমকেই আশ্রয় করেছিল। গল্পশিল্পই ছিল তার মধ্যে প্রধান। তাঁর গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— *কল্পকথা* (১৯১০), *জাপানী ফানুস* (১৯০৯), *মনে মনে* (১৯২১) প্রভৃতি।

এ সময়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকজন মহিলা ছোটগল্প রচয়িতার আবির্ভাব ঘটে। শরৎ কুমারী তাঁদের মধ্যে একজন। নারী জীবনের মমতা ও কৌতূহল কৌতুকের সঙ্গে মেয়েদের জীবনের নকসা চিত্রণই শরৎ কুমারীর গল্প রচনার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-অনুরাগ তাঁর গল্প রচনায় ছায়া ফেললেও, রবীন্দ্র অনুকরণ তিনি করেন নি। স্বামী অক্ষয় চৌধুরীর মতোই তাঁর অনায়াস সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল। সৃষ্টির প্রতি ঔদাসীন্যও ছিল স্বামীরই মতো। শুভ *বিবাহ* (১৯০৬) নামে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর একটি সংকলন গ্রন্থ আছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) একজন সার্থক ছোটগল্পকার। সরলা দেবীর একটি মাত্র গল্প সংকলন *নববর্ষের স্বপ্ন* (১৯১৪)। মহিলা গল্পকার সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯১৬)। তাঁর গল্প সংকলন-*কাহিনী বা ক্ষুদ্রগল্প* (১৮৯৮)। *ভারতী* গোষ্ঠীর গল্প লেখিকাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী ও অনুরূপা দেবী ছিলেন বিশেষ স্মরণীয়। এই দুই সহোদরা ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। এঁরা *ভারতী* গোষ্ঠীর গল্পধারায় এক নতুন সুরের ঝঙ্কার তুলেছিলেন-এক নবীন জীবন-প্রেমের বাণী। ইন্দিরা দেবীর (১৮৭৯-১৯২২) গল্প সংকলন হচ্ছে- *নির্মাল্য* (১৯১২), *কেতকী* (১৯১৪), *মাতৃহীন* (১৯১৭), *ফুলের তোড়া* (১৯১৮) এবং লেখিকার মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় *শেষ দান* (১৯২৪)। ইন্দিরা দেবীর অনুজা সহোদরা অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) শিল্পী হিসেবে ছিলেন অতিশয় আত্মসচেতন। এঁর গল্প সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে *চিত্রদীপ, উল্কা, রাঙাশাঁখা* (১৯১৫) ও *মধুমল্লী* (১৯১৭) এবং লেখিকার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে— *ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলন কথা*। নিরুপমা দেবীর (১৮৮৮-১৯৫১) কিছু কিছু গল্প নারী হস্তের স্নিগ্ধতায় মনোহর। তাঁর গল্প সংকলন *আলেয়া* (১৯১৭)। এছাড়া তাঁর অগ্রজ ভাই বিভূতি ভট্ট'র সঙ্গে যৌথভাবে *অষ্টক* (১৯১৭) নামে একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। অষ্টকের আটটি গল্পের মধ্যে চারটি নিরুপমা দেবীর। রবীন্দ্র কন্যা মাধুরীলতাও (১৮৮৬-১৯১৮) কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। তাঁর কোনো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি, তবে মাধুরীলতার লেখা তিনটি গল্পের সন্ধান মেলে। তাঁর *মাতাশত্রু* (*ভারতী*), *সুরো* (*সবুজপত্র*) এবং *সৎপাত্র* (*বঙ্গদর্শন*) পত্রিকায় এ গল্পগুলো প্রকাশ পায়। এই সময়ের বাংলা ছোটগল্পে মূলত ব্যক্তি বা পরিবারের সমস্যাই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। এই পর্যায়ের ছোটগল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "উপাখ্যান, রূপকথা, রোমান্স নভেলা প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে কালক্রমে জন্ম নিয়েছে আধুনিক বাংলা ছোটগল্প।"[১২]

বাংলা ছোটগল্পের ক্রমধারা আলোচনায় এর পরেই আসে রবীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী ছোটগল্প সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা হয়েছে—

> "ছোটগল্পের প্রতীতি-সমগ্রতা, প্রারম্ভিক দ্রুততা, পরিণামী ইঙ্গিতময়তা, সঙ্কেতধর্মিতা কিংবা শৈলীর সূক্ষ্মতা রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী গল্পকথিত রচনাপুঞ্জে ঐতিহাসিক ভাবেই অনুপস্থিত।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) প্রথম গল্প *ভিখারিণী* প্রকাশিত হয় *ভারতী*'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৮৪-১৮৭৭)। পরের গল্প *করুণা*। *করুণা* উপন্যাসোসম বৃহৎ গল্প (*রবীন্দ্র রচনাবলীর* ৬৮ পৃষ্ঠাব্যাপী)। একে উপন্যাস বলাই শ্রেয়। পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ দুটির কোনোটিকেই গল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি।

করুণা উপন্যাস এবং সমাপ্ত উপন্যাস। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় সৈয়দ আকরম হোসেনের এ মন্তব্য থেকে—

> "রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের 'দেশকাল ও শিল্পরূপ' আলোচনায় (১৩৬৮) করুণাকে সমাপ্ত উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক

Dhaka University Institutional Repository

> প্রতিভার প্রথাবদ্ধ ঐতিহাসিক উৎসকে অস্বীকার করে সমাজ-উৎস নির্ধারণে সচেষ্ট হই।"[১৪]

জীবনের সাতান্ন বছর পরিধিতে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন ১১৯টি। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য, রচনাশৈলী, চরিত্র নির্মাণ, ভাবাবেগ বা অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন; এসব পরীক্ষায় তিনি সার্থকতাও অর্জন করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প রচয়িতাদের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "গল্পে সুখ-দুখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর।"[১৫]

ফলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্প বিচার করলে আমরা সুখ-দুঃখ প্রেম-বিরহময় সমগ্র বাঙালিমানস তথা তৎকালীন সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনীতিক জীবন প্রবাহের সন্ধান পাই। প্রাক-রবীন্দ্রযুগের রিক্ত উত্তরাধিকারের উপরেই রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেন বাংলা ছোটগল্পের বিশাল সৌধ। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের একক সাধনায় বাংলা ছোটগল্প বিশ্ব ছোটগল্পের আসরে অর্জন করে সম্মানের আসন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে এমন অভিমত দিয়েছেন—

> "আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।..... আমি যে ছোটগল্পগুলো লিখেছি বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম তাতেই ধরা পড়ে।" [১৬]

মূলত পল্লীবাংলার জীবনচিত্রের রূঢ় বাস্তবতাই *গল্পগুচ্ছের* বাস্তবতা।

রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সের রচনা *ভিখারিণী*'র মধ্য দিয়ে আধুনিক ছোটগল্প এবং রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছের* যাত্রা শুরু। এটি গল্পের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক নির্মাণ। প্রকাশকাল ও চরিত্র লক্ষণের দিক বিচার করে রবীন্দ্রনাথের গল্প সমূহকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় রচিত গল্প (১৮৯১-১৯০০)

২। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী গল্প (১৯০১-১৯১৩)

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্প (১৮১৪-১৯৪০)

রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছের* প্রথম পর্বের গল্পে পদ্মা তীরবর্তী পূর্ব বাংলার প্রকৃতি তাঁর চেতনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে পল্লী বাংলার জীবনধারা, মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করা নগরজীবনের কোলাহলের চেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল। একদিকে অভিজ্ঞতার দুয়ার খুলে পল্লীর জনজীবন যেমন কবির চিন্তায় পট পরিবর্তন এনেছে তেমনি নতুন পল্লী তাঁর সৃষ্টির ফল্গুধারাকে বিকশিত করেছে। প্রমথনাথ বিশীর এ সম্পর্কে মন্তব্য—

Dhaka University Institutional Repository

> "রবীন্দ্রনাথ খাস কলিকাতার মানুষ। কিন্তু তাঁদের পৈতৃক জীবিকার উপায়টির অবস্থান সুদূর পল্লীবঙ্গে। ইতিপূর্বে তিনি সেখানে অনেকবার গিয়েছেন সত্য, কিন্তু সে যাওয়া এবং সে দেখা নিতান্তই বাহির হইতে। বিস্তৃত জমিদারীর পরিদর্শন ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে তিনি গেলেন ১৮৯১ সালে।" [১৭]

একথা বলা যায় যে, বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও তার মানুষই এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রধান উপাদান।

পল্লীর সমাজ-সংসার, অভাব অনুযোগ, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র, অর্থনৈতিক পারিবারিক সংকট তাঁর গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "বাস্তবের কঠিন, স্থির রূপের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক কবি— মানস এমন একটা অভাবনীয় তাৎপর্যের দ্বার খুলে দিয়েছে যে, বাস্তব তার নিজস্ব সত্তা বজায় রেখেও এক নতুন বেশে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এমন একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা আছে, যা সাধারণ গল্পে মেলে না। এক মহতী কবি প্রতিভার সৃষ্টি এই গল্পগুলি, অথচ বাস্তবের রূপ ও রস এতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি। কেবল এই বাস্তব রূপ ও রসের মধ্য থেকে এক নব রূপ ও নবরসের অপূর্ব সৌরভ উত্থিত হয়ে একে অবিস্মরণীয় করেছে।"[১৮]

এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে—

> "সাহিত্য সৃষ্টিতে মানুষের যে বাস্তবজীবন প্রতিফলিত হয়, তার অবলম্বন কোনো দেশ, কোন কাল ও কোনো বিশিষ্ট পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বাস্তবতা প্রসংগে দেশ , কাল পাত্রের প্রশ্ন বিবেচ্য।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সমাজ ও বাস্তবতা প্রসঙ্গে আনোয়ার পাশার মন্তব্য—

> "সমাজ ও সংসারের বাস্তব পরিবেশটি গল্পের উল্লেখযোগ্য প্রধান অংশরূপে চিত্রিত হয়েছে। সামাজিক অথবা পারিবারিক কোনো বিশেষ পটভূমিকা ঐ গল্পের জন্য যেন অবশ্যম্ভাবী ছিল এমনই মনে হয়।"[২০]

সেকারণে তাঁর ছোটগল্পের বাস্তবতাবোধে মানুষের জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ ও প্রকৃতিচিত্র সমানভাবে ক্রিয়াশীল। পল্লীর অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত মানুষ তৎকালীন নাগরিক সভ্যতার আলো থেকে স্বভাবতই দূরে থেকে জীবন জীবিকার জন্য সবসময় প্রকৃতির উপরই নির্ভর করতো। কৃষকের জমিকর্ষণ, জেলেদের মাছ ধরা, রাখালের গরু নিয়ে মাঠে যাওয়া, মাঝির নৌকা বাওয়া, সব কিছুই প্রকৃতি নির্ভর। রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রকৃতির অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে —

Dhaka University Institutional Repository

> "প্রকৃতি শুধই পটভূমি নয়, একেবারে গল্পের প্রধান অঙ্গ হয়ে, কোথাও বা চরিত্র হয়ে, কোথাও বা কোন চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে গিয়ে গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে আছে।"[২১]

প্রথম পর্বে রচিত গল্পের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পোস্টমাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, দালিয়া, কঙ্কাল, একরাত্রি, জীবিত ও মৃত, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, মহামায়া, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক* প্রভৃতি। এসব গল্পের বেশির ভাগই পল্লীকেন্দ্রিক এবং এখানে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের হৃদয়রহস্য ও মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় ঐকাত্ম্য। কেবল পদ্মা তীরের মানব-মানবীই নয়, পদ্মাও তাঁর গল্পে প্রভাব ফেলেছে সমানভাবে। *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন*-এ দেখা যায় দুরন্ত পদ্মাই গল্পের পরিণাম নির্দেশক হয়ে উঠেছে। এ সময় পদ্মার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

> "বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরে কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।"[২২]

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নির্ভর *নিশীথে* গল্পে একটি অপরাধ পীড়িত মনের শঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে নিতান্ত কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনায়। প্রতারণাকারী দক্ষিণাচরণ মনোরমাকে বিয়ে করে বোটে বেড়াতে বেরুলেন । এ সময়ের পদ্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।"[২৩]

নিশীথে গল্প সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "নিশীথে গল্প একটি অপরাধী মনের ব্যঞ্জনাময় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।"[২৪]

প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের নিবিড়-আত্মিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক থেকে বিচ্ছেদজনিত জটিলতা *গল্পগুচ্ছের* একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদ ঘটলে মানবজীবনে নেমে আসে আত্মিক মৃত্যু। *ছুটি, সুভা, সমাপ্তি, অতিথি* গল্প তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ পর্বের গল্পে আর একটি দিকের প্রকাশ ঘটেছে তা হলো মানুষের হৃদয়রহস্যের উন্মোচন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি পালন করেছে মুখ্য ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ মানবহৃদয়ের আবেগঘন জীবনকে চিত্রিত করে এ পর্বে কিছু অসাধরণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে ভরা গল্প লিখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পোস্টমাস্টার, *কাবুলিওয়ালা*, *একরাত্রি*, *মধ্যবর্তিনী*, *জীবিত* ও *মৃত* প্রভৃতি উল্লেখ্য। *পোস্টমাস্টার* গল্পের রতন সম্পর্কে আনোয়ার পাশার মন্তব্য—

> "পোস্টমাস্টারের জন্য রতনের নারী-হৃদয়ের যে কান্না সে তো চিরদিন কোনো অধরার জন্য, কোনো সুদূর অসম্ভবের জন্য মানব-হৃদয়ের কান্নার প্রতীক; যাকে পাওয়া যাবে না তারই জন্য অবুঝ-হৃদয়ের কান্না।"[২৫]

_*সমাপ্তি* গল্পে হৃদয়রহস্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মৃন্ময়ীর জীবনে নেমে এসেছে ভালোবাসার শতস্রোতস্বিনী । এ গল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "সমাপ্তি গল্প গোড়া থেকেই উজ্জ্বল। সারা গল্পে 'লাইট-মোটিফ' খুব সক্রিয়। আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত এই গল্পে সবই তরল আনন্দ কোনো দুঃখ-বিষণ্নতার ছায়াপাত হয় নি। আলোর স্রোতে আর নদীর স্রোত, দুয়ে মিলে ভারি একটা আনন্দস্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছে।"[২৬]

প্রথম পর্বের রবীন্দ্রগল্পে পদ্মার প্রভাব দূর সঞ্চারী। পদ্মার বোটে ভেসে ভেসে তিনি পল্লীর সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনা আর সংগ্রামের ছবি দেখেছেন। এ কারণে শুধু প্রকৃতিই তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পায় নি— প্রকৃতির সঙ্গে রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসের রঙিন জগৎ ছেড়ে এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ নেমে এসেছেন বাস্তব জীবনের আঙ্গিনায়। জটিল, যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনের ছবি নিয়ে তিনি রচনা করেছেন *রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা*, *সম্পত্তি সমর্পণ*, *স্বর্ণমৃগ*, *দান-প্রতিদান*, *শাস্তি*, *দেনা-পাওনা*, *সমস্যাপূরণ* প্রভৃতি ছোটগল্প ।

প্রথম পর্বের গল্প পল্লীকেন্দ্রিক। পদ্মা তীরবর্তী বাংলার পল্লীপ্রকৃতি প্রথম পর্বের গল্প সমূহের অন্যতম উৎস। বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে পল্লীপ্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

> "--- আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করে ছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখ দুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করে ছিলাম তার পূর্বে আর কেউ করে নি।"[২৭]

পল্লীর সরল জীবনের নানা বিষয় নিয়ে যদিও তাঁর *গল্পগুচ্ছের* বিশাল অবয়ব। পল্লী প্রাধান্য পেলেও নগর জীবনের বিসঙ্গতি ও বিপর্যয় নিয়েও তিনি অনেক গল্প লিখেছেন। যেমন- *কঙ্কাল*, *মধ্যবর্তিনী*, *মানভঞ্জন* ইত্যাদি। পুঁজিবাদ বিকাশের পটে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের প্রকাশ ঘটে এসব গল্পে। কলকাতা জীবনের হঠাৎ সৃষ্ট বাবু সম্প্রদায়ের নানা কদর্যতা এবং বিসঙ্গতি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প *মানভঞ্জন*। এ গল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "বাঙালি বাবুদের বারাঙ্গনা প্রীতির কারণে গৃহবধূর অন্তরে স্ব-রূপের যে অবমাননাবোধ জাগ্রত হয়, তা-ই এ গল্পের পরিণাম-নির্দেশক।"[২৮]

প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ আবেগী পরিচর্যা ও সাঙ্গীতিক মূর্ছনায় গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এ পর্বের গল্পে প্রাধান্য পায় নি। তবে বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পর্বে মনস্তত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণে যে প্রবণতা তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা লক্ষ করা যায় *সমাপ্তি* গল্পে। এ গল্পে মৃন্ময়ীর প্রকৃতিগত পরিবর্তন যেমন বাস্তবানুগ, তেমনি মনস্তত্ত্বসম্মত। এ পর্বের গল্পে অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন কবিদৃষ্টির সহায়তায়—ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে গীতল-কাব্যিক পরিচর্যা। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ *কাবুলিওয়ালা ছোটগল্প*।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পসমূহের সার্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি শুধু পটভূমিই নয় একেবারে গল্পের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে কোথাও কোথাও। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কাল-পরিসরে রচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পসমূহকে দ্বিতীয় পর্বের গল্প হিসেবে বিন্যস্ত করা যায়। এ পর্বে—

> "আমরা রবীন্দ্র গল্পের নতুন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি— যেমন রূপে, তেমনি স্বাদেও পদ্মা-ঋতুর গল্পগুলি থেকে এদের অভিনবতা মৌলিক।"[২৯]

এ পর্বে রচিত ষোলটি গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— *যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ*, *নষ্টনীড়*, *মাল্যদান*, *গুপ্তধন*, *পণরক্ষা* ইত্যাদি।

> "নূতন পর্যায়ের গল্পগুচ্ছের সম্পর্কে সহজ-সরল স্বতঃস্ফূর্তির অভাব পূরণে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, টেকনিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার বিশেষিত ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।"[৩০]

দ্বিতীয় পর্বের গল্পে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা তীরবর্তী পল্লীজীবন ছেড়ে ক্রমশ শহর অভিমুখি হয়েছেন। তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় নির্বাচনে তিনি বেছে নেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে। প্রথম পর্বের গল্পের আবেগী এবং নাট্যিক পরিচর্যার স্থলে এ পর্বের গল্পে দেখা যায় বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যা। গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় পর্ব থেকেই গল্পচরিত্রসমূহ দীপ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে, যা প্রথম পর্বে ঘটে নি। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "প্রথম পর্বের শেষ দিককার গল্পে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার যে সীমিত পরিচয় উন্মোচিত হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বের গল্পে তা বিস্তৃতভাবে রূপলাভ করেছে। প্রথম পর্বের গল্পে ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের কথা মুখ্য উপজীব্য, কিন্তু এ পর্বে সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশে মানুষের বহির্জগতের পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট।"[৩১]

দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা ঋতুর গল্পগুলো থেকে নবতর স্বাদের গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "পদ্মা ঋতু বলতে বুঝেছি পদ্মা, তথা নদীমাতৃক বরেন্দ্র-পল্লীর ভাব-প্রভাবিত কবি মনোঋতুকে। এই নতুন ঋতুর পাকা ফসলটি প্রথমে ঘরে উঠল বুঝি— 'নষ্টনীড়'কে নিয়েই।"[৩২]

এবারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোমান্টিকতার মোহময় জগৎ ছেড়ে ধীরে ধীরে বাস্তবের কঠিন রুক্ষ ভূমিতে নেমে এলেন। প্রাক *সবুজপত্র* যুগের গল্প রচনার শ্রেষ্ঠ ফসল *নষ্টনীড়*। এ গল্পের পট

Dhaka University Institutional Repository

আর পটভূমি কলকাতা মহানগরী। হৃদিক রক্তক্ষরণে চারুলতা নামের এক আধুনিক নারীর হৃদয় বেদনার গল্প *নষ্টনীড়*। *সবুজপত্র* যুগের গল্প তথা বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপন্যাস রচনার ক্রমিক প্রস্তুতির স্বাক্ষরবাহী গল্প হচ্ছে এটি। *নষ্টনীড়ে* হৃদয়াবেগের চেয়ে মনোবিকলন, গতির চেয়ে বিকৃতি, গীতময়তার চেয়ে বিশ্লেষণ সমধিক— এই বৈশিষ্ট্যই *সবুজপত্র* যুগের গল্পে ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়েছে। এ বিচারে বাংলা গল্পের ইতিহাসে *নষ্টনীড়* এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি। আর এখান থেকে বাংলা ছোটগল্পে মনোবিকলনাশ্রিত আধুনিক বিজ্ঞান এষণাময় জীবনচিন্তার অগ্রসৃতি। এ সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরীর অভিমত—

> "ভূপতির সর্বনাশের মধ্যে অমল যে অকথিত সমস্যার প্রলয়াচ্ছন্নতা হঠাৎ আবিষ্কার করলো, আর অমলের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের প্রেক্ষাপটে চারু যে আত্ম-আবিষ্কার করলো, এ দুইকে দুর্নৈতিক বলবো কোন মূঢ়তায়। সুবৃহৎ গল্পের অতি সংক্ষিপ্ত সমাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি কথাই কেবল বুঝি, মানুষের মন বিচিত্র, জটিল, দুরবগাহ; মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত আদর্শবাদ ও বিবেকবুদ্ধির সব কিছু দিয়েও তার অতলান্ততার পরিমাপ হয় না। সেই অন্তহীন জিজ্ঞাসার সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে, নম্রশিরে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়; মানুষের জীবনে অনন্ত প্রাণকে প্রণাম করেই এই সমাপ্তিহীন রহস্যযাত্রা সাঙ্গ করতে হয়। ধাপে ধাপে সুকল্পিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণের বিন্যাসে জীবনের সেই সীমাহীন জিজ্ঞাসার প্রান্তরে বাংলা গল্পকে প্রথম টেনে এনেছে-নষ্টনীড়।"[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে বর্ণনার মধ্যেও ইঙ্গিত এবং ব্যঞ্জনার ঝঙ্কার তুলে দিয়ে খণ্ড-সীমিতের মধ্য দিয়ে অসীম অখণ্ডের সুরকে জাগিয়ে তোলার সাধনা করেছেন। গল্পের শেষ চারটি বাক্যে চারু-ভূপতির কথোপকথনে সেই ব্যঞ্জনা, সেই সুর অখণ্ড ঘনতা আয়ত্ত করেছে। *নষ্টনীড়* আশ্চর্য সফল এক ছোটগল্প।

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় পর্বের গল্পগুলোতে নির্মাণ করেছেন নতুন শিল্পভুবন। এ পর্বের গল্পগুলো *সবুজপত্র* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। এ পর্যায়ের গল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "তৃতীয় পর্বের গল্পে মূলত বংশ বনাম ব্যক্তির লড়াই-ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নানাভাবে দেখা গেছে। এই দ্বন্দ্বের এক চেহারা দেখি . হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী গল্প ত্রয়ীতে।"[৩৪]

প্রাগ্রসর জীবনবোধ ও শিল্পরীতিতে বিশিষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্প এ পর্যায়ভুক্ত। জাতিক-আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা ও প্রবণতা এ সময়ে রবীন্দ্রমানসকে রূপান্তরিত করে এবং তিনি মুখোমুখি হন সম্পূর্ণ এক নতুন জীবনজিজ্ঞাসার। এ বিষয়ে সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> "মূলত, এ সময় রবীন্দ্রনাথ যুগযন্ত্রণা ও সৃষ্টিবেদনার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে, ইংল্যান্ডের মর্মমূল আহৃত জীবনজিজ্ঞাসা, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিজনিত দায়িত্ববোধ, সভ্যতাবিষয়ক অমঙ্গল আশঙ্কা, স্বদেশের অবমাননাকর সমালোচনা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

> বিপর্যয়— এ সবের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় নবজাত রবীন্দ্রচেতনা বিপুল বেগে ধাবমান হল সৃষ্টির নতুন সাধনায়, জীবনালোকিত নতুন তট সীমায়। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (বৈশাখ ১৩২১) প্রবন্ধে, বলাকার কবিতায়, ফাল্গুনী নাটকে, গল্পগুচ্ছে ও চতুরঙ্গ উপন্যাসে তার সার্থক সূত্রপাত।"[৩৫]

তৃতীয় পর্ব– মূলত *সবুজপত্র* যুগে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের বিদ্রোহ, ব্যক্তির আত্মমর্যাদা, নারীর আত্মমর্যাদা প্রভৃতি ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। *হালদারগোষ্ঠী*তে অনড় বংশ মর্যাদা ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ব্যক্তির একক সংগ্রাম, *হৈমন্তী*তে একান্নবর্তী পরিবারের বদ্ধ দুর্গে খোলা হাওয়ার প্রবেশাধিকার। *বোষ্টমী*তে বংশ পরম্পরা রীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ শিল্পরূপায়িত হয়েছে। বোঝাই যায়, এসব গল্পে তত্ত্বের প্রাধান্য। আগে তত্ত্ব পরে গল্প। *হালদারগোষ্ঠী*'র বনোয়ারীলাল যৌবনের সার্থকতা চায়। এ পথের প্রধান বাধা হালদারগোষ্ঠীর বংশ মর্যদা। পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের অভিযানে বানোয়ারীই প্রথম অভিযাত্রী। প্রাণের দাবিতে সে হালদার পরিবারে প্রবীণের খাঁচা থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে গেছে। এ গল্পে ব্যক্তিত্বের স্বধর্ম ও স্বরূপ উন্মোচন হয়েছে কাব্যিকভাবে—

> "প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারে ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষিশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য-আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারী সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যে দিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।"[৩৬]

এ সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরীর অভিমত—

> "এ বর্ণনায় প্রাণকে অনুভব করার কবি শক্তির মূলে রয়েছে প্রাণভেদী বৌদ্ধিক (Intellectual) অন্তর্দৃষ্টির বিদ্যুৎ-দীপ্তি। এই বৌদ্ধিক অনুভব-ঋদ্ধতার গুণেই এ যুগের রচনা তির্যক, এমন কি সাংকেতিকও হয়ে উঠেছে। বাঁধন ভাঙ্গার বিদ্রোহী সুরেও সকল গল্পের সাধারণ সাধর্ম। বিভিন্ন যন্ত্রের আধারে জীবনের একই সুর ধ্বনিত হয়েছে এই সময়কার সকল গল্পে।"[৩৭]

তৃতীয় পর্বের রবীন্দ্র গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে প্রথা ও সমষ্টির সংঘর্ষ এবং সকল সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ। এ পর্বের প্রধান গল্পগুলো হল— *হালদারগোষ্ঠী*, *হৈমন্তী*, *বোষ্টমী*, *স্ত্রীর পত্র*, *পয়লা নম্বর*, *রবিবার*, *ল্যাবরেটরি* ইত্যাদি। *সবুজপত্র* পত্রিকায় প্রকাশিত এ গল্পগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি নারী ব্যক্তিত্বের মুক্তিসাধনা। পক্ষান্তরে *রবিবার*,

Dhaka University Institutional Repository

ল্যাবরেটরি প্রভৃতি গল্পে দেখতে পাই বিজ্ঞান চেতনার আলোকে ব্যক্তির আত্মমহিমা আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তির বিদ্রোহই তৃতীয় পর্বের রবীন্দ্র গল্পের মৌল বিষয়। বংশের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ এবং ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রতিষ্ঠার *সংগ্রাম (হালদারগোষ্ঠী)*, রক্ষণশীল সমাজ ও প্রথার বিরুদ্ধে নারীর নীরব প্রতিবাদ (*হৈমন্তী*), প্রথালালিত ধর্মাচারণের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রাম (*বোষ্টমী*), সামাজিক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নারীর বিদ্রোহ (*স্ত্রীর পত্র*), গতানুগতিক প্রেম ধারণার বিরুদ্ধে আধুনিক নারী সত্তার জাগরণ (*পয়লা নম্বর*), একমুখি পতিভক্তি বা স্মৃতি লালিত বৈধব্যে প্রেমের মুক্তি বিষয়ক সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আধুনিক নারীর ব্যক্তিমহিমার উদ্বোধন (*ল্যাবরেটরি*)-এসব বহুমাত্রিক ব্যক্তি বিদ্রোহে তৃতীয় পর্বের রবীন্দ্রগল্প বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল, শিল্পসাধনে বিশ্বপ্রসারী, জীবনবোধে সমাজ সভ্যতাসতর্ক।

স্ত্রীরপত্র গল্প সম্পর্কে ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্য—

> "নারীর আত্মজাগরণের শিল্প ভাষ্য হিসেবে স্ত্রীর পত্র রবীন্দ্র গল্পধারায় এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। মৃণালের যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এ গল্পের বিষয় তা এদেশের ফিউডাল সমাজের নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা নিয়ে একটা সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়ন।"[৩৮]

অনাথ বালিকা বিন্দু মৃণালের চেতনায় জ্বেলে দিয়েছে মুক্তির আলো— নারী জাতির প্রতি অমানবিক অত্যাচারে মৃণাল জ্বলে উঠেছে আপন সত্তায়—

> "আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—
>
> সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।
>
> বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগ আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।... তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।"[৩৯]

স্ত্রীরপত্র গল্প সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "এই গল্পকে এক কথায় বলা যায়— যৌবনের আহ্বান; নারীর মূল্যবোধ ও ব্যক্তির বিদ্রোহের গল্পরূপ।"[৪০]

পয়লা নম্বর এর অনিলা অনেক দুঃখের পর সেই মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। তার এক পাশে স্বামী অন্যপাশে সিতাংশু মৌলি। দুপাশে দু দেয়াল ছিল তার মাথা ঠুকবার। কিন্তু সে জীবনের চোরাগলিতে কোনো দেয়ালের আঁচড়ই লাগতে দেয় নি প্রাণের গায়ে। অনিলা কাউকে গ্রহণ করে নি। সে গৃহ ত্যাগ করে। এখানে অনিলার মাঝে দেখতে পাই একটি বিদ্রোহী সত্তা। অনিলা নারীত্ব সম্পর্কে সচেতন। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা রবীন্দ্র ছোটগল্পের একটি অন্যতম বিষয়। যুগলের নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র ছোটগল্পের নর-নারীকে বিচিত্র জীবন জটিলতার

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র ছোটগল্পে অনেক সময়েই সামাজিক অর্থনৈতিক কারণের সূত্র ধরে উপস্থিত হয়। যুদ্ধোত্তর বিচ্ছিন্নতা বোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাকে এক করে দেখা কোন সূত্রেই নয় যৌক্তিক, তবু দাম্পত্য- পঙ্গুতার রূপায়ণের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের আধুনিক রুগণতার জায়মান বীজটিকে যেন আমরা হঠাৎ করেই পেয়ে যাই। নর-নারীর বিযুক্তি ও বিয়োগ রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে আমরা লক্ষ করি।"[৪১]

দৃষ্টিদান গল্পে দেখা যায় শারীরিক পঙ্গুতায় আসে দূরতিক্রম্য ব্যবধান। *মধ্যবর্তিনী* গল্পে শারীরিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও তৃতীয় মানুষ এসে যুগলের মাঝে তৈরি করে মেরুদূর মানসিক বিচ্ছিন্নতা। নানাবিধ সমস্যার মধ্যে রবীন্দ্র গল্পে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা গল্প হয়ে উঠেছে শিল্পিত ও বহুবর্ণশোভিত। দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা, ভাষারীতি এবং প্রকরণ-প্রকৌশলে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শেই বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল মুক্তি।

শরৎচন্দ্র বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছেন। শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি অনুধাবন করলে মূলত দু ধরনের বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়—প্রেমের নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণ, আর স্নেহ-বাৎসল্যের তির্যক গতি। সোজাসুজি সমাজ বিদ্রোহমূলক গল্পের সংখ্যা খুবই কম- 'মহেশ' বিরল ব্যতিক্রম রূপে গণ্য হবে। ... গরীব মানুষ আর অবলা পশুর প্রতি এ গল্পে যে দরদ প্রকাশ পেয়েছে, তা গল্পকারকে মানবতাবাদী শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"[৪২]

তাঁর গল্প মূলত উপন্যাসেরই সগোত্র। এ সম্পর্কে অভিমত—

"শরৎচন্দ্রের গল্প চরিত্র বা ঘটনার প্রতি আলোকপাত করেই নিভে যায় না, ... তাঁর ধর্ম ভাবাতিরেক, তাই ছোটগল্পের ছোট পরিসরে বাকস্বল্পতার ও মিতভাষণের মধ্যে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। আর তাঁর লক্ষ্য উপন্যাসিক সুলভ খুঁটিনাটি দিকেও ঘটনাপ্রবাহের ধাক্কায় চরিত্রকে তরঙ্গিত করে তোলা।"[৪৩]

ছোটগল্পের মূল লক্ষ্য-ঘটনাংশ বিস্তার, চারিত্রিকবিকাশ এবং ঘটনা স্রোতের বিপুল বিস্তারের অবকাশ নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র গল্পে এ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেন নি। সেজন্য তাঁর ছোটগল্প অনেক ক্ষেত্রে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। তবে তাঁর কিছু গল্প জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে বিশিষ্ট গল্পকারদের মধ্যে বিশেষভাবে অন্যতম প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। প্রমথ চৌধুরী যে হাতে শাণিত প্রবন্ধ লিখেছেন, সে হাতেই লিখেছেন গল্পসমূহ। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর গল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"প্রমথ চৌধুরী যখন ছোট গল্প লিখেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, ভারতী ও কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা গল্প-আসরে সগৌরবে

Dhaka University Institutional Repository

> বিরাজ করছেন। লক্ষণীয়, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সঙ্গে তাঁদের গল্পের কোনো মিল নেই। তাঁর গল্পের গোত্র আলাদা। তাঁর গল্পে তাঁর প্রবন্ধের মতো তীব্র-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, সূক্ষ্ম আঘাত আর তর্কের শাসন। তাঁর গল্পে ঔপনিষদিক উপদেশ বা গভীর তত্ত্ব কথা, সমাজের উপকার ও অনাচার প্রতিরোধের নীতি কথার প্রকাশ ঘটে নি। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু— প্রেম ও রোমান্টিক প্রেমের ন্যাকামি, মর‍্যালিটি ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, রাজনীতি ও সুবিধাবাদ, অ্যাডভেঞ্চার; ভূত আর রোমান্স।"[৪৪]

তিনি বিশুদ্ধ গল্পরসকে যে কোনো মূল্যে বির্সজন দিতে রাজি নন। প্রমথ চৌধুরীর সংকলিত গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে— *চার-ইয়ারী কথা* (১৯১৬), *আহুতি* (১৯১৯), *নীললোহিত* (১৯৩২), *ঘোষালের ত্রিকথা* (১৯৩৭) প্রভৃতি। প্রমথ চৌধুরীও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণীয়—

> "গল্প রচনার ক্ষেত্রে আর পাঁচজন শিল্পীর মতোই প্রমথ চৌধুরীরও মূল পুঁজি চোখে দেখা জীবনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা যে বিশেষিত উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োগ করেছেন এক অপূর্ব পদ্ধতিতে, সেখানে তিনি পাঁচজনের মধ্যে থেকেও আর একজন-একতমজন। জীবন চিন্তার সতন্ত্র Individuality ও প্রয়োগবিধির intellectual অনন্যতাই প্রমথ চৌধুরীর গল্পশিল্পকে তুলনারহিত স্বতন্ত্রতার মহিমায় নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। আসলে তাঁর সকল সৃষ্টিই নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ।"[৪৫]

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগাল্পিক প্রতিভার উজ্জ্বল ফসল *চার-ইয়ারী* কথা। এখানে একটি নয় চারটি গল্পের সমষ্টি। বর্ষাঘন এক সন্ধ্যায় মদের আড্ডায় বসে চার বন্ধুর জীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে চারটি প্রেমগাঁথাই হল *চার-ইয়ারী কথা'র* মূল উপজীব্য বিষয়। কাহিনী বিন্যাস চরিত্র পরিকল্পনা ও ভাষাশৈলীতে *চার-ইয়ারী কথা* বাংলা ছোটগল্প ধারায় এক উজ্জ্বল মাইলফলক। প্রতিটি গল্পের পিছনে আছে তাঁর সুরুচি ও মননের দীপ্ত প্রকাশ। প্রমথ চৌধুরী ছোটগল্প সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য—

> "বীরবলী গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনো কিছুর প্রতিদান নয়, কোনো নীতি প্রচার নয়, ঘটনাবিবৃতি নয়, প্লট প্রাধান্য নয়, বিশুদ্ধ গল্পরস-ই লেখকের অন্বিষ্ঠ"।[৪৬]

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গল্পে লক্ষ করা যায় সৌকর্যের প্রতি প্রবল আসক্তি। চার-ইয়ারী কথা'র চার নায়কই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রেমের উত্তাল উচ্ছ্বাসে ভেসেছে। *চার-ইয়ারী কথা'র* প্রথম নায়ক সেনের কথা। এক পূর্ণিমা রাতে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয় একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি এক অপূর্ব মোহবিস্তার করেছিল। সেই আলোর বন্যায় মেয়েটিকে দেখা মাত্র প্রেমে পড়ে যায় গল্পের নায়ক। এ অবস্থায় সেই মেয়েটি হেসে তাকে সম্মতি জানায়। তার পর পরই মোহভঙ্গ। এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রকাশ পেল মেয়েটি পাগল। তাই সেই উন্মাদিনীর

Dhaka University Institutional Repository

অট্টহাসি আর কান্না সেনের স্বপ্নকে বিদীর্ণ করে দিল। *চার-ইয়ারী কথা'র* অন্য নায়করাও সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন।

আহুতি'র গল্পগুলোতে বিচিত্র ও বিরোধী রসের সমাহার। প্রমথ চৌধুরীর *আহুতি* গল্পে ফুটে উঠেছে বাংলার নিঃশেষিত জমিদারতন্ত্রের পতন এবং পরাভবের করুণ বীভৎস রূপ। করুণ ও ভয়ানক রসে মিশ্রিত ধারায় গল্পটি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে *নীললোহিত* গল্পগ্রন্থ। এই গল্পে আছে বিশুদ্ধ গল্প রস। এ গল্পগুলোকে অনায়াসেই অ্যাডভেঞ্চার গল্প হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ গল্পগুলোর মাধ্যমে একটি ভীরু, কল্পনাপ্রবণ আড্ডাবাজ, অসাধারণ গুলবাজ গল্প বলিয়ে চরিত্রকে লেখক গড়ে তুলেছেন। তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন—

> "প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গল্পেরই মুখ্য বিষয় বিশুদ্ধ গল্পরস নির্মাণ- কোন নীতিপ্রচার; প্লট পরীক্ষা কিংবা ঘটনার চমৎকারিত্ব সৃজনে তিনি মোটেই উৎসাহী নন।"[৪৭]

রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার থেকে প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পের ক্ষেত্র ব্যতিক্রমধর্মি। স্বীকার্য, তা কালমণ্ডিত, বিদগ্ধ ও মননঋদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরীর সমকালের লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং তা শিল্প উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে গল্প লেখক হিসেবে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক ত্রৈলোক্যনাথের মতো তিনিও প্রধানত রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের শিল্পী। তাঁর কৌতুক কখনোই নির্মম স্যাটায়ারে পরিণত হয় নি। তাঁর হাস্যরসের পিছনে সর্বদা একটা আত্মতৃপ্ত প্রসন্নতা ও সহজ ব্যঙ্গরস লক্ষ করা যায়। প্রভাতকুমারের গল্পের বৈশিষ্ট্য—

> "প্রভাতকুমারের গল্পের তিন প্রধান বৈশিষ্ট্য—স্বতঃস্ফূর্ততা, পরিমিতিবোধ ও গ্রন্থনৈপুণ্য। তিনি কোথাও রোমান্টিক কল্পনার রঙিন কল্পলোকে বিহার করেন নি, ভাববাদের প্রেরণায় বাস্তবকে লঙ্ঘন করেন নি।" [৪৮]

তিনি যা বাস্তবে অবলোকন করেছেন তাকেই গল্পে রূপ দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি কখনোই পদার্পণ করেন নি। জীবনের নানা অসঙ্গতিকে তিনি ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে সাবলীল সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করে সমাজ জীবনে আনতে চেয়েছেন সঙ্গতির সুর। বিশুদ্ধ কৌতুকরস তাঁর গল্পের প্রধান অবলম্বন, সাথে যুক্ত হয়েছে-বাৎসল্য ও মানব-প্রেম। জীবনকে দেখেছেন তিনি ক্ষমা সুন্দর চোখে। উদার মানবতাবোধের ক্ষেত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ প্রশস্ত ভাষার প্রাঞ্জল, ঘটনা, চরিত্রের আন্তরসম্পর্ক, পরিমিতিবোধ ছোটগাল্পিক গ্রন্থনৈপুণ্য প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তার কারণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পকে বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে প্রভাতকুমারকে লেখেন—

Dhaka University Institutional Repository

> "তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়া, কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।" [৪৯]

বাঙালির সহজ সরল জীবনের ঘটনার বিন্যাস পরিবেশ, শিল্পসংযম দ্বারা তিনি গল্পে রস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কেবল হাস্য কৌতুক নয়, অশ্রুর সাগরেও তিনি অবগাহন করেছেন। *ফুলের মূল্য, মাতৃহীন, আদরিণী, কাশিবাসিনী* গল্পগুলো তার উদাহরণ। রবীন্দ্র সমকালে গল্পের আঙ্গিক-নিরীক্ষায় প্রভাতকুমার সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পের আঙ্গিক-নির্মাণে তিনি পরিস্থিতি বা Situation এর বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রভাতকুমারের যে সব গল্প জনপ্রিয়তার শীর্ষে তা হল- *বিবাহের বিজ্ঞাপন, ফুলের মূল্য, খালাস, কুড়ানো মেয়ে, মাস্টার মশায়, বলবান জামাতা, রসময়ীর রসিকতা, আদরিণী, নিষিদ্ধ ফল, বি.এ পাশ কয়েদী, বিষবৃক্ষের ফল* ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক একই ধারার লেখক ত্রৈলোক্যনাথ-পরশুরাম-ইন্দ্রনাথ-কেদারনাথ-সৈয়দ মুজতবা আলী। ছোটগল্পের জগতে এই শিল্পীরা হাস্য-কৌতুক-রঙ্গ-ব্যঙ্গের এক সরস ধারা নির্মাণ করেছেন।

ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) গল্প সংকলনের সংখ্যা চার— *ভূত ও মানুষ* (১৮৯৭), *মুক্তমালা* (১৯০১), *মজার গল্প* (১৯০৪), *ডমরুচরিত* (১৯২৩)। ত্রৈলোক্যনাথ মূলত বিদ্রূপ, শ্লেষ, রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে তাঁর গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং স্যাটায়ারধর্মি গল্প লেখকদের মধ্যে বিশেষ আসনের অধিকারী পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)। তাঁর গল্পে একটা উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা। তিনি পৌরাণিক উপাদান-উপাখ্যানকে উপজীব্য করে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পের সংখ্যা একশ। গ্রন্থের সংখ্যা নয়। *গড্ডালিকা* (১৯২৪), *কজ্জালী* (১৯২৮), *হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি* (১৯৩৭), *গল্পকল্প* (১৯৫০), *ধুস্তুধীমায়া ইত্যাদি গল্প* (১৯৫২), *কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প* (১৯৫৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) হাস্য ও কৌতুক রসের লেখক। ইন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে সামাজিক ভণ্ডামি, সামাজিক অসঙ্গতি ও বিপর্যয়ের মূলে আঘাত হেনেছেন। ঠিক একইভাবে কেদারনাথের গল্পেও দেখা যায় আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে সমাজে যে সব অসঙ্গতি ও বিপর্যয় তার বিরুদ্ধে তিনি শাণিত বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করেছেন। তবুও তাঁর গল্প জীবনরসে পরিপূর্ণ, যা হৃদয়কে করে কোমল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহ হচ্ছে— *আই হ্যাজ, ভুদুড়ি মশাই, দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি, আনন্দময়ী দর্শন* প্রভৃতি।

এই হাস্যরসের ধারার আর এক বিশিষ্ট শিল্পী সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)। তাঁর গল্পসমূহ হাস্যরসের ধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বস্তুত আড্ডা বা বৈঠকী মেজাজকেই কেন্দ্র করে মুজতবা আলীর গল্প সরস হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম এবং পরিশীলিত

Dhaka University Institutional Repository

কৌতুকবোধ তাঁর ছোটগাল্পিক প্রতিভাকে করেছে উজ্জ্বল। এখানে সমালোচকের বাণী স্মরণীয়—

> "সৈয়দ মুজতবা আলীও বয়োজ্যেষ্ঠতা সত্ত্বেও অনেক পরে সাহিত্যের আসরে এসেছেন এবং এসেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। রসিকতা; বাগ-বৈদগ্ধ্যে, পাণ্ডিত্যে এবং অদ্ভুদ কল্পনায় তাঁর গল্প বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে, বলতে গেলে আধুনিক রম্যরচনার ধারাই খুলে দিয়েছেন তিনি।" [৫০]

সমসাময়িক রবীন্দ্রানুপ্রেরিত ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে আছেন— সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯)। তাঁর গল্প সংকলন *মঞ্জুষা* (১৯০৩), *চিত্ররেখা* (১৯০৬), *কলঙ্ক* (১৯১২), *চিত্রালী* (১৯১৯)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৭৫) লেখা গল্প-*শকুন্তলা*, *ক্ষীরের পুতুল* ছোটদের জন্য। এছাড়াও আছে— *দেবী প্রতিমা*, *রাজকাহিনী*, *আলোর ফুলকি* প্রভৃতি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৩৮) গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পুষ্পপাত্র* (১৩১৭) *পঞ্চদশী* (১৩৩৪), *বনজ্যোৎস্না* (১৩৪৫)। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৪-১৯৬৪) গল্প হচ্ছে— *শেফালী*, *নির্ঝর মৃণাল*, *পিয়াসী* ইত্যাদি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর (১৮৯০-১৯৬৬) গল্প সংকলন— *বাজীকর* (১৩২৮)। এছাড়া আছে *স্বর্গের চাবি*। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৮৮-১৯৬৩) গল্প সংকলন গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— *পসরা* (১৯১৫), *মালা-চন্দন* (১৯২২) ইত্যাদি।

সমসাময়িক কালের শরৎ পরবর্তী লেখকদের মধ্যে আছেন বিভূতিভূষণ ভট্ট। তাঁর গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-*অকালের গল্প*। এছাড়াও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প— *প্রত্যাবর্তন*। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৫৪) কিছুটা যেন কল্লোল যুগের পূর্বসাধ। তাঁর গল্প সংকলন প্রকাশ পায় নি। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৬০) এর গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী*। প্রমথ চৌধুরী দ্বারা প্রভাবিত এক ঝাঁক লেখক বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বুদ্ধি ও মননের শৈল্পিক দীপ্তি নিয়ে এলেন। তাঁদের নাম ও গল্প সংকলন— ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯-৪১৯৬২) গল্প সংকলনের মধ্যে অন্যতম *রিয়ালিস্ট* (১৯৩৩)। সতীশচন্দ্র ঘটকের (১৮৮৫-১৯৩২) দুটি গল্প সংকলন *সতীর জেদ* (১৯২৪) এবং *দুই চিঠি* (১৯২৮)। কিরণশঙ্কর রায়ের (১৮৯১-১৯৪৯) ছোটগল্পে মেধাদীপ্ত সমাজচিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর প্রধান গল্পগ্রন্থ *সপ্তপর্ণ* (১৯২৯)। সমালোচক হিসেবে খ্যাত বিশ্বপতি চৌধুরীর (১৮৯৫-১৯৭৮) প্রধান গল্পগ্রন্থের নাম— *ব্যথা* (১৯১৫), *বহুরূপী* (১৯৩২) *স্বপ্নশেষ* (১৯৩২) এবং *সেতু* (১৯৩৪)। ছোটগল্পের জগতে মননধর্মে অনন্য বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-১৯৮৯)। তাঁর দুটি গল্প সংকলন হচ্ছে— *পঞ্চমী* (১৯৩৭) এবং *সেকেন্ডহ্যান্ড* (১৯৪৪)।

এসব লেখক কল্লোল-কালে অবস্থান করেও কল্লোলবলয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবচেতনার উন্মেষকাল কল্লোলযুগ। সাহিত্যে নতুন ভাবনা ও তারুণ্যের উদ্বেলতায় বিশিষ্ট। একদল তরুণের সম্মিলিত ফসল এই বিশেষ যুগচেতনা। আর

Dhaka University Institutional Repository

তা বিকশিত হয়েছিল *কল্লোল*, *কালিকলম* ও *প্রগতি* প্রভৃতি পত্রিকাকে ঘিরে। একই চিন্তা ধারায় এই তরুণরা মূলত রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত সাহিত্য সাধনার প্রয়াস চালিয়েছেন। রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে নবীন লেখকরা জোট বেঁধেছিলেন *কল্লোল* (১৯২৩-১৯২৯), *কালিকলম* (১৯২৬-১৯২৮), *প্রগতি* (১৯২৭-১৯২৮) এসব পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। *কল্লোল*, *কালিকলম* প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। প্রগতি ঢাকার পত্রিকা। এ সময়ের সাহিত্যে নতুন ভাব ও রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এ যুগ রবীন্দ্রমুক্ত যুগ হিসেবে চিহ্নিত। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "কল্লোলগোষ্ঠীর গল্পলেখকরা রবীন্দ্র বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। যুগের অবিশ্বাস ও অস্থিরতা তাঁদের চঞ্চল করে তুলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।... সেদিনকার এই তরুণদের তিন প্রধান হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১১০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। এঁদের সঙ্গেই ছিলেন মণীশ ঘটক (১৯০১-১৯৮০), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭) জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭), কিছু পরে ভবানী মুখোপাধ্যায়। কল্লোল মাসিক পত্র (১৯২৩-১৯২৯) বন্ধ হয়ে গেলেও তার ঢেউ ছড়িয়ে যায় অনেকদূর পর্যন্ত। তবে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (শ্রাবণ ১৩৩৭/১৯৩০) এসে কল্লোলের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস ও ফেনিলতাকে স্তিমিত করে দেয়।"[৫১]

বাংলা সাহিত্যের প্রবহমানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন শতকের ঘটনাপ্রবাহ ও চিন্তাধারার প্রভাব। এসময় ৩টি ঘটনা বিশ্বময় নতুন দিক চিন্তার নির্দেশ দেয়। এরমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) মানবমনে বিভীষিকার চেতনতলের স্তর তৈরী করে। যা মনন ও মানসিকতায় সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব বিশ্বময় মানবমুক্তির নতুন গান রচনা করে। এদেশের সচেতন ও প্রগতিশীল মানুষকে তা প্রবলভাবে উদ্বেলিত ও উত্তেজিত করে। শুধু স্বপ্নবান তরুণদের নয় রুশ বিপ্লব রবীন্দ্রনাথের মনকেও আলোড়িত করেছিল। রুশ দেশ ভ্রমণ শেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *সভ্যতার সংকট* প্রবন্ধে লেখেন—

> "আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কোও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলাম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকাররের ভাগ-

Dhaka University Institutional Repository

> বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে— এক ইংরেজ আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির– আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখিছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়।" [৫২]

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সামাজিক, মানসিক, রাষ্ট্রিক ও চিন্তা-চেতনার ভাঙ্গা-গড়ার ফেনিল স্রোতধারা।

সবক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক চিন্তা ধারার প্রভাবে নতুন মূল্যবোধ রূপময় হয়ে উঠে। জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে পূর্বতন ধারণা ও প্রত্যয় বিপন্ন হয়ে যায়। মানুষের জীবন হয়ে উঠে কঠিন ও সংগ্রামপূর্ণ। বহুমুখি জটিলতায় আক্রান্ত হয় মানবজীবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এ পরিস্থিতিকে করে তোলে জটিল থেকে জটিলতর। উত্তর সামরিক কাল পর্বে ইউরোপের বেকারত্ব-মুদ্রাস্ফীতি-অবক্ষয়শূন্যতাবোধ ও অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় সাহিত্যিকরা আক্রান্ত হন হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাবোধে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের চাপে মানুষ পতিত হয় চরম অনিশ্চয়তার জগতে। সাহিত্যে এর প্রথমে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ইউরোপে। অচিরেই এর ঢেউ এসে লাগে বাংলা সাহিত্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় ইউরোপে কিন্তু এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়।

ভারতবর্ষেও চেতন ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে আসে নতুন গতিবেগ ও ভাঙ্গাগড়ার খেলা। ঊনবিংশ শতকের প্রথম চার দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ছিল— বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সাম্যবাদ আন্দোলন (১৯১৯-২১), কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৮), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বহু রাজনৈতিক কর্মির দণ্ড (১৯২৯), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১), বাংলায় মার্কসের দর্শন ও লেনিনের রণকৌশল চর্চা (১৯৩১-৩৫) ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রচার (১৯১৩-১৪), তাঁর শিষ্য অ্যাডলার ওয়ুং এবং হ্যাভলক এলিসের প্রেমের দেহবাদী যৌনবাদী ব্যাখ্যা, বার্নাড শ ও ফেবিয়ানদের অর্থনৈতিক চিন্তা সেদিন গভীরতর প্রভাববলয় সৃষ্টি করেছিল।

কল্লোল চেতনার মৌল বৈশিষ্ট্যকে বুদ্ধদেব বসু ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "অতি আধুনিক সাহিত্যিকে Post- war সাহিত্য বললে ভুল হয় না। আধুনিক লেখকরা সকলেই Post- war সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে এক হয়ে উঠেছেন। লড়াইয়ের ফলে ইউরোপের যে দুরবস্থা হয়েছে ও মানুষের চিন্তা— জগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশ তার চেয়ে অনেক কম হলেও উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মনের ভাব-ধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আধুনিক লেখকরা শিশুকাল থেকে যে অর্থনৈতিক সংকটের সহিত চাক্ষুস পরিচয় লাভ করেছেন; বঙ্কিম বাবুর সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা দেশমাতা বা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাঙলায় তার চিহ্নমাত্র ছিল না।"[৫৩]

কল্লোলগোষ্ঠীর তরুণদের প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্র বিরোধিতা করা। রবীন্দ্রনাথের সুস্থিত প্রসন্ন ও মঙ্গলময় জীবন চেতনায় এঁদের আস্থা নেই। সাহিত্যে সময় সচেতন ও সমকাল শাসিত স্রষ্টার অভিজ্ঞতা স্নিগ্ধ জীবনের আগ্নেয় উদ্ভাসন, তাই স্বভাবতই তাঁরা রবীন্দ্রদর্শন ও জীবনবোধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরব ঘোষণা দিয়ে রবীন্দ্রভোর যুগ আনতে চাইলেন। নতুন জীবনবোধ ও সমকালীন সার্বিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে যুগোপযোগী মনে হলে না।

কল্লোল যুগ সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর অনুভব প্রকাশ করেছেন এভাবে—

> "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল' সরে এসেছিল অপরাজ ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাথে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"[৫৪]

প্রেমেন্দ্র মিত্রও একই মত প্রকাশ করেছেন —

> "শিল্প চেতনার মূলে ছিল কোনো এক অজ্ঞাত বন্ধন থেকে অপরিচিত মুক্তি লাভের এক দুর্বার রোমান্টিক পিপাসা— যাকে তাঁরা প্রগতি বা আধুনিকতা নামে অভিহিত করেছিলেন।"[৫৫]

কল্লোল যুগ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর অভিমত—

> "যাকে কল্লোলযুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ; আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[৫৬]

কল্লোলের এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে কল্লোলের সমকালের ও কল্লোলের লেখকগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। মধ্যবিত্ত বাঙালির অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কনে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) । তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "ফ্রয়েড ও এলিসের চিন্তাধারার প্রভাব তাঁর সাহিত্যকর্মে লক্ষযোগ্য। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখায় যৌন কামনা-বাসনার রূপচিত্র নানা রঙে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়েছে। এই কামনা-বাসনার রূপ চিত্র পরবর্তীকালের সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে নেয়।"[৫৭]

তাঁর বিখ্যাত *ঠানদি* গল্পের ঠানদি বিধবা হবার আগেই পিসতুতো দেবরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পরও দেবর শচীকান্তকে ঠানদি তার ভালোবাসার কথা জানায়। ঠানদি যে তাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এ কথাও জানাতেও ভোলেনি,এমনকি তাকে সমস্ত জীবন দিয়ে আকাঙ্ক্ষা করেছে। দেবরকে দেখে লোভ হওয়ার কারণে তাকে আসতে বারণ করেছে।

সার্থক গল্প রচনার অন্তর্দৃষ্টি নরেশচন্দ্রের ছিল— কেবল তা সংহত হতে পারে নি সুচিন্তিত প্রকাশের অভাবে। নিজের গল্প রচনার প্রকরণ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—

> "আমার কোন গল্পই গ্রীক পুরাণের মিনার্ভার মত বর্মে-চর্মে পূর্ণাঙ্গ হয়ে আমার মনে আকারিত হয় না। একটা ছোট ঘটনা বা অবস্থার কথা আমার মাথায় এসে তা লতা-পল্লবিত হয়ে উঠে ক্রমে লেখবার যোগ্য আকার ধারণ করে। এই যে লতা পল্লব, তাও প্রায় মনে মনে ধ্যান করে জন্মায় না, জন্মায় বেশিরভাগ কলমের ডগায়। গোড়ায় কথাটা মনের ভিতর আকারিত হলেই আমি কলম নিয়ে বসি, তারপর কলম চলতে চলতে কথা, চিত্র ও চরিত্র আমার মাথার চারপাশে ভিড় করে এসে কলমের মুখে আত্ম-প্রকাশ করে ফেলে।"[৫৮]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্প সংকলন *দ্বিতীয় পক্ষ* (১৩২৬), *অগ্নিসংস্কার* (১৩২৭) ও *গ্রামের কথা* (১৩৩১)

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) কল্লোল সমকালীন শিল্পীদের মতো পুরাতনের অবিশ্বাসই নয়, প্রাচীন বিশ্বাসে সমূলে আঘাত হেনে ছিন্ন-ভিন্ন করার এক অদম্য পিপাসা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমকালীন লেখকদের চেয়ে তাঁর ভিন্নতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

সংশয় অবিশ্বাস, তীর্থক দৃষ্টি, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও আবেগরিক্ত পর্যবেক্ষণ প্রবণতাকে আত্মস্থ করে *কল্লোল* উত্তর যুগে যিনি সাহিত্য সাধনায় আধুনিকতার নতুন রূপ বিনির্মাণ করেন তিনি হলেন কূটেশনার যাদুকর শিল্পী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

নির্মম তিক্ত মানুষ সম্পর্কে নৈরাশ্যগ্রস্ত লেখক জগদীশ গুপ্ত মানবজীবনের নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতার আড়ালে এক ক্রুর রহস্যময় শক্তির নিগূঢ় অনুসন্ধান করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। মানবজীবনের নেতিবাচক দিক লেখককে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। সে কারণে তাঁর ছোটগল্পে মানবজীবনের স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতা প্রাধান্য পেয়েছে। জগদীশ গুপ্ত তাঁর শিল্পকর্মে মানবজীবনের কথাই লিখেছেন। আর সে শিল্পকর্ম তথা ছোটগল্পে এসেছে রোমান্টিক যৌবন স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন বর্জিত সংশয় ও অবিশ্বাসের পথে। আর এই সংশয় ও অবিশ্বাস জগদীশ গুপ্তের শিল্পীমানসের মৌল প্রবণতা। তিনি প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা, রহস্যময়তা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বরিরোধিতার অনুসন্ধান করেছেন। তিনি স্বপ্নাতুরতা, হৃদিক আবেগ, আপাত মুগ্ধতাকে আশ্রয় দিতে জানেন না। আর নৈতিক সাধারণীকরণে আস্থা তিনি কোনো কালেই পোষণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন নি। শুধু তাই নয়, জীবনের শুভ পরিণামের অনিবার্যতায় ও শুভ বোধের শেষ বিজয়ে তার আস্থা নেই। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাড়িত এই জীবনশিল্পী স্থির বিশ্বাসে জানেন, জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, সামগ্রিক পরিবেশ অর্থনৈতিক চাপ ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। তাইতো জীবনের আঁধার চোরাপথে মনোগহনের পিচ্ছিল কুটিল পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ্য পদচারণা। তিনি পিচ্ছিল পথে মানবজীবনকে দেখেছেন এবং রূপায়ণ করেছেন। এই নির্মম নির্মোহ নিরাশক্ত প্রাকৃতবাদ ফরাসি কথাশিল্পী গকুর বা জোলার শিল্পকর্মে লক্ষযোগ্য। এক কথায় আমরা বলতে পারি জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে মোট মানুষের একটি রূপ চিত্রিত হয়েছে। আর এই রূপ হলো মানুষ নীচ, কুটিল, হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন ও আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক। এ ধারাতে সংযুক্ত হয়েছে প্রকৃতি ও নিয়তি। জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প আলোচনায় এ বক্তব্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিয়তির নিষ্ঠুর আমোঘ পরিণতিতে মানুষের সকল শুভ প্রয়াস ও প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে যায় এমনি বক্তব্য নিয়ে পাঠকের সামনে জগদীশ গুপ্ত উপস্থিত হয়েছেন তাঁর *দিবসের শেষ* ছোটগল্পে। এ গল্পটি তার প্রথম দিকের লেখা।

মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তার যৌন প্রবৃত্তি। এটি মানুষের এমন এক প্রবণতা যা মানুষের সকল প্রতিরোধ ভেঙে অসতর্ক ও অসহায় মুহূর্তে লুট করে নেয় 'শয়তানি শক্তি'। এই 'শয়তানি শক্তি' মানুষের মনে অনিবার্যভাবে জেগে উঠে। লেখক জগদীশ গুপ্ত অন্তত তাই বিশ্বাস করেন। তার এ বিশ্বাসবোধ প্রতিফলিত হয়েছে *আদি কথার একটি* ছোটগল্পে। এ গল্পে লেখক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বিকার চিত্তে যৌন প্রবৃত্তির রূপায়ণ করেছেন।

কবিরাজ শ্বশুড় কিভাবে ছেলেকে বারবার বিয়ে দিয়ে পণলাভের আশায় একটির পর একটি পুত্রবধূকে হত্যা করে তার পরিচয় পাই *পয়োমুখম* গল্পে।

গুরুদয়ালের অপরাধ গল্পে আমরা দেখি অনুগৃহীত আশ্রিত গুরুদয়াল যখন হঠাৎ সম্পত্তিলাভ করে তখন তার আশ্রয় দাতা তিরিক্ষি হয়ে উঠে। এই তিরিক্ষি হয়ে উঠার কারণ আর কি কোনো দিন সে তার পদানত হয়ে থাকবে। জগদীশ গুপ্ত *পারাপার* গল্পেও মানুষের যৌন প্রবৃত্তি ও কুটিল মনকে তুলে ধরেছেন। এ গল্পে লেখক অত্যন্ত নিরাশক্তভাবে তুলে এনেছেন আমাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজের কদর্য দিকটি। জগদীশ গুপ্তের গল্পলোকে মানুষ নীচ, প্রকৃতি নিষ্ঠুর, নিয়তিও কুচক্রী। জগদীশ গুপ্ত তাঁর ছোটগল্পে মানবচরিত্রের নেতিবাচক দিক অঙ্কনের মধ্য দিয়ে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই দেখেছিলেন।

বিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিচিত্র জটিল জীবনজিজ্ঞাসা ও সামাজিক অবক্ষয়ের গল্প রচনায় মনীন্দ্রলাল বসুর (১৮৯৭-১৯৮৬) অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

ব্যক্তির বিনষ্টি মনীন্দ্রলালের অন্তরকে পীড়িত করেছে। পরিশীলিত রুচিবোধের মনীন্দ্রলাল এই পীড়ন থেকে মুক্তির স্বপ্নচিত্র আঁকেন। তিনি ১৩৫১ সালে *পরিকল্পনা* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার সূচিপত্রে গ্রন্থ পরিচয় দেয়া হয়েছে *সমস্যা ও সংকলনের কথা*

এতে *হলায়ুধের ডায়েরি* নামে একটি গল্পে হলায়ুদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি–

Dhaka University Institutional Repository

> "ভাঙ্গনের দুর্দিনে জন্মেছি বলে দুঃখ নেই, নূতন যুগকে গড়ে তোলবার, নূতন কালের স্বর্ণদ্বার উদঘাটন করবার আনন্দ আমাদেরই।"[৫৯]

মনীন্দ্রলাল কল্লোল চেতনার পূর্বসূরি হলেও তাঁর নারীরা কল্যাণী ও মোহিনী। তারা যেনো শরৎচন্দ্রের নারীদের মতো চিরন্তন বাঙালি নারীর রসধারায় অভিসিক্ত কোমল।

মনীন্দ্রলাল পুরোপুরি বাস্তববাদী শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়—

> "দৃষ্টি ও প্রকরণের বিচারে মনীন্দ্রলালকে বৈঠক-বিলাসী অভিজাত গোষ্ঠীতে অপাংক্তেয় করে রাখবার উপায় নেই। বিশ শতকের অবধারিত মধ্যবিত্ত জীবন-বেদনা ও জীবন বাসনার প্রথম সার্থক গল্পকার ইনি।"[৬০]

তাঁর গল্প সংকলন হল— *মায়াপুরী* (১৯২৩), *রক্তকমল ও সোনার হরিণ* (১৯২৪), *কল্পলতা* (১৯৩৫) ও *ঋতুপর্ণ* (১৯৩৭) ইত্যাদি।

যে কল্লোল নতুন চেতনার কথা তার বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেছিল—

> "জীবন যেখানে বারে বারে সংহত হইতেছে সেইখানেই বাঁচিবার শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। জীবনের সেই শক্তি পিঠ যৌবন ছাড়া আর কিছু নয়।"[৬১]

সেই কল্লোলের প্রাণপুরুষ প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) আর তাঁর আমৃত্যু সহযোগী গোকুল নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)। এই দুই বন্ধু সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের অভিমত—

> "গোকুল আর দীনেশ— এই দুই বন্ধুর সাধনা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রেরক ছিল একথা কিছুতেই ভোলবার নয়। ... কালক্রমে অনেক লেখক ম্লান হয়ে পড়লেও তাঁরা কখনো ম্লান হবেন না।"[৬২]

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখক সেদিন যারা এসেছিলেন, জন্ম এবং শিল্প ভাবনার বৈশিষ্ট্যেও এঁদের প্রতিষ্ঠাতা দীনেশরঞ্জন গোকুলনাগের উত্তর ভূমিতে। অর্থাৎ দীনেশ গোকুলের চেতনায় মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের অনুভব বেদনার রক্ত গোলাপ হয়ে ফুটেছিল"[৬৩]

গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) *কল্লোল* এর প্রাণের সারথি।

গোকুলচন্দ্রের পরিচয় দীনেশরঞ্জন দাশ দিয়েছেন এভাবে—

> "ফুল নিয়ে এর বেসাতি, দুনিয়ার জানোয়ার নিয়ে এর বসবাস। হৃদয় তাই ফুলের মত কোমল, মনটি তেমনি সুন্দর, আর শীর্ণদেহেও পশুজগতের প্রাণপ্রাচুর্য। অথচ মনের মধ্যে মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা। তাছাড়া ইনি চিত্রশিল্পী। আর যে অশান্তির ঝড় মানুষকে আদিম অবস্থা থেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলছে, দর্শন-কাব্য-বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে সেই অশান্তিই ওর মনে দোলা দিচ্ছে। ও বলে, যে তরুণের মনে ঝড়ের দোলা নেই, সে ত

Dhaka University Institutional Repository

> বুড়িয়ে গেছে, স্থবির ও স্থাবর। ওর অন্তরস্থ প্রভঞ্জন মূর্ত হয় ওর মুখে বাঁশের বাঁশিতে; হাতের তুলি ও রঙে।" [৬৪]

কল্লোলের চেতনা যে সব লেখকের মনে সৃষ্টির বেদনা জাগিয়ে ছিল তাঁরা হলেন—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) এবং বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন মনীশ ঘটক (১৯০১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১/১/১৯৭৬) প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ। তাঁরা আধুনিক শিল্পীদৃষ্টির অধিকারী, যুগের বিপন্নতাকে পাশ কাটাতে চান নি। তাঁরা সাধনা করেছেন নবীনতার।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়—

> "ভাবতুম রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনি সবকিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু কল্লোলে এসে আস্তে আস্তে সে ভাব কেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী।"[৬৫]

এই নতুন পৃথিবীতে, নতুন পথে এসে তাঁরা প্রথা আর শৃঙ্খলে প্রবল আঘাত হানলেন, প্রেমের প্রান্তরে দেহ দিয়ে তাঁরা নির্মাণ করলেন ভালোবাসার শরীর। সাহিত্যে স্থান পেল বিদ্রোহ, দরিদ্র নিম্নবিত্ত জীবনের প্রতি সহমর্মিতা স্বপ্ন ও সংগ্রাম বাসনা, বাস্তবপ্রীতি ব্যর্থ যৌবনের ক্ষোভ কামনা, বাসনা। সাহিত্যে সাধনা তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে—

> "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ। স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আন্দোলন।"[৬৬]

কল্লোল গোষ্ঠীর প্রধান তিন লেখকের মধ্যে একজন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৫)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "সামাজিক ভাঙ্গন আর অবক্ষয়ের পটভূমিতে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যে কল্লোল গোষ্ঠী অচিন্ত্যকুমার তাঁদেরই অগ্রণী পদাতিক। উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ভবঘুরে জীবন যাত্রা, মিথুনাসক্তি, স্থবির ও প্রতিষ্ঠিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উগ্র যৌন চেতনা ও যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা, প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের অস্বীকৃতি, আত্মবিস্তারী প্রেম চেতনা, আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তির অস্থিরতা, ব্যর্থতা, স্বপ্ন প্রবণতা: সবটা মিলিয়ে অচিন্ত্যকুমার।"[৬৭]

অচিন্ত্যকুমার জীবনকে দেখেছেন মোহমাখা দৃষ্টিতে। তাঁর প্রথম দিকের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্তের পদে পদে পরাজয়ের গ্লানি। পরম বেদনাকে রঙিন করে দেয়ার প্রয়াস যেমন তাঁর ছোটগল্পে আছে তেমনি কঠিন বাস্তবে মিশেছে রোমান্টিকতার মোহ। শহুরে মধ্যবিত্তবলয় নিয়েও তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন। তবে চাষা, ভুষা, হাড়ি, মুচি, ডোম, জেলে, মালো ও শ্রমিক প্রভৃতি গরীব মানুষের জীবনসংগ্রামের চিত্র অঙ্কনে তাঁর পক্ষপাত রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁর অভিনিবেশ অত্যন্ত তীব্র। এসব অবজ্ঞাত মানুষের জীবনের চিত্র এঁকে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সংগ্রহের মধ্যে *টুটাফুটা* (১৩৩৫), *ইতি* (১৩৩৮), *অধিবাস* (১৩৩৯), *চাষা ভুষা* (১৩৫৪), *একরাত্রি* (১৩৬৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পে নতুন শিল্পী মানসিকতার পরিচয় বিশ্লেষণ সেই সঙ্গে গোপনীয়তার প্রতি আগ্রহ তাঁর গল্পকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবী জোড়া বিপন্নতার পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) সরব সবল উপস্থিতি। তাঁর ছোটগল্পে রচনা রীতির বৈচিত্র্য রয়েছে। তবে তাঁর গল্পের উপাদান ভালোবাসা। জীবনের প্রতি মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা। ভালোবাসার বিচিত্র রূপ তাঁর গল্পকে করেছে উদ্ভাসিত। বুদ্ধদেবের গল্পে অনেক সময় প্রাধান্য পায় নস্টালজিয়া। মধুর স্মৃতি মন কেমন করা স্মৃতি, হঠাৎ বেদনা-আনন্দময় স্মৃতি তাঁর গল্পলোক উদ্ভাসিত করেছে। জীবনে রুক্ষ ধূলিধূসর বর্তমানই সব নয়। জীবনে নস্টালজিয়ারও একটা ভূমিকা রয়েছে তা বুদ্ধদেবের গল্পে বারবার ফুটে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসু মূলত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। বুদ্ধদেবের গল্পে আত্মজৈবনিক উপাদান বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের মানুষেরা এসেছে উচ্চ ও নিম্ন মধ্যচিত্ত বাঙালি সম্প্রদায় থেকে। বুদ্ধদেব আপন অভিজ্ঞতার কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। গল্পে নতুনত্ব আনতে তিনি অপরিচিত জগৎ বা পরিবেশের গুরুত্ব দেন নি। তিনি অভিজ্ঞতা দিয়েই গল্প রচনা করেছেন। এর প্রমাণ তাঁর অধিকাংশ গল্পের নায়কই তরুণ কবি, কখনো কথা সাহিত্যিক, কিংবা অধ্যাপক। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিকের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের প্রসন্নতা ও সার্থকতা; দ্বিতীয় পর্বে এসেছে বিচ্ছেদ আর ব্যর্থতা। দেহজ কামনাকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর গল্পে। অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষার মর্মদেহী যন্ত্রণা থেকেই তাঁর নায়ক-নায়িকারা নিপতিত হয়েছে তমসগুহায়। প্রেমের ছোটগল্পে বুদ্ধদেব বসু বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন । অনেক বেশি গল্প লিখলেও তাঁর আত্মমূল্যায়ন ছিল এমন—

> "খুব সম্ভব আমি স্বাভাবিক গল্প লেখক নই- আমার উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল; ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বাগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্ত্বের দিকে।"[৬৮]

অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প (১৯৩০), *এরা ওরা এবং আরো অনেক* (১৯৩২), *নতুন লেখা* (১৯৩৬), *ফেরিওয়ালা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৪১), *খাতার শেষ পাতা* (১৯৪৩) প্রভৃতি তাঁর সংকলিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

কল্লোলের আধুনিকতাবোধের উচ্ছ্বসিত উৎসাহকে উদ্দাম করে তুলেছিলেন মনীশ ঘটক (১৯০১-১৯৭৯)। কল্লোলচেতনার শিল্পী হলেও পুরোপুরি কল্লোল বলয়ে আবদ্ধ থাকেন নি। গল্পে মূলত দারিদ্র্য ও যৌনতার ক্লেদাক্ত বিকৃতির এক অসহ্য অবিচ্ছিন্নতা রূপচিত্রণে তাঁর উৎসাহ অদম্য। অসঙ্গতি বিকৃতি আর যৌন পঙ্কিলতার রূপ চিত্রণে মনীশ ঘটক এক ক্লান্তিহীন শিল্পী। অসঙ্গতি, যৌনতার ক্লেদাক্ত বিকৃতির গল্পরূপ চিত্রণে মনীশ ঘটক প্রায়ই বিস্মৃত হয়েছেন মানবিক মূল্যবোধ ও চেতনার কথা। মনীশ ঘটকের গল্প সংকলন *পটল ডাঙ্গার পাঁচালী* (১৯৫৬) । তাঁর সম্পর্কে বলা হয়—

Dhaka University Institutional Repository

> "মনীশ ঘটক অনেক স্থলেই জীবনের অন্ধকার পাতালপুরীতে সূর্যোদয়ের স্মৃতিবাহী শিল্পী চেতনার প্রচ্ছন্ন অনুভব গল্পের দেহে মনে গ্লানিমুক্ত অবসন্ন এক গতিশক্তির দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। এখানে 'যুবনাশ্ব'র স্বার্থক পরিচয়-নামে এবং সৃষ্টির স্বকীয়তায়।"[৬৯]

প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫-১৯৮৩) গল্পে রয়েছে কল্লোল চেতনার ফেনিলতা ও যৌবনের অমিত উচ্ছ্বাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয় প্রবোধকুমারকে ব্যথিত করেছে। সেকারণে তাঁর ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে নষ্ট জীবনের আরাধনা, অসঙ্গতি, অবক্ষয়, দারিদ্র্য ও অবদমিত যৌনাচার ইত্যাদি। ভবঘুরে স্বভাবের, মানুষ তাঁর গল্পে নানা রঙে চিত্রিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনই তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। এ সম্পর্কে প্রবোধকুমারের স্বীকারোক্তি—

> "পথে-ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি— স্টীমারঘাটে, চটকলের ধারে, রেলস্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলের ওয়েটিংরুমে, তীর্থপথের মেলায় ... আমি বড়লোক নিয়ে কিছু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রি, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে এইসব চরিত্র নিয়ে। কারণ তাদের জীবন যাত্রাটা চোখে দেখতে পেতুম।"[৭০]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) কল্লোলের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও শিল্প চেতনায় স্বতন্ত্র ধারার পথিক। আধুনিক ছোটগল্প রচনায় তিনি বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র অসাধারণ দক্ষতায় তিনি অঙ্কন করেছেন। বলা যায়, এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা পথিকৃতের। তিনি চেয়েছেন এসব অবজ্ঞাত কুলি-মজুরদের জীবনের জটিল রহস্য উন্মোচন করতে। এ অভিমত শৈলজানন্দেরও। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু, স্থান ও চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> "আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লাখনি এবং চরিত্রেরা সব কুলিমজুর।"[৭১]

শৈলজানন্দ কল্লোলীয় দারিদ্র্যপ্রীতি, যৌবনরাগ বর্জন করে সাঁওতাল, কয়লা খনির কুলি মজুর ও ডোম নর-নারীর ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও যৌনপ্রবৃত্তি জটিলভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এছাড়া গ্রামীণ জীবন ও শহুরে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন নিয়ে বেশ কিছু সার্থক গল্প লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল— *অতসী* (১৩৩৯), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৩৬২) ও *মিতেমিতিন* (১৩৬৭)।

বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন স্বাদের ছোটগল্প রচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। নজরুলের গল্পে রয়েছে কল্লোল যুগের উদ্দাম যৌবনের রোমান্টিক বাসনা। তাঁর গল্পে রয়েছে যৌন জটিলতা, স্বদেশী আদর্শবাদ, অশান্ত বিদ্রোহ, বস্তুভাবহীন গীতলতা, কল্পনার উচ্ছ্বাস। ফলে তাঁর গল্পে ধরেছে কবিতার রূপ— যে কবিতা কেবল কবির অন্তর্লীন ego-র সৃষ্টি। নজরুল সম্পর্কে মূল্যায়ন—

> "নজরুলের কবি আত্মা জীবন এবং যৌবনকে কেবল সম্ভোগের ও উত্তেজনার সামগ্রীরূপে দেখে নি। বেদনা ও ব্যর্থতার পবিত্র অগ্নিতে সেই

Dhaka University Institutional Repository

> কামনাচঞ্চল জীবন যৌবনকে পরিশুদ্ধ করে নিতে চেয়েছিলেন প্রেমিক নজরুল। তাই সমস্ত অস্থিরতা, আবেগের প্রচণ্ডতা, বিদ্রোহ-বাসনার শেষে তাঁর গল্পে নায়কের জীবন রিক্ত ব্যথাতুর-নিষ্ফল ও নিঃসঙ্গ।"[৭২]

তার ছোটগল্প *ব্যাথার দান* (১৯২২), *রিক্তের বেদন* (১৯২৪), *শিউলী মালা, বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী*।

কল্লোলীয় বিশ্বাসের ধারায় রচিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) ছোটগল্প।

কল্লোল যুগে আবির্ভাব সত্ত্বেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— এই ত্রয়ী সাহিত্য জগতে সৃষ্টি করেছেন এক অনন্য ধারা। তাঁরা তিন জনই ছোটগল্পের কৃতীশিল্পী। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের আগমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভাঙনের পটভূমিতে। সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭২) আসন খ্যাতির শীর্ষে। এ বক্তব্য সমর্থন করে বলা হয়েছে—

> "শৈলজানন্দ কয়লা কুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ পূর্ব-বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন— পুরানো জমিদার ঘর হইতে মালবেদে পাড়া পর্যন্ত।" [৭৩]

সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ যেমন এসেছে তারাশঙ্কয়ের গল্পে তেমনি এসেছে সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির কথা।

তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে *পাষাণপুরী* (১৯৩৩), *বেদেনী* (১৯৪৩), *হারানো সুর* (১৯৪৫), *মাটি* (১৯৫০) উল্লেখ করার মতো।

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিনিধি স্থানীয় একটি নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মূল্যায়ন হচ্ছে এমন—

> "গ্রামজীবন ও প্রকৃতির সাথে তার ব্যক্তি ও শিল্প জীবন অবিচ্ছিন্ন ছিল আমৃত্যু। একই সঙ্গে আস্তিক ও মানবধর্মে বিশ্বাসী। গার্হস্থ্য জীবনের অনন্য রূপকার। পল্লী গ্রামে সাধারণ জীবনের সাধারণ মানুষ নিয়ে তার কারবার। এরা অতি পরিচিত, খুবই বাস্তব একান্ত পরিচিত বাস্তব বিষয় ও চরিত্র প্রকৃতি সংস্পর্শে বিভূতিভূষণের গল্প এক অসামান্যতা পেয়েছে। এখানেই তিনি আধুনিক। সাধারণের অন্তরালে তিনি দেখেছেন সৌম্য শাশ্বত পরিপূর্ণ জীবন।" [৭৪]

বিভূতিভূষণ জীবনকে সমগ্ররূপ দেখেছেন। প্রবৃত্তি ও নিয়তি সারাজীবনে অন্ধ ঝড় ও অমোঘ কার্যকরণের লীলা তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনি অলৌকিক ও আধ্যাত্মবিশ্বাসের ক্রিয়াও দেখেছেন। তাঁর শিল্পকর্মেও উঠে এসেছে সমগ্র মানবজীবন ও প্রকৃতি। আর এখানেই তিনি আধুনিক। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বিভূতিভূষণ সম্পর্কে বলেন—

Dhaka University Institutional Repository

> "এমন একটি নূতন উপাদান তাহার রচনায় আছে, জলে যে ভাবে ছায়া মিশ্রিত হইয়া থাকে সেইভাবে আছে। যা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের গার্হস্থ্য উপন্যাসে ছিল না, সেটি প্রকৃতি। এটি রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের একটি নূতন সূত্র, আমাদের দেশে তো বটেই, পাশ্চাত্য দেশেও। প্রকৃতিকে জীবনের উপাদান রূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ, সে নতুন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই।"[৭৫]

প্রমথনাথ বিশী জানান, পশ্চিমের হাত হতে রবীন্দ্রনাথ এটি গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর হাত হতে রবীন্দ্রোত্তরগণ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীদের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। এখানেই বিভূতিবাবুর রচনায় নতুনত্ব দেশ ও কালের চিহ্ন। মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিনে মিলে গড়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের সাহিত্যলোক।

বিভূতিভূষণের গল্পগুলো খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে, তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতি অন্যতম উপাদান কিন্তু মানুষ-ই বিভূতিভূষণের গল্পলোকের প্রধান আকর্ষণ। তাঁর শিল্পীমানস মানবজীবনের আগ্রহী রূপকার।

মানুষ বা মানব উপাসিত দেবতাকে ঘিরেই বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে প্রকৃতি এসেছে। *কুশল পাহাড়ী* গল্পে এ সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে। *পুঁইমাচা* গল্পটি প্রমাণ করে বিভূতিভূষণ কত বড় নির্মম ও নিপুণ সহমর্মী ও জীবন সচেতন শিল্পী। গল্পের প্রধান চরিত্র কিশোরী ক্ষেন্তি সরল স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও পেটুক। বাপের সহযোগিতায় মেটে আলু চুরি করে আনা এই সরল নির্বোধ লোভী ক্ষেন্তির বিয়ে হয় এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। শ্বশুর বাড়িতে নিগ্রহ ও সন্দেহজনক মৃত্যু লেখক বর্ণনা করেছেন অসাধারণ মমতার সঙ্গে। ক্ষেন্তি গরীবের মেয়ে খেতে ভালোবাসত; তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা বড় কিছু নয়। লাঞ্ছিত হয়ে ক্ষেন্তিকে চলে যেতে হলেও থেকে যায় তারই রোপিত পুঁইমাচা।

দিবাবসান গল্পে লেখক নিসর্গ প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। এ গল্পে ছড়িয়ে আছে এক বিশেষ অনুভূতি। প্রবল প্রাণশক্তির নিঃশব্দ সমারোহ, জগৎ, প্রাণী, উদ্ভিদলোকের শক্তি উৎস সূর্যের অমীয়ধারা, বিপুল বিশ্বের জীবনাবেগ। অপরাহ্নে কথক শুয়ে আছেন আর তাঁর চারপাশে বনজ উদ্ভিদের প্রাণবন্যা সবুজের সমারোহ শান্তি আর নির্জনতা।

প্রকৃতি বর্ণনার মাঝেই মানুষের বিচরণ। এক বৃদ্ধ বর্ণনা করেন বিষ্ণুপুরের হাট ও ফসলের গল্প। এর পরই আছে রহস্যেভরা প্রকৃতির মন মাতানো বর্ণনা। আর সবকিছুর মধ্যে রয়েছে পরস্পর নির্ভরতা। এই অনুভূতিতে স্পষ্ট হয় এক বিরামহীন সুবিপুল জীবন ধারার নিঃশব্দ গতি— সেই elan vital যা সবকিছুর মধ্যে নিত্য বহমান। এই গল্পে লেখক জীবনের প্রবল নিঃশব্দ উচ্ছ্বাসের শান্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন।

প্রচলিত ধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয়—

Dhaka University Institutional Repository

> "প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে কল্লোলীয় উচ্ছ্বাস থেকে যাঁদের সাধনা বাংলা সাহিত্য ফিরে পেয়েছিল নিরুচ্ছ্বাস সংহতি ও সুসঞ্জস পরিণতি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম।"[৭৬]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে স্বতন্ত্র করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রয়োগ। কোনো সংস্কার নয়, বৈজ্ঞানিক জীবানুসন্ধানই তাঁর গল্পের মূললক্ষ্য। তাঁর ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের সফল রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে তুলে ধরার সচেতন প্রয়াস তাঁর ছোটগল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বীভৎস আদিম প্রবৃত্তির চিত্র অঙ্কনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্প সংকলনগুলো হলো— *অতসী মামী* (১৯৩৫), *প্রাগৈতিহাসিক* (১০৩৭), *আজকাল পরশুর গল্প* (১১৪৬), *লাজুক লতা* (১৯৫৪) প্রভৃতি

> "যুদ্ধোত্তর অসঙ্গতির পটে সাহিত্যচর্চা করলেও, এঁরা 'কল্লোল-' এর কোলাহল- ভাবোচ্ছ্বাস-যৌবনরাগে আকৃষ্ট হলেন না। বরং তাঁদের অন্বিষ্ট হলো হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনামিশ্রিত মানবজীবনের সদর্থক প্রান্ত।"[৭৭]

এছাড়া ছোটগল্প সমৃদ্ধির সোপানে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের ক'জন হলেন— বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), সরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৭৯), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০১-২০০২), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯৫২-১৯৮১), রবীন্দ্রনাথ মৈত্রী (১৯৭৬-১৯৩৫)। কল্লোল গোষ্ঠীর শিল্পী হলেও কবিতা উপন্যাস ও গল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) কল্লোল চেতনায় সিক্ত নন, ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। যুগ সংকটে বিপর্যস্ত মূল্যবোধের প্রতিবেশে অবলোকন করেছেন— হতাশা, বেদনা, ব্যর্থতা, আর গল্পে সন্ধান করেছেন এই হতাশা-বেদনা থেকে মুক্তির পথ। কল্লোল চেতনার মূল কুললক্ষণ প্রবল আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য বিস্ময়করভাবে মুক্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— *বেনামী বন্দর* (১৯৩০), *পুতুল ও প্রতিমা* (১৯৩১), *ধূলিধূসর* (১৯৩৮), *সপ্তপদী* (১৯৫৩), *নানা রঙে বোনা* (১৯৬০), *মৃত্তিকা* (১৯৩৫), *প্রতিশোধ* (১৯৪১) প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভাবালুতাহীন, অনাড়ম্বর অথচ গল্পকার হিসেবে সমধিক পরিচিতি।

তথ্যনির্দেশ :

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের পুত্তলিকা*,(কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ:৬

২। প্রাগুক্ত

৩। ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ৪৮

৪। প্রমথনাথ বিশী : *বঙ্কিম সরণী*, (কলকাতা, ১৩৭৩), পৃ: ২৪১

৫। সুধাকর চট্টোপাধ্যায় : *কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*, (কলকাতা, ১৩৮৯), পৃ: ১৮০

৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৭। ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত , পৃ: ৬৯

৮। সেলিনা হোসেন (সম্পাদক) : *একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯*, (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ: ১০৪

৯। ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৭

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮

১১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৬

১২। শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প*, (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ: ৫৫

১৩। সৈয়দ আকরম হোসেন: *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ: ১০১-০২

১৪। প্রাগুক্ত : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, চেতনালোক ও শিল্পরূপ*,(ঢাকা, ১৩৮৮/১৯৮১), পৃ: ৪৮ ।

১৫। প্রমথনাথ বিশী : *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*,(কলকাতা,১৩১৮), পৃ: ৩৯ ।

১৬। সৈয়দ আকরম হোসেন : প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮

১৭। প্রমথনাথ বিশী : *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, (কলকাতা, ১৩১৮), পৃ: ৮

১৮। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস*, (কলকাতা, ১৩৭২) পৃ: ২০

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২

২০। আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা*, (ঢাকা, ১৩৭৬), পৃ: ১২৯

২১। আনোয়ার পাশা, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০

২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *গল্পগুচ্ছ*, (কলকাতা, ১৯৬৪), পৃ: ৪২

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭১

২৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত , পৃ: ৪৩

২৫। আনোয়ার পাশা: প্রাগুক্ত , পৃ: ১২

২৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮

২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রবীন্দ্র- রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, (কলকাতা, ১৩৪৯), পৃ: ৫৪০

২৮। নীরদচন্দ্র চৌধুরী : *বাঙালী জীবনে রমণী*, (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ: ১১৬-১৭

২৯। ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ১২০

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২২

৩১। আনোয়ার পাশা : প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮

৩২। ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ১২০

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৭

৩৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৯

৩৫। সৈয়দ আকরম হোসেন : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, (ঢাকা, ২০০১), পৃ: ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪০

৩৭। ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩২

৩৮। ক্ষেত্র গুপ্ত : রবীন্দ্র গল্প: *অন্য রবীন্দ্রনাথ*, (কলকাতা, ১৯৮৪), পৃ: ২১৯

৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রাগুক্ত, পৃ:

৪০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৫

৪১। অশ্রুকুমার শিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ: ২৩-২৪

৪২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০

৪৩। শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প*, (১৯৮৩), পৃ: ১৭৮-৭৯)

৪৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৪

৪৫। ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৯

৪৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬২

৪৭। সেলিনা হোসেন (সম্পাদক) : *একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯* : বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৯১) প্রবন্ধ : বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলা ছোটগল্পে রূপ-রূপান্তর, পৃ: ১১৩

৪৮। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৮

৪৯। উদ্বৃত-শিশিরকুমার দাশ : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৬

৫০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *সাহিত্যে ছোটগল্প*, (কলকাতা, ১৩৬৩), পৃ: ১৪১

৫১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯-১৮০

৫২। রতন সিদ্দিকী (সম্পাদক) : *কালান্তর*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ঢাকা, ১৯৯৭), পৃ: ১৮৪

৫৩। বুদ্ধদেব বসু : *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ: ৫৬২-৮৩

৫৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*, (কলকাতা, ১৩৯৫), পৃ: ৪৭

৫৫। শ্রী ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭৫

৫৬। জীবেন্দ্র সিংহরায়: *কল্লোলের কাল*, (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ:১৩০

৫৭। শ্রী ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৫-১৬

৫৮। প্রাগুক্ত পৃ: ৩১৭

৫৯। প্রাগুক্ত পৃ: ৩২২

৬০। জীবেন্দ্র সিংহরায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ২০

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০

৬২। শ্রী ভূদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৩

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৫

৬৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭

৬৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৮

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮

৬৮। শ্রী ভুদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫৪

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৪

৭০। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সম্পাদক) : *গল্প লেখার গল্প*, (কলকাতা, ১৩৫০), পৃ: ৮২

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০

৭২। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৭

৭৩। শ্রী ভুদেব চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১১

৭৪। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী: *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*, (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ১৭

৭৫। জগদীশ ভট্টাচার্য : *বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প*, (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ:১৮

৭৬। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৫

৭৭। সেলিনা হোসেন (সম্পাদক) : প্রাগুক্ত, পৃ:১৩০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি

সমাজ পরিচালিত হয় বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে। সমাজ বিভিন্ন সময়ে তার রূপও পরিবর্তন করে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা পরিবর্তন ঘটায়। সাংস্কৃতিক চেতনা আবার অনেক সময় অর্থনীতির ভিত্তির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। অর্থনীতির সংগে নিবিরভাবে জড়িত জীবন ও সমাজের পরিবর্তন। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষের মন্তব্য—

> "জীবন ও সমাজের ভীত হল অর্থনীতি। সেই অর্থব্যবস্থার কোনো ভাঙন ও পরিবর্তন ঘটলে সমাজজীবনের অন্যান্য স্তরেও আবর্তের সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে নতুন স্রোতও সঞ্চারিত হতে থাকে।"[১]

বলা যায় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো পাশাপাশি থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। আঠারো শতকের আগের সময়কে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যুগ বলা যায়। আঠারো শতকে সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

এই সমাজ ব্যবস্থা হল পুঁজিবাদ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ ও তাদের শাসন কার্যক্রম পরিচালনার প্রায় চার দশক পর এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রকাশমান হতে থাকে। এদেশে ইংরেজ শাসনের ফলে যে পরিবর্তন আসে নাজমুল করিম তা এভাবে তুলে ধরেছেন—

> "The emergence of new social class in the sub-continent is the direct result of the british rule. British rule brreght in a new economy admininistrative machinery and a new educational system.
>
> The folloing are the social classes, in the rural areas created as a result of the British rule with new tone and orientation :
>
> (1) The new class of landlords created by the British.
>
> (2) The tanants under this landlords.
>
> (3) The class of peasant propereties divided into

Dhaka University Institutional Repository

upper,middle and lower strata.

(4) Modern marchant class.

(5) Modern money lander class.

similarly in the urban areas new classes came into enistance with the new economy. The most improtant of theme are the following:

(1) The modern class of capitalists, commercial, industrial and finantial.

(2) The modern working class.

(3) The class of petty traders and shopkepers.

(4) The professional classes such as the technicians, physicians, lowyears, teachers, journalists, managers of firms, clerks, and others comprising the intelligentsia and educated middle class."[২]

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূচনা হয় মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকে। এর আগে উত্তর ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আসন দখল করেছিল। কিন্তু মুর্শিদ কুলি খানের সময় থেকে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। তিনি বাঙালি হিন্দুদের রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেন। একটি ঐতিহাসিক বিবরণে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়–

> "রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলি খানের সদাজাগ্রত দৃষ্টি যখন অর্থলোলুপতায় পরিণত হল, তখন সামন্ত ও জমিদারদের ওপর তাঁর অত্যাচারের আর সীমা রইল না। তাঁর প্রবর্তিত 'মাল জামিনী' ব্যবস্থায় এইসব রাজা ও জমিদারদের পতন যেমন অনিবার্য হয়ে উঠল, তেমনি অভ্যুত্থান ঘটল নতুন রাজস্ব সংগ্রাহক ইজারাদারদের। এই ইজারাদারেরা দু-তিন পুরুষের মধ্যেই পুরনো জমিদারদের স্থান দখল করে ফেললেন এবং পরিচিত হলেন 'জমিদার', 'রাজা', 'মহারাজা' হিসেবে। ইজারাদার হিসেবে মুর্শিদকুলি খান কেবল বাঙালি হিন্দুদেরকেই নিয়োগ করতেন।... উচ্চ সরকারি চাকুরিতে এতদিন পর্যন্ত উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদেরকেই নিয়োগ করা হত : এই প্রথার ব্যতিক্রম করে তিনি সমস্ত ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরবর্তী নবাবেরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো বিজাতীয় শাসকরা পতনকালে এদেশের স্থানীয় ভাষাভাষী-দের দিয়ে শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার প্রয়াস চালায়। এক্ষেত্রে একমাত্র সহায় ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রসর অংশ। নিম্ন বর্গের হিন্দু ও মুসলমানরা যোগ্যতা না থাকায় এ সুবিধা পায় নি। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মত—

> "স্বাভাবিকভাবেই এই সব বাঙালি ইজারাদার ও কর্মচারী তাঁদের নিয়োগ করতে হয়েছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে থেকে; কারণ তৎকালীন বাঙলার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙালি মুসলমানেরা (বৌদ্ধ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত) ছিল পশ্চাৎবর্তী। ঐসব উচ্চ অবস্থানে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা তখনও তাদের হয়নি। নিম্ন বর্ণের হিন্দুদেরও সে যোগ্যতা ছিল না। বাঙালিদের মধ্যে সে যোগ্যতা ছিল একমাত্র ব্রাহ্মণ-কৈবদ্য কায়স্থদের।"[৪]

এই প্রক্রিয়ায় প্রথম বাঙালির একটি অংশ রাষ্ট্রের কার্যক্রমে অংশ নেয়। এই শ্রেণিটিকে সে সময়কার মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ তাদের উপরে অবস্থান করে মুসলিম রাজশক্তি আর নিচে প্রজা সাধারণ।

কিন্তু মুসলিম রাজশক্তি বাংলার শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে নি। সুদূর ইউরোপ থেকে যে বণিকরা এখানে বাণিজ্যের জন্য এসেছিল তারাই এখানকার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তাদের এই প্রয়াস অবশেষে সফল হয় ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন নবাব সিরাজউদ-দৌলার সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে।

নবাবী আমলের শেষ সময়ের মতো ইংরেজরাও তাদের শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য বাঙালিদের মধ্য থেকে কর্মচারী নিয়োগ করা শুরু করে। ফলে আঠারো শতকে যেসব পেশাজীবী পাওয়া যায় তারা হলো মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, বেনিয়ান, মুনসি, সরকার ইত্যাদি। সে সময় নবাব, উজির, দেওয়ান, সিপাহশালার, জমিদারদের পাশাপাশি জায়গিরদার, মজুমদার, নায়েব, ইজারাদার, রাজা-মহারাজা, মোক্তার, কানুনগো, সওদাগর, আড়তদার, ঠিকাদার, পাইকার, মজুদদার, মহাজন, বেপারি, গোমস্তা দালাল ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের লোক ছিল।

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা বিহার ওড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে লাভ করে শাসন ক্ষমতা, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এই তিনটি ঘটনা এখানে নতুন একটি শক্তি গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

এসব ঘটনার পর যে একটি নতুন অর্থনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিনয় ঘোষের লেখায়। তিন জানান—

> "জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, শোভাবাজারের রাজ-পরিবার, হাটখোলার দত্ত-পরিবার, কুমোরটোলার মিত্র-পরিবার, জোড়াসাঁকোর ঘোষ-পরিবার,

Dhaka University Institutional Repository

> পাইকপাড়ার সিংহ-পরিবার, সিমলার দে-পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহ-পরিবার, কলুটোলার শীল-পরিবার, রামবাগানের দত্ত-পরিবার, বহুবাজারের বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবার, কলুটোলার সেন-পরিবার, মলাঙ্গার দত্ত-পরিবার, ও পাথুরিয়াঘাটার কয়েকটি বিখ্যাত পরিবার অর্থ বিত্ত অর্জন করে প্রভাবশালী পরিবার হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আঠারো শতকের শেষ কয়েক দশকের মধ্যে, এবং এই পরিবার সমূহের প্রতিষ্ঠাতারা আর্থিক উন্নতির সিঁড়ি ডিঙিয়েছেন ইংরেজের মুৎসুদ্দিগিরি করে।" [৫]

নতুন গড়ে ওঠা শক্তির বাইরে থাকে বিশাল একজনগোষ্ঠী। তারা শোষিত হতে থাকে ইংরেজদের হাতে। এই শ্রেণির মানুষ বাঁচার তাগিদে বার বার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায়ের অভিমত—

> "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পশ্চাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল দেশে অধিবাসীগণের মধ্য হইতে এমন একটি নতুন শ্রেণী তৈরী করা যে শ্রেণী- এই দেশে ইংরেজ শাসনের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া জনসাধারণের অর্থাৎ বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধানল হইতে এই শাসনকে রক্ষা করিতে ভারতবর্ষের সকল ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলে যে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তাহার প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করা ইংরেজ রাজশক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল।... এই জন্যই ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের আঘাত হইতে নব প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শাসনকে বাঁচাইবার জন্য দেশের মধ্যেই একদল কায়েমি স্বার্থ সম্পন্ন সমর্থক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগণ নিজেদের কৃষক শোষণের অবাধ অধিকার জমিদার গোষ্ঠীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং এইভাবে নবসৃষ্ট জমিদার গোষ্ঠীকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইলেন।... চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট ভূস্বামীগোষ্ঠীই প্রতি বৎসর কৃষকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভূমি-রাজস্ব হিসাবে শাসকদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।... এই বন্দোবস্তের ফলে জনসাধারণের জন্য অংশ- ভূস্বামী ও তালুকদারগণ কৃষক-লুণ্ঠনের যে ভাগ পাইল তাহার পরিবর্তে প্রভু ইংরেজ শাসকগণকে কৃষক জনসাধারণের বিদ্রোহের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। [৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে—

> "পিটের মন্ত্রিত্বে 'ভারতের জমিদারদের বংশানুক্রমিক ভূস্বামী হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে কায়েম করার বিল পাশ হল। বিস্মিত জমিদারদের কী আনন্দ যখন ১৭৯৩- এর মার্চে এ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল কলিকাতায়। এ ব্যবস্থা যতটা অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ততটা বেআইনীও বটে, কেননা

Dhaka University Institutional Repository

> জাতি হিসেবে হিন্দুদের জন্য বিধান সৃষ্টি করা এবং যতদূর সম্ভব তাদেরি আইন তাদের প্রতি প্রয়োগ করার কথা ছিল ইংরেজদের। একই সঙ্গে ইংরেজ সরকার জমিদারদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে প্রতিকারের সুযোগ রাইয়তদের দিয়ে এবং খাজনা বৃদ্ধি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য কয়েকটি আইন পাশ করে। দেশের অবস্থা বিবেচনা করলে এগুলি অকার্যকরী এবং অপ্রচলিত হতে বাধ্য; কেননা রাইয়তরা জমিদারের এত বেশী অধীনে ছিল যে, আত্মরক্ষার জন্য কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত তোলার দুঃসাহস তাদের হত কদাচিৎ।- উপরোক্ত বিধিগুলোর একটি হল জমির খাজনা চিরকালের জন্য ঠিক করে দেওয়া। এতে নির্দেশ দেওয়া হয় কে ভোগসর্ত এবং বাৎসরিক খাজনা কতটা দিতে হবে সেই সংক্রান্ত একটি অলিখিত দলিল বা পাট্টা রাইয়তদের দিতে হবে। এ বিধির ফলে নূতন জমি চাষ করে ভূসম্পত্তির মূল্যে এবং যে শস্যের দাম বেশী সেরূপ-শস্য-বোনা-জমির খাজনা বৃদ্ধি করার অধিকার পায় জমিদাররা।"[৭]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি ব্রিটিশদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোস্তের মাধ্যমে যে ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয় তা ব্রিটিশদের শোষণ প্রক্রিয়ার সহযোগী হিসেবে কাজ করে।"[৮]

১৮৩৫ সালের আগে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব সীমিতই ছিল। এই সীমিত সংখ্যক মধ্যবিত্ত উঠে আসেন নিজ প্রচেষ্টায়। তবে উনিশ শতকের শুরু থেকে এই আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূচনা কাল হিসেবে ধরা যায়। আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে ইংরেজি মাধ্যমে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মেকেলের মন্তব্য ছিল এমন—

> "এখন আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য যে শ্রেণীর লোকেরা হবে আমাদের ও আমরা যে কোটি কোটি লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানকারী; এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ ।"[৯]

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সময়ের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ব্যবসা বাণিজ্য এ সময় সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে শক্তি অর্জন করে। ফলে সামন্ত বাদের পতন শুরু হয়। এই অগ্রসর শ্রেণিরই একটি অংশ নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পথ অনুসরণ করে। ফলে এদের মধ্য থেকে অনেকেই চাকরিজীবী, উকিল, ব্যারিস্টার, মোক্তার, চিকিৎসক, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিকসহ নানা পেশায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসনাধীন বাঙালি জমিদার, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী মহাজনদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি ধরা যায়। অন্যদিকে এদের একটি অংশ যারা অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল তারা বাঙালিদের মধ্য থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির সুবিধা ভোগ করেছেন। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এই শ্রেণিটিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে—

> "ইংরেজ আমলে এদেশের ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত ছিল শ্বেতকায় শাসকরা, আর সর্বনিম্নে ছিল বিপুল জনগণ- কৃষক, কারিগর, শ্রমিক। বাঙালি জমিদার, চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী-মহাজনদের অবস্থান ছিল এই দুই স্তরের মাঝামাঝিতে। এ বিষয়ে বিবেচনা করে এদের সকলকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে এরা পালন করেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই ভূমিকা। ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থার কথা স্মৃতিতে না রেখে এবং শাসক ইংরেজদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু বাঙালি সমাজের কথা বিচার করলে, সেকালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জমিদার-ব্যবসায়ী-আমলারা উচ্চ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হয়, মধ্য শ্রেণীর নয়।
>
> এ গ্রন্থে এই শ্রেণীকে আমরা মধ্য শ্রেণী বলে অভিহিত করেছি ব্রিটিশ শাসিত বাঙলার আর্থসামাজিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের বাস্তব অবস্থান ও সামাজিক ভূমিকা বিচার করে।"[১০]

আঠারো শতকে মুসলিম জনগোষ্ঠী এই ধারায় অগ্রসর হতে পারে নি। উনবিংশ শতকে মুসলমানরা এই ধারায় সামিল হয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির যে বিকাশ ধারা পরিলক্ষিত হয় এ সমস্ত নানা কারণ মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে বিলম্ব ঘটায়। এ সম্পর্কে নাজমুল করিম বলেন—

> "Thus for many political, religious, and social reasons, Muslimes were slow to take to western education and therfore were left behind".[১১]

মুসলমানরা ইংরেজদের সমস্ত কার্যকলাপ সন্দেহের চোখে দেখত এবং তারা মনে করত ইংরেজদের সংস্পর্শে এলে ইসলামের মূল অবস্থা বিকৃতরূপ ধারণ করবে। ১৯৮১ সালের census report থেকে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুতার চিত্র পাওয়া যায়। এ সময়ে মুসলমানরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন মুহম্মদ ইদরিস আলী এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মন্তব্য—

> "আধুনিক শিক্ষায় মুসলিমদের অবস্থা উনিশ শতকে ছিল করুণতর। উনিশ শতকে শাসকদের শিক্ষানীতি আর্থিক অবস্থানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুসলিমদের অনুকূলে ছিলনা, তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যই এ শিক্ষা তখন কল্যাণকর হয়। ব্যাপক হারে নতুন শিক্ষা গ্রহণ করার ফলেই হিন্দুরা

Dhaka University Institutional Repository

পেশাজীবী মধ্যবিত্ত হিসাবেও নিজেদের প্রায় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।"[১২]

ব্রিটিশরা তাদের দ্বৈতনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশে সহযোগিতা করে। এক সময় তারা দেখতে পেল যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুধু ব্রিটিশদের সত্তাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে না এমন নয়, তারা তাদের স্বকীয় চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে চাইছে। আর ব্রিটিশরা তাদের উপর যে দাসত্বের শৃঙ্খল চাপিয়ে দিচ্ছিল তার সমালোচনা ইন্ডিয়ান কংগ্রেস পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতি তাদের অবিচার বুঝতে পেরে তাদের মধ্য থেকে একটি শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব ঘটাতে সাহার্য করে। নাজমুল করিমের ভাষায়—

> "At this time the British government rellized that they should abandon their policy of hostility towards the muslim community, the muslim upper classes and the potential sections of the muslim population from which the muslim middle class could be formed." [১৩]

মূলত ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে শোষক ইংরেজ জাতি একটি চাটুকার শ্রেণির উদ্ভব ঘটাতে চেয়েছিল। যে কারণে দেখা যায় কেরানির সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সে হারে চিকিৎসক, প্রকৌশলী আইনজীবী ইত্যাদি শ্রেণির বিকাশ ঘটে নি।

ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনের পর হিন্দু বেনিয়ান, মুন্সী, মুৎসুদ্দি, গোমস্তা এ ধরনের লোকরাই ইংরেজদের বেশি অনুগ্রহ পেয়েছিল। কারণ ব্যবসায় শাসন, শোষণ করতে গিয়ে ইংরেজরা এদের সঙ্গেই সর্বপ্রথম সু-সম্পর্ক তৈরীর সুযোগ পায়। অপরদিকে এসব সুযোগ সুবিধা থেকে মুসলমানেরা বঞ্চিত হয়। কারণ হিসেবে বলা যায় ধর্মীয় কারণে মুসলমানরা ব্রিটিশদের সন্দেহের চোখে দেখত, ঠিক একই সময়ে ব্রিটিশদের অনুগ্রহ পুষ্ট হয়ে হিন্দু বেনিয়ান, মুন্সি, মুৎসুদ্দিরা ক্রমেই প্রতাপশালী হয়ে উঠল। অন্যদিকে এই শ্রেণি সমূহের স্বার্থেই ইংরেজরা রাষ্ট্রীয় আইন তৈরী করল। এই আইনের মারপ্যাঁচে মুসলিম অভিজাত শ্রেণি তাদের জমিদারি যায়গিরদারি তালুকদারি সবই হারাল। আর হিন্দু শ্রেণি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে নতুন অভিজাত শ্রেণি প্রতিষ্ঠা করল।

তবে সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আব্দুল লতিফ, নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব আব্দুল গণি এবং নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রমুখ ব্রিটিশদের খুব কাছাকাছি যান এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের সুবিধাদি আদায় করতে বিপ্লবী ভূমিকা রাখেন। আর সেটা হচ্ছে মুসলমানরা এমন কিছু পদ অলংকৃত করেন যেটা ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের জন্য তৈরী করেছিল। এভাবেই ক্রমান্বয়ে মুসলিম Middle Class এর দ্রুত বিকাশ ঘটে।

প্রকৃত পক্ষেই ১৮৫০ থেকে ১৮৭৫ এই সময়ে মুসলিম সমাজের পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে ফরায়েজি, ওহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ অহম্মদ খান ১৮৭৫ সালে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই কলেজ মুসলিম শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। একজন ছাত্রের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয় এবং এর মাধ্যমেই মুসলমানদের নব জাগরণ শুরু হয়। ১৮৮০ সালে এখান থেকে দুইশ' বিশ জন Student আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলিম জাতির কর্ণধারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে এই বিদ্যাপীঠ স্বীয় উজ্জ্বল মহিমার কারণে আলীগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। শুধু তাই নয় গোটা মুসলিম বাঙালির রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয় এবং মুসলিম সমাজ হিন্দুদের সমকক্ষ শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার পথে অনেকটা অগ্রসর হয়।

একথা সত্য যে এদেশের শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান কোনো সম্প্রদায়কেই ইংরেজ শাসকরা দেশের দায়িত্বশীল কাজকর্মে সম্পূর্ণভাবে চাইতো না। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিচার প্রসঙ্গে আমাদের এই কথা মনে রাখা দরকার। বিশ শতকের প্রথম দিকে এই শ্রেণির মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানদের এ শ্রেণির বড় অংশই হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে এই শ্রেণির প্রগতিশীল একটি অংশ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয় গড়ার চেষ্টা করলেও তা সফল হয় নি। হিন্দু ও মুসলমানদের এই বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার পেছনে শাসক ইংরেজদের বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন চালানোর নীতিও ইন্ধন যুগিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পর ভারতীয় উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। এই শ্রেণির হিন্দু অংশ নেতৃত্ব দেয় ভারতের ও মুসলমান অংশ নেতৃত্ব দেয় পাকিস্তানের।

কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রও টিকে নি। পশ্চিম পাকিস্তানিরা স্বাধীন রাষ্ট্রের সূচনা লগ্নে বিভেদ ও শোষণ নীতি চালু করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা শোষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে বাঙালি নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। শক্তিশালী হয়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাঙালি প্রথম স্বাধীন একটি দেশ পায়। নতুন পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানুষ তিন দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত করে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাবনা ছিল এমন–

> "বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানরা দেখতে পেল যে যতদিন খাজা সাহেবদের হাতে নেতৃত্ব থাকবে ততদিন শিক্ষিত মুসলমানদের রাজনীতিতে স্থান হবে না। ফলে একদিকে মুসলিম সংহতি অন্যদিকে একদল অশিক্ষিত খাজার নেতৃত্বে-বাংলার মুসলমানদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ– এ দুয়ের মানসিক-সংঘাত মুসলমান ভোটারা কোন কিছু মনস্থির করতে না

Dhaka University Institutional Repository

পেরে আবোল তাবোল ভোটিং হয়ে গেল-ফলে কোন পার্টিই জিতল না। নাজিমুদ্দীন সাহেব পরাজিত হলেন।"[১৪]

বাংলাদেশের বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের অনুগ্রহ পুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্তরাধিকার। ফলে এদের একটি অংশের মানসিকতাও একই রকম। এ সম্পর্কে মুহম্মদ ইদরিস আলীর মন্তব্য—

> "...ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের দেওয়ানী লাভের পর থেকে শাসকদের অনুগ্রহপুষ্ট যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়, সে শ্রেণীর এই বিকাশ-প্রক্রিয়া পাকিস্তান আমলের শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আলোচ্যকালের বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনামলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই ঐতিহ্যবাহী।" [১৫]

অন্য অংশটি প্রগতিশীল চিন্তাকে ধারণ করে অগ্রসর হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়—

> "-আজকের বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে এবং আধুনিক মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ ইংরেজ-শাসকদের ঐতিহ্যানুসারী আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি, ১৯০৫-৫৩ সালে জমিদারী প্রথার বিলোপ, পাকিস্তানী শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতি ও পদক্ষেপসমূহ সীমিত পরিমাণের শিল্পায়ন ও নগরায়ন, উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে ভাষা-আন্দোলন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন আন্দোলন অবদান যুগিয়েছিল। আর এই সব আন্দোলন-সংগঠন পরিকল্পনায় মধ্যবিত্তের একটি অংশভুক্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মীরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"[১৬]

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত একটি অংশের অর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতি হয়। বিশেষভাবে এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধের পর। কেননা এই যুদ্ধের পর মারোয়াড়ী ও হিন্দু পুঁজি ভারতে চলে যায়। এই শূন্য স্থান দখল করার সুযোগ পায় একটি নতুন বাঙালি ধনিকগোষ্ঠী। এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ এম. এম. আকাশের মূল্যায়ন তুলে ধরা যেতে পারে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—

> "১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর মারোয়াড়ী ও হিন্দু পুঁজি এদেশ থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে যায়। তখন শত্রু সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট শূন্যতা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাকে আশ্রয় করে এদেশে দ্রুত একটি বাঙালী ধনিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তবে তারা ছিল পাকিস্তানী পুঁজিপতিদেরই কনিষ্ঠ অংশীদার। জাতীয়বাদী আন্দোলনকে তারা সমর্থন করেছিলেন সেটাকে lever হিসাবে ব্যবহার করে রাষ্ট্র থেকে কিছুটা বাড়তি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে এই মুৎসুদ্দী ধরনের পুঁজিপতিরা অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় বা বিরোধী ভূমিকা পালন করে ছিলেন।"[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষক শ্রেণি থেকে একটি বর্জুয়া শ্রেণির বিকাশ ঘটে। এ সম্পর্কে এম. এম. আকাশের অভিমত—

> "রেহমান সোবহান, বারনভ ও ড: ফারুক প্রদত্ত তথ্যাবলী থেকে বোঝা যায় যে, প্রাক-স্বাধীনতাকালীন ট্রাডিশনাল বাঙালী বুর্জোয়াদের অধিকাংশের পিতাই ছিলেন ক্ষুদে ব্যবসায়ী অথবা কৃষক। অর্থাৎ এরা কেউই উত্তরাধিকার সূত্রে বড়লোক ছিলেন না। এরা ছিলেন প্রথম-পুরুষ উদ্দ্যোক্তা। এসব উদেআক্তা নিজেদের কর্মজীবনও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে ক্ষুদে ব্যবসায়ী বা ক্ষুদে কর্মচারী হিসাবে। অর্থাৎ এর সম্পদ সঞ্চয় করেছেন ধীরে ধীরে দ্রুত ধনিক এরা নন। তবে শিল্প বা কল-কারখানা বা কোন উৎপাদনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে তারা পুঁজি সঞ্চয় করেন নি। মূলতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঠিকাদারী বা সরবরাহ ব্যবসা, খুচরা ব্যবসা, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং কন্ট্রাক্টরীর মাধ্যমে তারা তাদের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করেন। তবে এভাবে অর্থ সংগ্রহের পর অনেকেই মাঝারি আকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান, পরিবহণ ব্যবসা, আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা এবং গৃহ ও জমির ক্রয়-বিক্রয় উদ্যোগে টাকা খাটাতে থাকেন। এই পর্যায়ে ১৯৬০ এর দশকে তাদের সকলেই নানাভাবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে শুরু করেন। এই রাষ্ট্রীয় সহায়তাকে আশ্রয় করেই এরা বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ এবং কেউ কেউ এমনকি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এদের কেউ কেউ মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কেউবা মন্ত্রী হন। এই ভাবে এরা পাকিস্তানী বৃহৎ বুর্জোয়াদের কনিষ্ঠ অংশীদারে পরিণত হন।"[১৮]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। এ সম্পর্কে বলা হয়—

> "১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত একটি শ্রেণীর উন্মেষের সুযোগ এনে দেয়। আগে এ শ্রেণীটি ভূ-স্বামী ও শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমিত ছিল।"[১৯]

> "লিবারেল প্রোফেশন (liberal profession) জমি, স্থাবর সম্পত্তি (Real Estate) ইত্যাদি ক্ষেত্রে শূন্যস্থান পূরণের জন্য বাঙালী মুসলমানদের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। পাটের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী চাষী বা অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তর থেকেও কিছু লোক উচ্চ শিক্ষাকে পুঁজি করে উপরে উঠে আসে। ১৯৬০ সাল নাগাদ তৈরী হয় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত স্তর।"[২০]

এ পর্যায়ে মধ্যবিত্তের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস চালানো যায়। আর মধ্যবিত্তের পরিপূর্ণ অনুসন্ধানে এ শ্রেণিতে কতগুলো উপ-বিভাগ রয়েছে তা জানা জরুরি। একই সঙ্গে সিদ্ধান্তে আসতে হবে এই শ্রেণির মানসলোক ও সামাজিক ভূমিকা কি ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা ও উপবিভাগ—

মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি। এই শ্রেণির উপরে নিচে রয়েছে আরো দুটি স্তর। এর একটি হল উচ্চবিত্ত যাদের অবস্থান মধ্যবিত্তের উপরে। আর অন্য শ্রেণিটি হল বিত্তহীন। যাদের অবস্থান সমাজের সবচেয়ে নিচু তলায়। অবস্থান বিবেচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব জটিলতর। কেননা এই শ্রেণির প্রথম তিন প্রবণতা আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এর একটি হল স্বঅবস্থান ধরে রাখা, দ্বিতীয়ত উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তৃতীয়ত বিত্তহীন শ্রেণিতে নেমে আসার আশঙ্কা। এই ত্রিধা মধ্যবিত্তের মানসলোকে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

মধ্যবিত্তের মানসপ্রবণতা জানতে হলে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ জরুরি। তবে এ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়। থাকে ভুল বোঝার আশঙ্কা। সে আশঙ্কা নিয়ে আমরা মধ্যবিত্তের স্বরূপ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বেছে নিতে পারি ইংল্যান্ডকে। কেননা ভারতবর্ষ ও আমাদের বিচার্য বিষয়ে এর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। কাজেই দেখা যেতে পারে ইংল্যান্ডে কাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিকাশের শুরুতে বুর্জোয়ারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। সেখানে এমনটি হবার কারণ বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী সঞ্চয় থেকে সম্পদের মালিক হয়, কিন্তু ভূ-স্বামীরা সনাতন ভিত্তিতে কেবল ভূমি নিয়ন্ত্রণের ওপরে নির্ভরশীল থেকে যায়।

ভূস্বামী বা ব্যারন'দের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন অবস্থান নেয়ায় সেখানে বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মধ্যবিত্তের সেই শ্রেণিচরিত্র স্থায়ী রূপ পায় নি পরবর্তীকালে মানসিকতায় পরিবর্তন আসে। পরিবর্তিত মানসিকতায় ইংল্যান্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে এমন কি বর্তমান যুগের ভারতেও বুর্জোয়া'রা সর্বোচ্চ মর্যাদা ভোগকারী প্রভাবশালী শ্রেণি এবং তাই সে সব দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে বুঝায় বুর্জোয়াদেরকে।

একথা সত্য যে, পাশ্চাত্যে 'বুর্জোয়ারা সমাজ পরিবর্তনে যে স্বাধীন ভূমিকা পালন করে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি তেমন স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারে নি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি চিহ্নিত করণে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়টি গরুত্বপূর্ণ । আধুনিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে ধরা যায়। এ আলোকে আমরা বলতে পারি—

> "মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিত্তবানের সংস্কৃতির অনুসারী। ভূমি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ কায়িক শ্রমে নিয়োজিত লোকদের পরিশ্রমজাত সম্পদের একটি অংশই এই শ্রেণী ভোগ করে, অথচ এরা নিজেরা সাধারণত কোন কায়িক শ্রমের কাজ করে না। বুদ্ধি কিংবা বিদ্যা এদের প্রধান অবলম্বন। এই শ্রেণী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী আধুনিকায়নে প্রতি বিকাশ লাভ করে। এদের মধ্য থেকেই আধুনিক বিত্তবানের (বুর্জোয়া পুঁজিপতি) উদ্ভব হতে পারে।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কেউ নেমে আসতে পারে সর্বহারা শ্রেণীতে। সম্ভবত একারণেই কোনো কোনো সমাজতত্ত্ববিদ মধ্যবিত্তকে একটি শ্রেণি হিসেবে ধরতে চান না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তকে প্রধানত চারটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায় (১) বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত (২) শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত (৩) ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত (৪) পেশাজীবী মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্তকে আবার উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্য মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও এসব উপবিভাগে বিন্যস্ত করা চলে।

উচ্চ মধ্যবিত্ত : মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপরিভাগে এদের অবস্থান। এরাই মূলত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষকর্তা, বড় ও মাঝারি ব্যবসায়ী, কালোবাজারি এবং মধ্যস্বত্বভোগী এদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভালো। উদ্বৃত্ত অর্থও রয়েছে। কৃত্রিম অভাব পূরণের সাহস ও সামর্থ্য আছে। এ শ্রেণিতে সংখ্যা লঘু হিসেবে আছেন দেশ প্রেমিক বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রবক্তা।

মধ্য মধ্যবিত্ত : এ শ্রেণির প্রাচুর্য ও অভাব কোনোটাই প্রবল নয়। আনলিমিটেড অর্থাগমের কোনো উৎস নেই, আয় সীমাবদ্ধ। খরচের আগে ফর্দ করে নিতে হয়। তবে বিলাসিতা এবং আদর্শকে সমান্তরাল রাখার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায় এদের অধিকাংশের মধ্যে। মধ্য মধ্যবিত্তের একটি ছোট অংশ জড়িত উপরি আয়, দাওমারা, কালোবাজারি ইত্যকার সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। মধ্য মধ্যবিত্ত রাজনীতি ও শিল্প সাহিত্যের সুদৃশ্য মোড়কে নিজেদের ঢেকে রাখতে বেশ প্রত্যয়ী ও কুশলি। যারা অকপট, ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শবান তাদের শত্রুর শেষ নেই।

নিম্ন মধ্যবিত্ত : এই শ্রেণির মানুষ চরম অর্থ সঙ্কটে নিপতিত। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে রয়েছে বিস্তর অমিল। অর্থাৎ এই শ্রেণির অবস্থা নুন আনতে পানতা ফুরায় প্রবাদের সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। জীবনের বড়ো অংশ জুড়ে থাকে ব্যর্থতার হাহাকার দীর্ঘশ্বাস। শহর ও গ্রামবাসী নিম্ন মধ্যবিত্তের সংকট একই রকম। এর বড় অংশই শত সংকটেও মূল্যবোধকে ধরে রাখতে চায়।

তবে গ্রামে অর্থনীতির এই নিরেট শ্রেণির বাইরেও অন্য একটি শ্রেণি কাঠামো বিদ্যমান। তা যেমন ছিল হিন্দু সমাজে তেমন ছিল মুসলিম সমাজে। বিনয় ঘোষ এই শ্রেণিকরণকে দেখেছেন এভাবে—

> "আসলে গ্রামসমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিত্তনির্ভর ছিল না, কুলবৃত্তিগত ছিল। ব্রাহ্মণ তাঁর কুলবৃত্তির জন্য গ্রাম্যসমাজে অখণ্ড প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, বিত্তের জন্য নয়। বিত্তহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রভাব বিত্তবান বণিক কারিগর ও কৃষকের চেয়ে শতগুণ বেশি ছিল গ্রাম্য সমাজে।"[২২]

অন্যদিকে মুসলমান সমাজ একটি ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাস মেনে চলে ছিল। তার স্বীকৃতি কামরুদ্দীন আহমদের মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়। তিনি গ্রাম সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "আমাদের সমাজের গ্রামগুলো ছিল ছোট ছোট দ্বীপের মত। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে আশরাফ আতরাফ ভাগ ছিল; নবাব বা নবাবীর পতন আমাদের পল্লী সমাজের যথার্থ বিপর্যয় ঘটতনা- তার নিজস্ব গতিধারার সময় কতকটা ব্যাহত বা পুষ্ট হত মাত্র।"[২৩]

মধ্যবিত্ত শ্রেণি টিকে থাকার সংগ্রামে জর্জরিত। সীমিত আয়, জোড়াতালি দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালায় নিরন্তর এদের মধ্যে লোভ-লালসা ও অর্থের প্রতি রয়েছে সুতীব্র আকর্ষণ। মধ্যবিত্তকে লিয়েজোঁ অফিসার বলেছেন চিন্তাবিদ টয়নবি। শ্রেণি অনুসারে মাঝামাঝি অবস্থান ঝুলন্ত সেতুবন্ধের মতো। এর এক প্রান্তে নিম্নবিত্ত অন্যপ্রান্তে উচ্চবিত্ত। সেই সেতু বেয়ে মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রিত বৃত্তে চলাচলের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। মধ্যবিত্তের সেতু নড়বড়ে তবে ভঙ্গুর নয়।

সমাজবিদরের মতে, বাংলায় দেশে মধ্যবিত্তের উদ্ভবকাল উনিশ শতক। যার উত্থান ঘটে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রাদায় মধ্যবিত্ত নামের এ নতুন সামাজিক শক্তির ধারক হিসেবে আবির্ভূত হয়। চেতনার দিক থেকে তারা একটি শ্রেণি সংহতি গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করে। যার প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ সালে রাজনৈতিক দল ভারতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্য দিয়ে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় বীজ বপণ করলেও পূর্ব বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তের সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটে ভারত ভাগের পর।

ইতিহাসে দেখা যায় যুগে যুগে মানুষের সমাজে গড়ন বদলায়, সমাজে মানুষের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি থাকে এবং প্রত্যেক স্তর ও শ্রেণির সঙ্গে পারস্পারিক একটা বিশেষ সম্পর্ক ও স্বাভাবিক রীতি সেই রীতির হাত ধরেই বাঙালি সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব। ১৯৫৭ এর পরে ইংরেজ জাতি যখন এদেশের শাসন করার অধিকার নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় তখন ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য হিন্দুদের নিয়ে নতুন ভূ-স্বামী, নতুন বণিক শ্রেণি নতুন বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে হিন্দুদের চেয়ে একশত বছরের ও অনেক পরে মুসলিম শিক্ষিত সমাজের উদ্ভব শুরু হয়। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে নিচ সমাজের মধ্য থেকে এবং এই শ্রেণি উঠে এসেছে সমাজের একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে।

মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুঁথিগত সংজ্ঞা প্রদান অত্যন্ত জটিল বিষয়। তথাপিও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বিনয় ঘোষ তাঁর *বাংলার নবজাগৃতি* গ্রন্থে গ্রেটেনের মত তুলে ধরেন—

> "সমাজের সেই শ্রেণীকেই আমরা মধ্যশ্রেণী বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান।"[২৪]

মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে গ্রেটেন জমিদার ও কৃষকদের বাদ দেন কারণ ভূমি সম্পত্তি ও জমিজমাই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে শিল্পপতি, বণিক শিক্ষিত চাকরিজীবী ইত্যাদি যাদের জীবনের সঙ্গে মুদ্রার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যাদের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় অন্যায়, প্রভাব, প্রতিপত্তি, বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মুদ্রা, যাদের জীবন সর্বস্বমুদ্রা তারাই হল মধ্যশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

নাজমুল করিম মনে করেন বাঙালি সমাজে মধ্যবর্তী শ্রেণির বিকাশে ইংরেজরা গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে Permanent settlement এর ফলে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা আসে। ব্যক্তি ইচ্ছা করলে জমি বিক্রি কিংবা ধ্বংস করে দিতে পারত। Permanent settlement এর ফলে উঠতি কিছু জমিদারের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশরা আসার আগে মাত্র ৩৫ জন জমিদার ছিল। শিক্ষাটা শুধু তারাই গ্রহণ করতে পারত।

নাজমুল করিম মনে করেন, সময়ের পরিবর্তনে মধ্যবিত্তের ধারণা Change হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক রুচিবোধ এ দু'টো গুণ না থাকলে তাকে মধ্যবিত্ত বলা যাবে না।

তবে একথা সত্য যে, বাংলাদেশে একটি বৃহৎ শ্রেণি মধ্যবিত্ত। এই স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিনয় ঘোষের কাছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> "বাংলাদেশে নতুন শ্রেণি রূপায়ণের ফলে সমাজে যে শ্রেণীর বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় যার আধিপত্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্তশ্রেণী।"[২৫]

মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুধু বৃহৎ অবয়বই লাভ করি নি। ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্তকে মোকাবেলা করতে হয়েছে অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি। সংগত কারণে এই শ্রেণির মধ্যে এসেছে তীব্র জটিলতা। এই সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেন—

> "মধ্যবিত্তশ্রেণীর বর্তমান আকার (Size) যেমন বিশাল হয়েছে, তার রূপ হয়েছে তেমনি জটিল। পৃথিবীর সকল দেশেই হয়েছে, বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।"[২৬]

তবে ব্রিটিশ ভারতে মধ্যবিত্তের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল কেরানি শ্রেণি। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেন—

> "চাকরির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালির যে প্রতিমূর্তি (Image) চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে, সেটি হল 'কেরানি মূর্তি'। উনিশ শতকের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত, দেশের আর্থিক জীবনের বিচিত্র আবর্তের মধ্যেও মধ্যবিত্ত বাঙালির এই কর্মমূর্তিটি অক্ষুণ্ন রয়েছে।" [২৭]

বঙ্গদূত পত্রিকা মধ্যবিত্তের সামাজিক স্থান নির্দেশ করে লিখে (১৩ জুন ১৮২৯)—

> "যে সকল লোক পূর্বে কোনো পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা, হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাগিদের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে। এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন ততদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে

Dhaka University Institutional Repository

> জনসমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যাহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বক্ত প্রকরণ ততদ্দেশে সুনীতি বর্তমানের মূলীভূত কারণ হইতে ও হইবেক।" [২৮]

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সময়ে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফের অভিমতও একই রকম। তিনি মনে করেন মধ্যবিত্তই মাথা ছিল বাঙালির, এখনও আছে। তারাই সমাজের নেতা। এই মধ্যবিত্ত ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ বটে। সমাজের মধ্যভাগে এদের অবস্থান। এরা নিজেদের পাওনা অদায়ে টনটনে। চরমভাবে এরা ব্যাক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক। পরমুখাপেক্ষী হওয়ার কারেণে এদের মধ্যে ভোগবাদী মনোভাব বিদ্যমান। এরা স্বাধীন শ্রমে বিমুখ। একই কারণে তারা সৃষ্টিতে অনুৎসাহী। মধ্যবিত্ত শ্রেণি শাসক ও নিম্নতর শ্রেণির কাছে সহায়তা প্রত্যাশা করে। এই শ্রেণিটি শাসককে ভয় করে। আর এই ভয় করা থেকে আসে তোয়াজ করার মনোভাব। আহমদ শরীফ আমলাদের সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মিল খুঁজে পেয়েছেন। শিক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বড় পুঁজি। নিম্ন শ্রেণির মানুষকে তারা ঘৃণা করে এরা চায় না সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ুক। তারা মনে করে শিক্ষার আলো সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাছাড়া ভয়ের কারণ নিম্ন শ্রেণির মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠলে তারা আর মধ্যবিত্তকে তোয়াজ করবে না। আহমদ শরীফ ইংরেজদের যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি। তিনি তাদের বণিক নয় আমলা মনে করেন আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সাহিত্যকে উচ্চ মূল্য দেয়ার উৎসাহ ইরেজদের কাছ থেকে পেয়ছে। কেননা ইরেজরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। আহমদ শরীফ মনে করেন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে চিনেছে, ঘৃণা ভালোবাসার ভেতর দিয়ে।

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এই ধারার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ সময় থেকে ব্যবসায়ী শ্রেণি রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। বর্তমানে এদের প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছে। ইংরেজ শাসকদের প্রবর্তিত অর্থনীতি তথা ভূমি ব্যবস্থা বাণিজ্য শিল্প আইন, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের নীতি ও অর্থ ব্যবস্থাই ভারতে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন দেশের সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর সূচিত হয় তার প্রকৃতি নিরূপণ প্রসঙ্গে নিম্নের উক্তিটি অনুধাবন যোগ্য—

> "ইংরেজ শাসনকালে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজে ভাঙন ধরে, জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে শহরমুখী, আর অর্থনৈতিক জীবনের মূল মাপকাঠি জমি থেকে রূপান্ত রিত হয় মুদ্রায়। অর্থনৈতিক কাঠামোর এই মৌলিক রূপান্তরের সাথে সাথে নতুন শ্রেণী-বিন্যাস দেখা দেয়। নব গঠিত এই সব শ্রেণী আবার ঐতিহাসিক নিয়মানুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালন করে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে।"[২৯]

বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক এই স্তর বিন্যাস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সামাজিক সুযোগ সুবিধা ও মননের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক ভিত্তি একমুখি হয়ে উঠছে। সমাজ পরিবর্তনে এই শ্রেণির ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ কমছে। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব এখন অনেকটাই বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও আমলা নিয়ন্ত্রিত। নিম্নবিত্ত শ্রেণির স্তর পরিবর্তনে সুযোগও সীমিত হয়ে আসছে।

তথ্যনির্দেশ :

১। বিনয় ঘোষ : *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃ:১০

২। নাজমুল করিম : *চেঞ্জিং সোসাইটি ইন ইনডিয়া পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ*, (ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ: ১৪৩।

৩। উদ্ধৃত, আবুল কাসেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্য শ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ: ৪৪

৪। আবুল কাসেম ফজলুল হক : প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪

৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩

৬। উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৪-৫৫

৭। কাল মার্কস : *ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী*, (মস্কো, ১৯৭১), পৃ: ১২৩-১২৪

৮। কাজী খলিকুজ্জামান : *বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বিকাশ, পথের সন্ধানে*, (ঢাকা, ১৯৯৩), পৃ: ৩

৯। আবুল কাসেম ফজলুল হক : প্রাগুক্ত, পৃ:৫৫

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬-৫৭

১১। নাজমুল করিম : প্রাগুক্ত, পৃ:১৪২

১২। মুহম্মদ ইদরিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ:২১

১৩। নাজমুল করিম : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৯

১৪। কামরুদ্দীন আহমেদ : *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, (ঢাকা, ১৩৮২), পৃ:৯৯

১৫। মুহম্মদ ইদরিস আলী : *আমাদের উপন্যাসের বিষয় চেতনা বিভাগোত্তর কাল*, (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ: ১২

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২-১৩

১৭। এম. এম. আকাশ : *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি (সাম্প্রতিক প্রবণতা সমূহ)*, (ঢাকা, ১৯৮৭), পৃ: ১৭

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮-২৯।

১৯। কাজী খলিকুজ্জামান : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২

২০। এম.এম. আকাশ : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬

Dhaka University Institutional Repository

২১। মুহম্মদ ইদরিস আলী : প্রাগুক্ত, পৃ:২৩

২২। বিনয় ঘোষ : প্রাগুক্ত , পৃ: ১১

২৩। কামরুদ্দীন আহমদ : প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৮

২৪। বিনয় ঘোষ : *বাংলার নব জাগৃতি*, (কলকাতা, ১৩৫৫), পৃ: ৬২

২৫। প্রাগুক্ত, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, (ঢাকা, ১১৬৮), পৃ: ১৪২

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮

২৮। উদ্বৃত : প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮৫

২৯। মুহম্মদ ইদরিস আলী : প্রাগুক্ত, পৃ: ৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের অসঙ্গতি ভাবোচ্ছ্বাস ও রোমান্টিসিজমের মোহমুগ্ধতা বিস্তার করতে চান নি। তিনি চেয়েছেন অসঙ্গতির শরীরের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করতে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে স্থান পেয়েছে অবহেলিত অবজ্ঞাত নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন। নিম্নবিত্ত মানুষের চরম ব্যর্থতা ও দারিদ্র্যের চাপে আদর্শবোধ, সনাতন জীবন চেতনা কিভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তা তাঁর গল্পে বিশেষভাবে শিল্পরূপ লাভ করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "প্রেমেন্দ্র মিত্র কেবল ভাঙাচোরা মানুষের ইতিহাস উপাদানই সংগ্রহ করেন নি। সেই সঙ্গে গোটা মানুষকে পেতে চেয়েছেন; পেয়েছেন। তার পরিচায়ক 'সংসার সীমান্তে'; 'সাগর সঙ্গম'গল্প।" [১]

এমন ভাবনা তাঁর একটি কবিতায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতার একটি অংশ—

> "মানুষের মানে চাই—
> গোটা মানুষের মানে।
> রক্ত মাংস হাড় মেদ মজ্জা
> ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কাম হিংসা সমেত—
> গোটা মানুষের মানে চাই।" [২]
>
> (*মানে, প্রথমা*, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্প সম্পর্কে বলেছেন—

> "অনেক প্রেমের গল্পই এ পর্যন্ত পড়েছি কিন্তু হিলিওট্রোপ রঙ্গের শাড়ি পরে রডোড্রেনড্রন গাছের তলায় যারা অনুরাগের রঙীন খেলা খেলে, তাদের কথা যেন আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। মনে হল রাঙা মাটির পাহাড়ী দেশে বিবাগী হয়ে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় বসে তারা বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের বেদনা নেহাৎ জোলো।
>
> কিছু যাদের নেই— যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোন গল্প কি হতে পারে না?"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

তবে এসব সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র আঁকার সুতীব্র বাসনা ব্যক্ত করলেও তাঁর গল্পে দাম্পত্য সংকট পারস্পারিক অবিশ্বাস, সন্দেহ দোলাচল, সংশয়, কিভাবে জীবনকে জটিল থেকে জটিলতার করে তোলে তা রূপায়ণেও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পের অসাধারণ কুশলী শিল্পী। তাঁর ছোটগল্প যেমন অসাধারণ শিল্প সাফল্য লাভ করেছে তেমনি বিষয়বস্তুতে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। বিষয়বস্তু ও ভূগোলের নির্দিষ্ট সীমায় তা আবদ্ধ নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র,অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল ও বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনা থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এই তিনজনের শিল্পকর্ম সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন—

> "বুদ্ধদেব সংকীর্ণ নগরজীবনের রূপকার, প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমারের গল্পের পটভূমি ব্যাপক ও বিচিত্র। বুদ্ধদেব সমাজজীবনের চিত্রকর নন, তাঁর ছোটগল্পে সমাজ গৌণ। প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে সমাজ গৌণ নয়। ওঁরা দুজনে পথেঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছেন, যেমন বেড়িয়েছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। আর বুদ্ধেদেব গল্পকে পেয়েছেন বিদগ্ধ তরুণের মনোলোক। বস্তুত তিনিই তাঁর অধিকাংশ গল্পের নায়ক।প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্য-কুমার সম্পর্কে তা বলা যায় না।"[৪]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে যেমন উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ আছে তেমনি রয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ। আছে শহর ও গ্রামের মানুষ। অর্থাৎ তাঁর ছোটগল্প ছুঁয়ে গেছে সব প্রান্তের মানুষকে। আবার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। শ্রী পবিত্র সরকার চমৎকারভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পীসত্তা ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "এ সংকলনের রচনাগুলি আর-একবার পড়বার সুযোগ পেয়ে বিস্মত হয়ে ভাবছি-কী বিচিত্র এক স্রষ্টাপুরুষ ছিলেন এই প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-ব্যক্তিগত রচনা-আত্মজীবন কথা-ছোটদের গল্প ও কবিতা, গীতরচনা কখনও বা মাধ্যম পরিবর্তন করে চলচ্চিত্র পরিচালনা-শুধু এই সংরূপের ব্যাপ্তি নয়। এ ধরনের বহুলতা অনেকেরই থাকে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে কয়টি গুণ তাঁর সমসাময়িক লেখকদের থেকে তাঁকে পৃথক করে আনে তা এই যে, তাঁর রচনার স্থান কোনো ভূগোলে যেমন নির্দিষ্ট করা কঠিন, কিংবা কোনো শ্রেণীতে, তেমনই তার কালও সুদূর অতীত থেকে কল্পবিজ্ঞানের অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত। দেশ ও কালের এই বিস্তার থেকে বোঝা যায় যে, এ মানুষটির মন ছিল অত্যন্ত সচল ও সন্ধানী।"[৫]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি সম্পর্কে সেলিনা হোসেনও একই রকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন—

Dhaka University Institutional Repository

"বিস্মত হতে হয় তাঁর সৃজনশীলতার ব্যাপ্তি দেখে।"[৬]

শুধু সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ নয় নগর ও নগরজীবনও তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সুমিতা চক্রবর্তীর মন্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন—

> "প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন নগর ও নাগরিকতার পরিবেশেই প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য পেত। তাঁর সাহিত্যকর্মে নাগরিক মননের সযত্ন-মার্জন এবং নগর মনস্কতা খুবই বেশি। শ্রীনিকেতনের খোলামাঠের চেয়ে কলকাতার গলি ও মেসবাড়ি তাঁকে কম আকর্ষণ করে না।"[৭]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পসাফল্য সম্পর্কে সেলিনা হোসেন লিখিছেন—

> "ইতিহাসে কে টিকবেন তার বিচার করবে কাল। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সবাইকে। সেই বিচারের মাপকাঠিতে টিকে গেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।"[৮]

দীনেশরঞ্জন দাশ প্রেমেন্দ্র মিত্রের *শুধু কেরানী* গল্প সম্পর্কে বলেছেন—

> "শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প শুধু কেরাণী। একটি কেরাণী যুবক ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া এই গল্প। এই দুইটি মানুষের প্রেম ও স্পৃহার মধ্যে কোনও আবিলতা নাই। --- কালক্রমে স্ত্রীকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও স্বামী তাহার নিবিড় প্রেমকে ঘটা করিয়া হাহুতাশ করিতে দেয় নাই। স্ত্রীও স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে যে কতখানি কষ্ট পাইতেছিল তাহা তাহার একটি কথায় শেষ দিকে বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।"[৯]

প্রেমেন্দ্র মিত্র *কল্লোল* কালের লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। সাহিত্যকর্ম, প্রতিভা, সযত্নমার্জন সবকিছু মিলে তিনি এই স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে শিবরাম চক্রবর্তীর মূল্যায়ন থেকে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। শিবরাম চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র—

> "পয়লা তারিখের আগের দিন ক্যাপ্টেন দত্তকে গিয়ে জানালাম- আপনার কাজটার জন্য আমার চেয়েও ভাল লোক ঠিক করেছি। প্রেমেন মিত্তির। নাম শুনেছেন নিশ্চয় ? আমার চেয়ে ঢের ঢের বড় লেখক- এমনকি, একালের আমাদের সবার অগ্রগণ্য বলেই তাঁকে আমার মনে হয়। তাঁকেই আমি নিয়ে আসব কালকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন প্রেমেন পরদিন থেকেই লেগে গেল কাজটায়।"[১০]

একই রকম স্বীকৃতি পাওয়া যায় সুধীরচন্দ্র সরকারের মূল্যায়ন থেকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন—

> "'কল্লোল' গোষ্ঠীর তিনি একজন খ্যাতনামা পুরুষ, এবং সেই সময় থেকেই তাঁর খ্যাতির সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। 'মৌচাকে'র

Dhaka University Institutional Repository

> আর একটি কৃতিত্ব হল তাঁর মত লেখককেও ছোটদের আসরে নামানো।"[১১]

'সাহিত্য সেবক সমিতি'র সভায় যোগদান সম্পর্কে রমেশ সেন বলেছেন—

> "এর পর সমিতিতে যোগদান করেন কল্লোলের তরুণ সাহিত্যসেবীরা। এঁরা ছিলেন নবযুগের উদ্‌গাতা। সাহিত্যকে এরা নতুন একটা পথে পরিচালনা করতে চান। মুক্ত করতে চান রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব থেকে। এঁদের মধ্যে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য ও প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি তরুণ লেখকেরা বাঙলা সাহিত্যে এক নব প্রেরণার সঞ্চার করেন। -- শৈলজার সঙ্গে অল্প কয়েকদিনেই বন্ধুত্ব জমে উঠল। তিনি প্রায় রোজই আসতেন। তাঁর জন্য প্রেমেন, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্যাল এঁরাও এসে আড্ডা জমাতে লাগলেন। -- প্রায় রোজই হত দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন। দেশী-বিদেশী সাহিত্যিকদের নূতন লেখা, তাঁদের জীবনী, তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে প্রায় প্রত্যহ যে অধিবেশন হত, পনের দিন অন্তর সমিতির নিয়মিত অধিবেশন যেন ছিল তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। শ্রী শিবরাম চক্রবর্তী রাস্তায় দাঁড়িয়ে দিসপেনসারি ঘরের একটা সিঁড়িতে পা রেখে বৈঠক জমাতেন।"[১২]

এ পর্যায়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে বিষয়ভাবনা কিভাবে এসেছে তা আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর ছোটগল্পে সুমধুর ও সফল দাম্পত্য জীবনের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দাম্পত্য জীবনের সঙ্কট। আছে অর্থনৈতিক সঙ্কটের চিত্র। সামাজিক সঙ্কট প্রধান হয়ে উঠেছে বেশ কিছু গল্পে। দৈহিক কামনা-বাসনার চিত্রও বাদ যায় নি তাঁর ছোটগল্প থেকে। কোনো কোনো গল্পে ব্যক্তিমননের নানান জটিলতার চিত্র আঁকা হয়েছে।

আছে অসাধারণ কিছু বিপ্লবী চরিত্র যারা দেশমাতৃকার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। শিক্ষক চরিত্র রয়েছে বেশ কয়েকটি গল্পে। তেমন গল্প হলো-*চুরি, ভবিষ্যতের ভার, দিবা স্বপ্ন।* স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবি আঁকা হয়েছে *অনাবশ্যক* গল্পে।

সাধারণ মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রাম ও নিয়তির অমোঘ রূপায়ণ পাওয়া যায় তাঁর *সাগরসঙ্গম, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, লজ্জা, সংসার সীমান্তে, মৃত্তিকা, মোটবারো, লেভেল ক্রসিং, কুয়াশায়া, কল্পনায়, মহানগর, ব্যাহত রচনা, পিস্তল, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, পটভূমিকা , জলপায়রা, সহযাত্রিনী, ভিড়, অরণ্য পথ, পঞ্চশর* প্রভৃতি গল্পে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানা সংকটের চিত্র রয়েছে শুধু *কেরাণী, হয়তো, সংক্রান্তি, শকুন্তলা, সত্যমিথ্যা, অনাবশ্যক, লাল তারিখ, অরণ্য স্বপ্ন, পুনর্মিলন, পাশাপাশি, প্রতিবেশিনী, শবযাত্রা,*

Dhaka University Institutional Repository

পান্থশালা, সামনে চড়াই, ভবিষ্যতের ভার, দিবা স্বপ্ন, প্রত্যাগত, বৃষ্টি, অমোঘ, ভূমিকম্প, একটি রাত্রি, যাত্রাপথ, সহযাত্রিনী, পরিত্রাণ, অমীমাংসিত, নিশাচর, থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ, ভিড়, চুরি, ভস্মশেষ, শৃঙ্খল, দৃষ্টি, স্টোভ, জ্বর, একটি অমানসিক আত্মহত্যা, পরোপকার, মল্লিকা, আয়না, যুথিকা, দাতা, ভিজে বারুদ, পাহাড়, পঞ্চশর বাঘ,সাপ, কালো জল, ক্বচিৎ কখনো, নিরুদ্দেশ,বিদেশিনী ইত্যাদি গল্পে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বিত্তহীন মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কনেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের জীবনযাত্রা ও মানসপ্রবণতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে রয়েছে অসাধারণ মুন্সিয়ানা। এই চরিত্রগুলির জীবনযাপন প্রণালী ও তাদের মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলে দেখা যায়, তারা যেনো সত্যিকারের আমাদের সমাজের বাস্তব মানুষ। এই বিত্তহীন মানুষেরা সত্যিকার অর্থে যেনো এখনো বিচরণ করছে আমাদের সমাজে। এ সাফল্য অর্জনে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সহায়তা করেছে তাঁর অভিজ্ঞতা। অনুসন্ধিৎসু মনের কারণে তিনি সব শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্রের দিকে খেয়াল রেখেছেন সুতীব্রভাবে। বিত্তহীন মানুষের অর্থনৈতিক সংগ্রামের চিত্র, তাদের মানসদ্বন্দ্ব লড়াই সংগ্রাম, তাদের অসহায়তা বিনষ্টি ও মমত্ববোধের ছবি পাওয়া যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে।

পিস্তল গল্পে আছে বিত্তহীন মানুষের দুর্বিষহ জীবনের চিত্র। অসহায় দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। এই সংগ্রাম নানামুখি। পুরুষদের চেয়েও এ শ্রেণির নারীদের জীবন প্রবাহ অত্যন্ত কঠিন। এই শ্রেণির নারীকে দুই ধরনের লড়াই করতে হয়। একদিকে অন্ন-বস্ত্র, চিকিৎসার সংগ্রাম, অন্যদিকে সম্ভ্রম বাঁচানোর লড়াই। অনেক চেষ্টার পরও অনেকক্ষেত্রে নারীরা তাদের সম্ভ্রম বাঁচাতে সক্ষম হয় না। যেমন পারে নি এ গল্পের শ্যামা। গর্ভে বাচ্চা ধারণ করে অসহায়ভাবে চিকিৎসাহীন ও অনাহারে মৃত্যুর সঙ্গে তাকে লড়তে হয়েছে। শুধু শ্যামা নয় অসংখ্য নারীকে এ পরিণতি বরণ করতে হয়। লেখক এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> "বিনা-টিকিটে চাল কিনতে যাওয়ার হিড়িকে রেল-লাইন দিয়ে মানুষের যেন বন্যা বয়ে চলেছে রাত-দিন। সেই বন্যায় ভেসে-যাওয়া পুরুষ-মেয়ের পাল হরদম এ-স্টেশনে এসেও ভিড়ছে, বিছিয়ে যাচ্ছে প্লাটফর্মের উপর বনের ভাঙা ডালপালার মতো। ভিন জায়গার লোক, দুদিনের জন্যে এসে স্টেশনে আশ্রয় নেয়। কিছুই তারা জানে না এখানকার ব্যাপার-ট্যাপার। মেয়েরা এক জায়গায় দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে, রাত্রে কোথা থেকে হঠাৎ ফিস্‌ফিসে গলায় খবর আসে, কাছেই কোনো মালগুদামের দেওয়াল ফুটো হয়েছে, একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলেই কোঁচড়ভর্তি চাল। সবাই হয়তো বিশ্বাস করে না। কিন্তু পেটের জ্বালায় মাথার ঠিক থাকবার কথা নয়। মরিয়া হয়ে যারা যায়, তাদের সবাই আর ফেরে না। বাছাই করা দু-চারটে অন্ধকারে একেবারে গায়েব হয়ে যায়।"(২খ, ১৮৯ পৃ)[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ছিন্নমূল মানুষকে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। এই গল্পের অসহায় দরিদ্র মানুষেরা হাত পেতেছে ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যদের কাছে। তাদের কাছ থেকে সাহায্য বাগানোর জন্য তাদের কৌশুলি আচরণ করতে হয়। লেখক তাদের এ প্রবণতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> "ছেলেগুলো আজকাল দু-চারটে ইংরেজী কথা শিখে ফেলেছে। 'ইয়েস' 'নো' শুধু নয় 'ভেরি হাংরি সাব', 'নো ফুড টু ডেজ্ সাব', 'ওনলি টু পাইস্ সাব'— তারা বেশ গড়-গড় করে বলতে পারে। ইংরেজ মার্কিনের তফাত পর্যন্ত তারা বোঝে। বলে, 'ইউ ম্যারিক্যান সার। ম্যারিকান ভেরি গুড্ , ব্রিটিশ ভেরি পুওর।' আবার ইংরেজ দেখলে বলে, 'ব্রিটিশ ভেরি বোল্ড সার-ব্রিটিশ ফাইট্।'
>
> শুনে সৈনিকদের কেউ কেউ হাসে, কেউ কেউ দু আনা ছুঁড়ে দেয়, আবার কেউ বুট তোলে।
>
> ছেলেগুলো খিল-খিল করে হেসে প্লাটফর্মে আর-এক প্রান্তে সরে পড়ে।" (২খ, ১৮৬ পৃ)

দরিদ্র মানুষকে জীবন চালানোর জন্য চুরিও করতে হয়। তারা সমাজের ভাসমান মানুষ। নীতিবোধ এদের মধ্যে তেমনভাবে কাজ করে না। লেখক এদের মনোভাবকে তুলে ধরেছেন এভাবে —

> "তারা লোক বুঝে ভিক্ষে চায়, কিন্তু ভিখিরি তারা নয়। সুবিধা পেলে তারা চুরি করে, কিন্তু চোরও তাদের বলা যায় না। তারা লোহা-লক্কর ইঞ্জিন-মালগাড়ির এক নতুন জগতের বেদে। সময়ের অসীম স্রোতে প্রতি মুহূর্তের ঢেউয়ের উপরে তারা কোনো রকমে ভেসে থাকে, সামনে বা পিছনের কোনো হিসেব রাখে না।" (২খ, ১৮৭ পৃ)

তবে তাদের মধ্য থেকে কেউ আবার ছলচাতুরি করে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন ঘটেছে এ গল্পে লালমোহনের। সে ছিন্নমূল মানুষের দলেই ছিল। কূটকৌশলে সে অবস্থা পরিবর্তন করে, নানান অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে যায়। অর্জনও করে প্রবল ক্ষমতা। লালমোহনের পরিবর্তনকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "লালমোহন এখন ভয় করার মতো লোক বটে। ঘুষে বখশিশে সমস্ত স্টেশন তার হাতের মুঠোয়। ফ্যা-ফ্যা করে কাঙাল ভিখিরী মেয়েদের সঙ্গে দুটো ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্যে যে ঘুরে বেড়াত, বাজারের মাঝখানে তার মালগুদামের অফিস-ঘরে এ-তল্লাটের হোমরাচোমরা এখন গিয়ে মাঝ রাতের মজলিশ জমায়। একবার আঙুল মটকালে দু-চারটে ঘাড় মটকাবার ক্ষমতা সে রাখে।" (২খ, ১৮৯ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় ছিন্নমূল অবস্থা থেকে ক্রমে প্রবল প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্জন করে। সে বৈভব ও ক্ষমতা অর্জিত হয় চোরাগলি পথ দিয়ে। বলা যায় লালমোহন আমাদের সমাজেরই এক অতিবাস্তব ও উজ্জ্বল চরিত্র। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ করা যায় তা বিত্তহীন মানুষের মধ্যেও রয়েছে। স্টেশনের মেয়ে নিধে ও শ্যামার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। একারণে শ্যামার প্রতি নিধের মনে হিংসা জাগতো। কিন্তু এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় আর তা হলো বিপদের সময় তারা হিংসাত্মক মনোভাব জিইয়ে রাখে না। বরং এ সময়ে তারা প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এই অনুভূতির কারণে শ্যামার দুর্দিনে হাসি তামাশায় অন্যরা অংশ নিলেও নিধে এতে অংশ নেয় নি। সে শ্যামার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। তার এ অনুভূতিকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "কোথায় ছিলি দিনভোর ? জোটেনি বোধ হয় কিছু ?" (২খ, ১৯০ পৃ)

পরক্ষণে সে আবার বলেছে—

> "ভালো লাগে না আর ছাইপাঁশ চিবোতে, নে, খাবি তো খা।" (২খ, ১৯০পৃ)

এ থেকে বোঝা যায় শ্যামার বিপদের সময় নিধে অতি আন্তরিকভাবে তাকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয় শ্যামার মধ্যে প্রতিশোধের আগুন দেখে সে বদলা নিতে সহায়তার জন্য তার হাতে পিস্তল তুলে দেয়। এই যাত্রায় সেও শ্যামার সঙ্গি হয়। নিধের এ অনুভূতিতে বলা যায় এ যেনো নির্যাতিত শ্যামার প্রতি স্বজাতির সহজাত ভালোবাসা।

পটভূমিকা গল্পেও আছে সাধারণ মানুষের বর্ণনা। এ গল্পে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েই তারা এসেছে। এদের অনেকের মধ্যে স্বাভাবিক বোধ ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লক্ষ করা যায়। বিত্তহীন মানুষ সামন্ত প্রভুদের কথায় উঠতে বসতে বাধ্য হয়। অনেকেই এ পরিস্থিতিকে জয় করার চেষ্টা করে। অনেকে আবার তা মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তবে এ শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রতিবাদকারীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। হঠাৎ করে কেউ কেউ যেনো প্রতিশোধের আগুন জ্বালায়। যেমন আগুন জ্বালিয়েছিল এ গল্পের ভুবন বাড়ুই। তার প্রমাণ পাওয়া যায় গল্পের এ অংশ থেকে—

> "প্রভাত ফিরে এসে সব শোনে। বিভূতির সব বিষয়েই টেক্কা দেওয়া চাই। বললে, 'নেহাত তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি, নইলে দুদিনে সিধে করে দিতে পারতাম। তখনই তোমায় বলেছিলাম, ওদের অত আশকারা দিয়ো না— ওরা কি সেই মাল, লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে'
>
> প্রভাত এক এক করে সবাইকে ডেকে পাঠালে। ভুবন বাড়ুই ছাড়া আর সবাই এসে হেঁট মাথায় দেখা করে গেল। তাদের সবার কথাতেই বোঝা

Dhaka University Institutional Repository

> গেল, রাত-পাহারার জন্যে বিশেষ করে ছোটোবাবুর কথায় তারা জান দিতে প্রস্তুত।
>
> তবে পঞ্চু তেলীর কদিন ধরে জ্বর আসছে রাত্রে, লক্ষ্মণ মাঝি গিয়েছিল তার কুটুমবাড়ি, হাবু মাঝির ছোটো ছেলেটা যায় যায় ... অর্থাৎ সবারই কামাই করবার একটা-না-একটা গুরুতর কারণ আছে।" (২খ, ২১৩ পৃ)

ভুবনের কাছে গিয়ে প্রভাত রাত পাহারা না দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে অন্যের কথা তুলে সে তার মানোভাব জানিয়েছিল এভাবে—

> "আজ্ঞে হ্যাঁ, বলব বই-কি ! আপনার কাছে বলব না তো কার কাছে বলব ? ওরা বলে যে, বাবুদের শখ হয়েছে, পাহারা দিয়ে বেড়াক, সারাদিন গতর খাটিয়ে আমাদের মিনিমাগনা আবার রাত জেগে টহল দেওয়া কি পোষায়! তা ছাড়া, আমাদের কী-ই বা কার আছে যে, পাহারা দিয়ে আগলাতে হবে ? " (২খ, ২১৫পৃ)

ভুবনের এ মন্তব্যে বোঝা যায় সে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। সরাসরি সে চৌধুরীপুত্রের কথার প্রতিবাদ করতে না পারলেও পরোক্ষভাবে সে তার মনোভাব জানাতে দ্বিধা করে নি। এ থেকে তার আত্মসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে গল্পের বাকি নিম্নবর্গের চরিত্রগুলো গতানুগতিকতার উদাহরণ মাত্র। তাদের নিজস্ব বোধ বুদ্ধি ও সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তারা সত্য কথা প্রকাশ করতে ভয় পায়। নানা কৌশলে তাই তারা প্রভাতের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। সেখানে তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

জলপায়রা গল্পে আছে বিত্তহীন মানুষের দাম্পত্য ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের চিত্র। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সাধারণ মানুষ নির্ভর করে জমিদারের উপর। ফলে জমিদারের কথায় তাদের উঠতে বসতে হয়। এদের অর্থনৈতিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। নীতিবোধ আরো দুর্বল। অন্যসব বিত্তহীনের মতো এ গল্পের বিত্তহীন মানুষ চুরিচামারিতে অংশ নিতে বাধ্য হয়। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল এমন—

> "ধানটা কিছু হয়। তাও ফলন যেবার ভালো সেবার জমিদারের কেমন করে যেন টনক নড়ে। কেঁদে-ককিয়ে কাকুতি-মিনতি করে গোমস্তা-পাইকের কাছে যেটুকু তখন ভিক্ষে করে রাখা যায়। নইলে খাজনাও নেই যেমন, তেমনি খোঁজও না। জমিদারের ওপর কথা কইবার জো-ও নেই। কইবে কে? কিসের ওপর? জমির ওপর দখলের একটা চিরকুটও কারুর কাছে নেই। পাইক-লেঠেল পাঠিয়ে ঘাড় ধরে যখন খুশি বার করে দিতে পারে তেরিমেরি কেউ করতে গেলে।" (২খ, ১৪৭ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

বিত্তহীন মানুষের দুর্বলতা হলো তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ না থাকায় তারা যেমন নীতিবোধ হারায় তেমনি হারায় সাহস ও মনোবল। প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়েছেন দাম্পত্য সঙ্কট বিত্তহীন পরিবারে রয়েছে। তাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে প্রেমের। এমনকি পরনারী ও পরপুরুষের প্রতিও তাদের আকর্ষণ রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকলে স্ত্রীর নৈতিক স্খলনকে বড় করে দেখেন না স্বামীরা। যেমনটি করেছিল সৈরভীর স্বামী দাসু। এ গল্পে পরকীয়ায় পুরুষদের চেয়ে নারীদেরকে বেশি সাহসী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সৈরভী আকর্ষণ বোধ করে গ্রামের যুবক অধরের প্রতি। কিন্তু অধর ভিরু প্রকৃতির। দাসুর সাহস ও সবল শরীরকে অধর ভয় পায়। সেকারণে সে ইচ্ছে থাকলেও সৈরভীর সঙ্গে দূরত্ব কামনা করে। আর ভাবে—

> "সৈরভীর ওপর তার রাগ হয়। এই রাক্ষুসী টান তারই ওপর কেন ? সে ছাড়তেও পারে না, ছেড়েও দিতে পারে না নিজেকে প্রাণ খুলে। কতবার ভেবেছে পালিয়ে চলে যাবে কোথাও। কিন্তু যাবে কোথায় ? জ্ঞান হওয়া থেকে এই বাদাই চেনে। তিনকুলে কেউ নেইও। আর যাবার কথা ভাবলেও বুকটায় কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।" (২খ, ১৪৯ পৃ)

অন্যদিকে সৈরভী শুধু সাহসীই নয় অতি সাহসী। সৈরভীর এ কথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

> "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, খুঁজতে তো আমিই আসি। তুমি তো আর বেটাছেলে নও, আমিই কাছা দেব এবার।" (২খ,১৪৮ পৃ)

জলপায়রার প্রসঙ্গ তুলে অন্যত্রও সে এমন মন্তব্য করেছে। সৈরভী অধরকে বলে—

> "অত আগবাড়ন্ত হলে ডানা ভাঙবে না! উত্তুরে হাওয়া না দিতেই এত ছটফটানি কিসের! আমার মতো কারুর টানে এসেছে বোধ হয়।" (২খ, ১৪৯ পৃ)

জলপায়রা গল্পের সৈরভীর এ মন্তব্য থেকে তার মানসলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। সৈরভী জলপায়রা ও তার মনোভাবকে সমার্থক করে প্রকাশ করেছে। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিকের দুর্বলতার কারণে স্বপ্নসাধ পূর্ণ হয় না। একই বৃত্তপথে তাকে থেকে যেতে হয়। বন্দি জলপায়রার মতোই তার অবস্থা। উড়া হয় না আর স্বপ্নের আকাশে।

সাধারণ মানুষ কত অসহায় তা *ভির* গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পে ট্রেনযাত্রার প্রসঙ্গে এসেছে বিত্তহীন মানুষেরা। জাতিতে তারা সাঁওতাল। ভদ্রসমাজে তারা কতটা অসহায় লেখক তা এ গল্পে দেখিয়েছেন। লেখক তাদের অসহায়ত্বের চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "বিজয় দেখেছে বই-কি ! প্লাটফর্ম যেন হাটকে হার মানিয়েছে। মানুষের একটা বিশাল তাল। অসহায় একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ তারই ভেতর মোটঘাট নিয়ে ট্রেনের দরজায় দরজায় কাতরভাবে আশ্রয় চেয়ে ফিরছে।

Dhaka University Institutional Repository

> পুরুষদের পিঠে বাঁধা মোট, মেয়েদের পিঠে বাঁধা ছেলে-মেয়ে। এমন অবোধ অসহায় পশুর মতো কাতরতা তাদের দৃষ্টিতে যে মায়া হয়। এ ট্রেনে বুঝি তাদের না গেলেই নয়। এর আগে কত ট্রেনে তারা এমনি উঠতে গিয়ে হতাশ হয়েছে কে জানে। পারতপক্ষে কে তাদের জায়গা দেবে ! " (২খ, ১২৬ পৃ)

এই শ্রেণির সাধারণ মানুষ শুধু দরিদ্রই নয়, তারা ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত। অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তারা গালিগালাজের শিকার হয়।

টিকিট আছে তাদের এমন কথা শুনে এক বৈষ্ণব বাবাজি খেঁকিয়ে উঠে বলেন—

> "টিকিট আছে তো মাথা কিনেছিস। জায়গা থাকলে তো উঠবি। যত সব জানোয়ার!" (২খ, ১২৬ পৃ)

তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণি তাদের অধিকার বঞ্চিত রেখে গালি দিলেও এই অন্তজ শ্রেণির মানুষেরা তাদের অধিকারের কথাটি বলে কাতরতার সঙ্গে। তাও তারাই বলে যারা তাদের মধ্যে একটু অপেক্ষাকৃত সাহসী। তাদের সে কাতরতা ফুটে উঠেছে গল্পের এ অংশে—

> "সাঁওতাল কুলিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সাহসী তারা দরজা পর্যন্ত এসে ঠেলে ঢোকবার চেষ্টা করে। কাতরভাবে জানায় যে তাদের টিকিট আছে, কেন তারা যেতে পাবে না !" (২খ, ১২৬ পৃ)

অরণ্য পথ গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনধারা ও মানসিকতা তুলে ধরা হয়েছে। তা এসেছে লেখকের একটি জলপথে ভ্রমণকে কেন্দ্র করে। বিত্তহীন এই মানুষেরা জাহাজের খালাসি ও কুলি শ্রেণির। লেখক এদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করেছেন নিম্নবিত্ত মানুষ হিসেবে। এদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন কোনো বিষয় সম্পর্কে এদের কৌতূহল পরিমিত। মধ্যবিত্তের অসীম কৌতূহল নিম্নবিত্ত মানুষের নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি রামপদবাবু এই দুটি শ্রেণির মানসিকতা তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "এই স্টিমারে তবু নিজের যন্ত্রণা নিয়ে নির্জনে থাকতে পাই। খালাসীদের কাছে আমার তেমন সংকোচ নেই—তাদের কৌতূহল পরিমিত। তারা অভ্যস্তও হয়ে গেছে। আপনাদের মতো আমার সমকক্ষ লোকদেরই আমার ভয়।" (২খ, ৫০ পৃ)

মালবাবুর এ মন্তব্যের মধ্র দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিত্তহীন ও মধ্যবিত্তের মানসলোক উন্মোচন করেছেন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে।

যাত্রাপথ গল্পে স্বল্প রেখায় অঙ্কিত হয়েছে কিছু বিত্তহীন মানুষ। এদের মধ্যে রয়েছে একদল সাঁওতাল কুলি-মজুর, আছে স্টেশনের কুলি ও পান দোকানদার।

এখানেও সাঁওতাল কুলি মজুরদের অসহায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। লেখক তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "মেমারী হইতে একদল সাঁওতাল কুলি মজুর না জানিয়া শুনিয়া তাহাদের ইণ্টারক্লাসে উঠিয়া পড়ে। গাড়ি তখন ছাড়ে-ছাড়ে। তাহাদের কাকুতি-মিনতিতে কেহ আর তাহাদের নামাইয়া দিতে পারে নাই। মেঝের উপরই তাহারা সকলে মিলিয়া কোনো রকমে বসিয়াছে।" (২খ, ৮৫ পৃ)

ব্যাহত রচনা গল্পে লেখক বিত্তহীন মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি তুলে ধরেছেন। এ গল্পের নায়ক বনোয়ারী। সে জলওয়ালা, মানুষের বাগানে জল দিয়ে দু পয়সা আয় করে। সে এই পয়সা থেকে দশ বছর ধরে সঞ্চয় করে আসছে। কারণ সে বিয়ে করতে চায়। তার বয়সও বেড়ে গেছে। দশ বছরের বেশি বয়সের মেয়েকে পণ দিয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য তার নেই। সেই সঞ্চিত টাকা তার চুরি হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। একদিনে তার চেহারা অর্ধেকে নেমে আসে। কেননা টাকা চুরি হয়ে যাওয়া মানে তার স্বপ্নের মৃত্যু হওয়া। সে একটি ছোট মেয়েকে পাঁচ বছর ধরে পছন্দ করে রেখেছিল। সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারলেও তাকে প্রিয় সম্ভাষণ শুনতে আরো অন্তত পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হতো। তবে লেখক বনোয়ারীর মনের দিকে প্রথম খেয়াল করেন নি। সে কারণে বনোয়ারীর কান্না শুনে তার মন্তব্য ছিল এমন—

> " বনোয়ারী মানুষটা অবশ্য ভারী অদ্ভুত। কিন্তু সে শুধু বাহিরে। বিধাতা তাহাকে ব্যঙ্গ-রচনা হিসাবে যেন গড়িয়াছেন। লম্বার বদলে তাহাকে সরু বলিলেই যেন বর্ণনা যথাযথ হয়। হাত-পাগুলো কেমন যেন বেকায়দায় জোড়া লাগিয়াছে। সামঞ্জস্য কোথাও নাই। চেহারায় মেয়েলী ভাবের যে আভাস আছে, গলার স্বরে তাহা পূর্ণ হইয়াছে।
>
> কিন্তু বাহিরের চেহারায় এই বিশেষত্ব তাহার ভিতরের জীবনের বৈচিত্রহীনতার আবরণ বলিয়া জানি। দশবৎসর ধরিয়া সে জল তুলিয়া আসিতেছে, সারা জীবনই তুলিয়া চলিবে। কুয়ার উপরকার কপিকলটার মতোই সুনির্দিষ্ট তাহার জীবনের গতি। তাহার জীবনে কান্নার আবার অবসর কোথায় ?" (২খ, ৯৭ পৃ)

অবশ্য দুজন তরুণ-তরুণীর অনর্থক কথামালায় বনোয়ারীর এই স্বাভাবিক ও স্পষ্ট বেদনাকে অস্বাভাবিক মনে হয় নি। এ সম্পর্কে তাই লেখকের উচ্চারণ—

> "মধুর গল্প রচনা করিবার জন্য যাহাদের ডাকিয়াছিলাম, তাহারা আমার কাহিনীকে এ কোন নিরর্থক কথার জটিলতায় লইয়া আসিল! না, দোষ তাহাদের নাই। একটি কর্কশ কান্নার স্বর সমস্ত গল্পের সুর অনেক আগেই কাটিয়া দিয়াছে। কোনোমতেই তাহাকে আর জোড়া দেওয়া যাইবে না। মনের নেপথ্যে বনোয়ারীর কান্না কিছুতেই আর ভুলিতে পারিতেছি না। সে কান্নাকে আর তেমন হাস্যকর বলিয়াও মনে হয় না। হাতে হাত ধরিয়াও যাহারা পরস্পরকে হারাইয়া ফেলে অর্থহীন কথার জটিলতায়,

Dhaka University Institutional Repository

তাহাদের তুলনায় বনোয়ারীর বেদনা এমন কি অস্বাভাবিক!" (২খ, ৯৯ পৃ)

এখানে লেখক বিত্তহীন বনোয়ারীর ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার সাধনাকেই বড় করে দেখেছেন। বনোয়ারীর এ স্বপ্নভঙ্গে পাঠকের মনেও সৃষ্টি হয় প্রগাঢ় বেদনা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজসচেতন শিল্পী। সমাজ নিরীক্ষার শক্তি তার অসাধারণ। আমাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শোষণের বিষয়কে বাদ দিয়ে তিনি শুধু নিরেট সৌন্দর্য চর্চার জন্য শিল্পীর আসন অধিকার করেন নি। তিনি শিল্পকে নিয়েছেন সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। সেজন্যে তাঁর সাহিত্যকর্মে জীবন জটিলতার পরিপূর্ণ রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। সত্য উচ্চারণ করতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই। অপশক্তির ভয়ে তিনি ভীতও নন। তবে তার সত্য প্রকাশিত হয়েছে অসাধারণ ঋজুভঙ্গিতে। এই ঋজুতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পকর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

পটভূমিকা গল্পে তিনি আমাদের সমাজের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন সাধারণ একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এই চরিত্রটির নাম সিধু। সে পাগল। তার বয়সেরও গাছ পাথরের শেষ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছেলের দল যখন রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিচ্ছিল তখন সে চুরি সম্পর্কে তার মত তাদের জানায়। সে জানায় বড় চুরি হয় দিনের বেলায় রাতে নয়। এ সম্পর্কে সিধু পাগলার মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। সে বলে—

"তবে কী ছাই তোদের রাত-পাহারা! রাতে নয় বাবা, রাতে নয়- পাহারা দেবে দিনমানে। যত চুরি সব দিনের বেলায়।" (২খ, ২০৭ পৃ)

এখানে সিধু পাগলা আমাদের সমাজের একটি বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রিকভাবে আমাদের দেশের সম্পদ চুরি হয়। এই চুরি হয় দিনের বেলায়। এই চুরি সম্পর্কে গানের মধ্য দিয়ে সিধুর অসাধারণ মন্তব্য ছিল এমন—

"তোর বিচারের এমনি মজা,
সাবাস হল দিনের চুরি
শুধু রাতের চুরির বেলায় সাজা!"(২খ, ২০৭ পৃ)

আর রাতের এই চুরি যেহেতু হয় রাজশক্তি ও রাজশক্তির ছত্রছায়ায় তাই তাদের কোনো সাজাও হয় না। অর্থাৎ বড় অপরাধীরা আইনের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু যারা খুন্নিবৃত্তির জন্য রাতের বেলায় সামান্য চুরি করে রাষ্ট্র তাদের শাস্তির বিধান করে রেখেছে। আর বাস্তবে তাদেরই সাজা হয় কেবল। এটা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বৈতনীতি। অর্থাৎ রাষ্ট্র দুর্বলের বিচার করতে চায় সবলের নয়। বলা যায়, সিধুর মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর বিশ্বাস এখানে উপস্থাপন করেছেন। *পিস্তল* গল্পেও লেখক এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। এখানে লেখক আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দুর্বল দিকটি তুলে ধরেছেন। নীতিহীনতা ও শোষণের বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে এগল্পে প্রাণ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এটম গল্পে আছে বিত্তহীন একাট মেয়ের করুণ জীবনালেখ্য। প্রসাদী নামের এ মেয়েটি কিছুদিন গল্পকারের বাসায় কাজ করে। তার পর জড়িয়ে যায় ভিক্ষাবৃত্তিতে। শুধু ভিক্ষাবৃত্তি নয় এক সময় সে চুরির অভ্যাসও রপ্ত করে। এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

"ক্রমশ যেন চুরিটাই তার রোগ হয়ে দাঁড়াল।"(৩খ,১৭৬পৃ)

প্রসাদীর মধ্যেও নীতিহীনতা কাজ করে। চুরি করার কারণে তার কোনো অনুশোচনাও নেই। যা থেকে বোঝা যায় প্রসাদী বোধ ও বুদ্ধিহীন সাধারণ অসহায় নারী মাত্র।

পুঁজিবাদ সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। *সিদ্ধিকল্প* গল্পে আছে এর প্রমাণ। ভারতবর্ষের পরিবর্তিত সমাজ কাঠামো পুঁজিবাদের স্বরূপ অনুধাবনে তাকে সহায়তা করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের *সিদ্ধিকল্প* গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের পুঁজিবাদের পরিবর্তনশীলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। পাল, সেন ও মোঘল আমলে সমাজকাঠামো ছিল মূলত সামন্তনির্ভর। প্রথাবদ্ধ পুঁজিবাদের ধারণা ছিল অনুপস্থিত। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের প্রভাব ফলতে শুরু করে পর্তুগিজ বণিকদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় এখানে আসে ফরাসি ও ইংরেজরা। এদের মধ্যে লড়াইয়ে ইংরেজরা জয়ী হয়। এক পর্যায়ে এরা ভারতের শাসনক্ষমতাও দখল করে নেয় ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। ইংরেজদের ক্ষমতা দখল ভারতবর্ষে নানা প্রভাব ফেলেছিল। এর মধ্যে পুঁজিবাদ অন্যতম। ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘতর ও অবাধ শোষণ নিশ্চিত করতে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে পণ্যের স্থানান্তর দ্রুত করতে তারা এদেশে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ ব্যবস্থায় এ দেশীয় কিছু পুঁজিপতি গড়ে উঠতে শুরু করে। মূলত প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখক জীবনের শুরুতেই পুঁজিবাদ কেবল বিকশিত হতে শুরু করে নি সামন্তবাদের ওপর তার বিজয় ঘোষণা করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুঁজিবাদের এই অবস্থান লক্ষ করেছিলেন। পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন তাঁর *যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাসে। এই উপন্যাসের মধুসূদন নব্যপুঁজিবাদী ও বিপ্রদাস ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের শেষ প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে সামন্তবাদের ও পুঁজিবাদের আধিপত্যের চিত্র তুলে ধরেন মধুসূদনের কাছে বিপ্রদাসের পরাজয় দেখানোর মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে পেমেন্দ্র মিত্র পুঁজিবাদের প্রকৃত স্বরূপ উৎঘাটন করেন তাঁর *সিদ্ধিকল্প* ছোটগল্পে। সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী মানসিকতায় বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম ও সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে আসা পুঁজিপতির মধ্যেও যে পার্থক্য রয়েছে তাই এখানে তুলে ধরেছেন। সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী পরিবেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম পুঁজিবাদী মৌলধারণার আকণ্ঠ পূজারী। এজন্য দয়া বা অনুকম্পা তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় একটি বিষয়। অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় সংস্থার পুরোনো কর্মচারীকে নির্দ্বিধায় ছাঁটাই করে ধরণীধরবাবুর পুত্র অরুণ। অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যের কথা তুলে ধরে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় ধরণীধরবাবুর শ্যালকের মেয়েকে। এই দুটি বিষয়ই পুঁজিবাদী চেতনাজাত সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রমাণ তুলে ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে আসার কারণে মানবিক অনুভূতিকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে পারেন নি ধরণীধরবাবু। এই দুটি বিষয়ে ধরনীধরবাবু সঙ্গতকারণে বিপরীতমুখি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পুত্রের ইচ্ছা পূরণে তিনি বাধা হয়ে দাঁড়ান নি।

মৃত্তিকা গল্পে আছে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের ব্যবসায়িক স্বার্থ আদায়ের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা। এ গল্পের উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিতি মাড়োয়ারী কন্ট্রাক্টর। সম্পদ থেকে সে বাড়তি আয় করার নেশায় মত্ত। কিছু দিনের জন্য ভরাট করা কাঠা আষ্টেকের মতো জমি সে ফেলে রাখেনি কিছু আয়ের জন্য। তা সে মাড ব্যারাক তৈরি করে ভাড়া দিয়েছিল। যা একটি ভূমিকম্পে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। এজন্য এই শ্রেণির মানুষকে তেমন একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। লেখকের এ কথায় তার প্রমাণ পাওযা যায়–

> "মাড়োয়ারী মালিককে করপোরেশনের কাছে কিছু কৈফিয়ৎ দিতে বোধ হয় হয়েছে। সে সামান্য ব্যাপার।"(১খ,২২৫পৃ)

সাধারণ মানুষের জীবনের যে কেনো দাম ছিল না এ ঘটনাই তার প্রমাণ।

মন্দির গল্পে কিছু মধ্যবিত্ত চরিত্রের পাশাপাশি অঙ্কিত হয়েছে বিত্তবান মানুষের জীবনচিত্র। এই গল্পের কিষেনলাল বিত্তবান পরিবারের সন্তান, বাড়ি মধ্যপ্রদেশে। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "কিষেনলাল ওখানকার ধনী বড় ঘরের ছেলে। তার পৈতৃক ব্যবসার কল্যাণে তখনকার দিনের পক্ষে দস্তর মতো ধনাঢ্য বলা যায়।" (৩খ, ১৬১পৃ)

দামি গড়ি ব্যবহার করা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তার গাড়ির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে—

> "তখনকার দিনে সে নতুন মরিস গাড়ি কিনেছে।" (৩খ,১৬৩পৃ)

কিষেনলালের মধ্য দিয়ে লেখক সে সময়ের ধনাঢ্য পরিবারের শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে চেতনাগত পরিবর্তন এসেছে তা তুলে ধরেছেন। কিষেনলাল তৎকালীন সংস্কার ছিন্ন করে স্ত্রীকে নতুন ভাবে পেতে চায়। তবে সে যে স্ত্রীকে দেখানোর বিষয়ে পরিণত করতে চায় তা নয়। এ সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য—

> "কিষেনলাল যে স্ত্রীকে মেমসাহেব বানিয়ে পাশে নিয়ে হাটে-বাজারে ঘুরতে চায়, তা নয়;কিন্তু সামান্য ফোটো তোলার ব্যাপারেও স্ত্রীর অবুঝ কুণ্ঠা তাকে বিরক্ত করে তোলে।" (৩খ,১৬২পৃ)

ছবি তোলার বিষয়ে তার স্ত্রীর যে আপত্তি তা তাকে সাধারণ লজ্জাশীলা রমণীর মর্যাদা দেয়।। তার মনোভাব সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

Dhaka University Institutional Repository

> "তার স্ত্রী লছমী নাকি তার ফোটো বাইরের কোথাও এনলার্জ করতে দেওয়ার ব্যাপারে দারুণ আপত্তি জানিয়েছিল। তার ছাবি বাইরের পাঁচজনে দেখবে, এ যেন তার চরম লজ্জা অপমান। বাংলাদেশের সাধারণ রক্ষণশীল সামাজের মধ্যেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেরকার সেই যুগেও এই ধরনের অন্ধ গোঁড়ামী প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল।" (৩খ,১৬২পৃ)

এই সংস্কারের বিরোধ থেকে মুক্তির জন্য কিষেনলাল ছবি তোলার নেশায় মেতে উঠেছিল। এ থেকে তাদের মধ্যে সাময়িক মান-অভিমান জন্ম নেয়। এ মান-অভিমানে কিষেনলালের জীবনাবসান হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ অবস্থা হয় কিষেনলাল লছমীকে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য চাপ দিলে। সেদিন কিষেনলাল লছমীদেবীকে বলেছিল—

> "নিজেকে কিষেনলালের মতের সঙ্গে মেলাবার মত করে যদি বদলাতে না পারেন, তাহলে লছমী ..... যেন বাপের বাড়ীতেই চিরকাল থাকেন। লছমীদেবী তাতে একটু যেন অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সাথেই বলেছিল যে, নিজেকে তিনি সত্যিই বদলাবেন। এই তিথিতে কিষেনলাল মাইহারে এলে বুঝতে পারবে।"(৩খ,১৬৫পৃ)

লছমীর এ ঘোষণায় কিষেনলালের মধ্যে শুরু হয় মনস্তাত্ত্বিক সংকট। সে মনে করে এ তিথিতে লছমী আত্যহত্যা করবে। সে ধারণা থেকে কিষনলাল সারদা মন্দিরে যায় বন্ধুদের নিয়ে। সেখানে সে রাতে লছমী আত্মহত্যা করতে যায়। এতে সেও লছমীকে পিছু ধাওয়া করে ।

লছমী রূপি অশরীরি আত্মা এ সময় আত্যহত্যার জন্য লাফ দেয়। লছমীকে বাঁচাতে কিষেনলালও লাফ দিতে উদ্যত হয়। এ সময় বন্ধুরা কিষেনলালকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। তারা পরে অবশ্য সেখানে কোনো দুর্ঘটনার কথা জানতে পারে নি। এ ঘটনার পর লছমী নয় পরিবর্তন হয় কিষেনলালেরমানসিকতার।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে সামন্তবাদের চিত্র পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনিও প্রত্যক্ষ করেছেন সামন্তবাদের উজ্জ্বল দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন বিদ্যমান শুধু সামন্তবাদের ভগ্নস্তূপ। সামন্তবাদের শেষ পর্যায়ের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর *জলপায়রা* ছোটগল্পে। সামন্তবাদের দিন যে শেষ হয়ে আসছে তা প্রমাণের জন্য বাইরের কোনো শক্তির প্রয়োজন পড়ে নি। খুব সাধারণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে সামন্তবাদকে। সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের শেষ প্রতিনিধি আকবর অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সামন্তবাদকে অস্বীকার করে। আর তা নিষ্ফল ক্রোধে প্রত্যক্ষ করেছেন সামন্তবাদী মানসিকতায় লালিত আফজল সাহেব। *জলপায়রা* গল্পে সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে এভাবে—

> "ধানটা কিছু হয়। তাও ফলন যেবার ভালো সেবার জমিদারের কেমন করে যেন টনক নড়ে। কেঁদে-ককিয়ে কাকুতি-মিনতি করে গোমস্তা-পাইকের কাছে যেটুকু তখন ভিক্ষে করে রাখা যায়। নইলে খাজনাও নেই

Dhaka University Institutional Repository

> যেমন, তেমনি খোঁজও না। জমি-দারের ওপর কথা কইবার জো-ও নেই। কইবে কে ? কিসের ওপর ? জমির ওপর দখলের একটা চিরকুটও কারুর কাছে নেই। পাইক-লেঠেল পাঠিয়ে ঘাড় ধরে যখন খুশি বার করে দিতে পারে তেরিমেরি কেউ করতে গেলে।" (২খ, ১৪৭ পৃ)

তৎকালীন জাতি সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগ্রহ খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। তবে ধর্মীয় সংস্কার ও এর বিরূপ প্রভাবের চিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে একেবারে নেই তা নয়। ছোট বেলায় নিজের এক অভিজ্ঞতা তাকে বেদনাদীর্ণ করেছিল। পরিচিত এক ব্রাহ্মণরমণী স্নেহভরে তাকে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কায়স্থ বালককে খেতে দেয়া হয়েছিল ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পাতায়। কাজটি যে ঠিক হয় নি তা একবারও তার মনে হয় নি। কিন্তু বালক প্রেমেন্দ্র এ ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেদিন না খেয়ে নিঃশব্দে চলে এসেছিলেন। তার মনে বিদ্বেষ না জাগলে জাতি-সংস্কারকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তার এই চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে *সাগর সঙ্গম* গল্পে। ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কিত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে *পঞ্চশর'র* দ্বিতীয় গল্পে। এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন যে, নতুন প্রজন্ম ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কারকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় বন্ধু সহদেবের মা যখন সুধীরকে বলেন—

> "আশীর্বাদ তো রাতদিন করছি বাবা, কিন্তু একটা কথা আজ আমার রাখতেই হবে তোকে। তোরা আজকালকার ছেলে এসব মানিসনে জানি, কিন্তু আজ শুধু না-হয় আমার খাতিরেই আর আপত্তি করিসনে।" (২খ, ২৯৪ পৃ)

এ মন্তব্যের সমর্থনে তার আর একটি বক্তব্যের অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি বলেন—

> "সে তোরা যা বলিস, আমরা ঠাকুর দেবতা বলেই মানি। আমি তো নিজে আজ ঘরের কাজ নিয়েই সকাল থেকে আছি, যেতে পারিনি। ও বাড়ির মেয়েটি আজ সকালে ঠাকুরবাড়ি গিয়েছিল, যত্ন করে এই নির্মাল্য নিজ এনে দিয়েছে— দেখিস যেন পায়ে না ঠেকে। ..... ।" (২খ, ২৯৪ পৃ)

প্রেমেন্দ্র মিত্র অতিক্রম করে এসেছেন বিশেষ সময়কে। এ সময়কে ছুঁয়ে গেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কিশোর। যুদ্ধ পরবর্তী সৃষ্ট সংকট প্রেমেন্দ্র মিত্রকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আর এ দুটি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে ফ্যাসিবাদী শক্তি। সঙ্গত কারণে এই ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। মানবতার অপমৃত্যু কোনো সংবেদনশীল লেখক সমর্থন করতে পারেন না। তেমনি পারেন নি প্রেমেন্দ্র মিত্র। অন্যায় পীড়ন, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে ছিল তার সাহসী অবস্থান। অবশ্য যুদ্ধবিরোধী এই মনোভাব গড়ে ওঠার

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গত কিছু কারণও বিদ্যমান। পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি থেকে তাঁর মনে বিতৃষ্ণভাব তৈরী হয়। উপরন্তু নিজের জীবনের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা পরাধীন জাতির দৃশ্যপট কল্পনা করতে সহায়তা করে। ইংরেজরা সাদা চামড়ার অধিকারী। এই সাদা চামড়ার অধিকারীরাই দখল করেছিল ভারত। ফলে আইন ও অধিকারের সুযোগ ছিল তাদের একচেটিয়া। ছোটবেলায়ই তিনি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এক শ্বেতাঙ্গ বালকের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। শ্বেতাঙ্গ বালকের অন্যায় আবদারই এই বিরোধের মূল কারণ। এ সময় শ্বেতাঙ্গ বালকের পিতা লেখককে (থাপ্পর) মারধর করেন। এ ঘটনা বাড়িতে জানাজানি হলে উল্টো আত্মীয়রা অযথা ফ্যাসাদ বাঁধানোর জন্য তাকেই গাল মন্দ করেন। এ ঘটনা প্রেমেন্দ্রের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরাধীন জাতির দুর্বল ও হীন প্রবৃত্তি অনুভব করলেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। এজন্য তখন থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে সুতীব্র হয়ে ওঠে। একই কারণে তিনি অন্যায় যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। *থার্মোফ্লাস্ক* ও *চীনের যুদ্ধ* ছোটগল্পে তিনি যুদ্ধ বিরোধী চেতনাকে তুলে ধরেছেন। একটি তোবরানো থার্মোফ্লাস্ককে ঘিরে এসেছে চীনের যুদ্ধের কথা। এই যুদ্ধে জাপান অন্যায়ভাবে হামলা চালায় চীনের ওপর চালায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। লেখক এই যুদ্ধকে দেখেছেন এভাবে—

> "অবশ্য থার্মোফ্লাস্কটা ছাড়া আরো অনেক কিছু সে লক্ষ করেছে। বিছানার ধারে 'টিপয়ে' চাকরে চা রেখে গেছে। তারই সঙ্গে খবরের কাগজ। চীনের ওপর জাপানের অত্যাচার সম্বন্ধে ছাপার হরফের তীব্র আর্তনাদ সেখানে সমস্ত কাগজটার ওপর এমনভাবে বিস্তৃত যে লক্ষ না করে উপায় নেই। জাপানী উড়ো জাহাজের বোমায় বিধ্বস্ত চীনের নগরের খানিকটা বড় হরফে ছাপা বিবরণ বুঝি অন্যমনস্কভাবে সে পড়ে ফেলেছে ...."(২খ, ১১৯ পৃ)

পটভূমিকা গল্পেও আছে যুদ্ধের প্রসঙ্গ। তবে এ গল্পের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এসেছে স্বদেশের অবস্থানের আলোকে। আর এ যুদ্ধে ও যুদ্ধকালীন আমাদের সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন লেখক অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। তার পর্যবেক্ষণশীল মন ও মনন এ চিত্র অঙ্কনে সহায়তা করেছে। ফলে যুদ্ধকালীন আমাদের সমাজের অবস্থানের ছবি যেমন পাই তেমনি তৎকালীন সমাজের অবস্থানের একটি বিশেষ দিকের প্রতিও লেখক ইঙ্গিত করেছেন। তিনি সমাজ পর্যবেক্ষণে দেখেছেন সে সময় প্রায় সব মানুষের আকাঙ্ক্ষা শহরকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা বেছে নেয়া। কলকাতা ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে। বিশেষত যুবকদের মধ্যে এই প্রবণতা ছিল সর্বাধিক। আর অবস্থাপন্ন যেসব পরিবার— তারাও প্রায়ই শহরে আবাস গড়ে তুলেছে। এ অবস্থার ফলে গ্রামে প্রয়োজনের সময় যুবক খুঁজে পাওয়া যায় নি। ফলে গ্রামে তৈরী হয় সামাজিক সঙ্কট। লেখক এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> "কদিন আগে হারান বুড়োর গঙ্গাযাত্রার খাট বইবার জন্যে যেখানে চারটে জোয়ান ছেলে বোয়ানবাদি থেকে বীরগঞ্জ পর্যন্ত খুঁজে বার করতে হয়রান হতে হয়েছে। সেখানে ছেলের দল পিল-পিল করছে আজকাল ঘরে ঘরে।" (২খ, ২০১ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

লেখক জানিয়েছেন যুদ্ধের জন্যই গ্রামের এই পরিবর্তন। কলকাতায় বোমার ভয়ে আজ তারা গ্রামে এসে ভিড় করেছে। নিতান্ত জীবন বাঁচানোর তাগিদ ছাড়া গ্রামের টানে যে তারা আসে নি এটা নিশ্চিত। লেখকের এ বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে—

> "কলকাতায় বোমার ভয়েই বুঝি গাঁয়ের এমন বরাত খুলেছে হঠাৎ। ভিটেতে তিন পুরুষ যাদের সন্ধ্যা পড়েনি এতদিন, তাদেরও পোড়ো বাড়িতে হঠাৎ জনমজুর লেগে গিয়েছে বাড়ি মেরামত করতে।
>
> হেঁজি-পেঁজি থেকে হোমরা-চোমরা গাঁয়ে যার এতটুকু আস্তানা আছে, কেউ আর আসতে বাকী নেই।
>
> সামন্তদের ভুতুড়ে ভিটেটাতেও দেখা যায় রাত্রে আলো জ্বলে। সামনের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে দুটো নতুন ঘরের চালাও এরই মধ্যে তোলা হয়ে গিয়েছে।" (২খ, ২০১ পৃ)

যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে তাঁর *পিস্তল* ছোটগল্পেও। বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতে ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি এবং এই প্রেক্ষিতে লেখক পরাধীন জাতির ছিন্নমূল মানুষের মানসিকতা উন্মোচন করেছেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছে তা তাদের শাসন ক্ষমতা পরিচালনার সুবিধার্থে। কিন্তু যুদ্ধকালে এই স্বল্প অবকাঠামোয় যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই নতুনভাবে অবকাঠামো নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়ে। সেই উদ্যোগই তখন ব্রিটিশরা এখানে চালিয়েছিল। ফলে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চালচিত্রে পরিবর্তন আসে। লেখক সে পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "ছোটো একটা জংশন-স্টেশন। আগে দু-চারটে ট্রেন দিন-রাতের মধ্যে পার করে বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সারাক্ষণ ঝিমোত।" (২খ,১৮৬পৃ)

যুদ্ধের বাজারে মিলিটারি কন্ট্রাকটরের মতো হঠাৎ ফেঁপে ফুলে একেবারে রাতারাতি চেহারা বদলে গেছে। প্লাটফর্মে ট্রেন দাঁড়ালে, স্টেশনের পুব দিকে যে পাথুরে ঢিবিটা এতদিন দিগন্ত আড়াল করে থাকতো, ফেতেচাঁদ সিন্ধির হাজার কুলি-কামিন ছ মাসের মধ্যে গাইতি কোদাল শাবলে সেটা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানে তিন-তিনটি সাইডিং বানিয়ে ফেলেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজসচেতন শিল্পী। রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করেছিল। বন্ধু ও সহপাঠী শৈলজানন্দ তাঁর সম্পর্কে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন—

> "নন-কোঅপারেশনের বান-ডাকা দিন। আমাদের কলেজের দোতলার বারান্দা থেকে দেশ বন্ধুর বাড়ির আঙ্গিনা দেখা যায় – শুধু এক দেয়ালের ব্যবধান। মহাত্মা আছেন, মহম্মদ আলী আছেন, বিপিন পালও আছেন বোধ হয়— তরঙ্গ তাড়নে কলেজ প্রায় টলোমলো। কি করে যে আঁকড়ে থাকলাম কে জানে, শুনলাম প্রেমেন ভেসে পড়েছে।"[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

পরাধীন দেশে ছোটবেলার একটি ঘটনাও তাঁর মনে প্রবলভাবে রেখাপাত করেছিল। সেই ঘটনা তাকে যেমন স্বাধীনচেতা হতে শেখায়, তেমনি অকুণ্ঠ সমর্থন লক্ষ করা যায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি। শরৎচন্দ্র *পথের দাবি* উপন্যাসে যেমন স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াইকে সমর্থন করেছেন তেমনি এর প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তার প্রমাণ পাওয়া যায় *সামনে চড়াই* ও *পাহাড়* গল্পে। এই দুটি গল্প তিনি লিখেছেন সশস্ত্র সংগ্রামকে উপজীব্য করে। এতে তিনি বিপ্লবীদের দেশের বীর সন্তান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যারা নিজের জীবনকে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র দুটি বিশ্বযুদ্ধ অবলোকন করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন যুদ্ধের ভয়াবহতা ও এর বিরূপ প্রভাব। মানবতাবাদী দেশপ্রেমিক শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতার বিরোধী। এই বিরোধিত বিষয়কে উপজীব্য করে লিখেছেন *থার্মোফ্লাস্ক* ও *চীনের যুদ্ধ, পটভূমিকা, পলাতকা* ইত্যাদি ছোটগল্প।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১। অরুণকুমার পুখোপাধ্যায় : *কালের পুত্তলিকা*, (কলকাতা,১৯৯৫), পৃ:১৪৪

২। প্রাগুক্ত, পৃ:১৭৮

৩। প্রাগুক্ত, পৃ:১৮৭-১৮৮

৪। প্রাগুক্ত,পৃ:১৮৬-১৮৭

৫। নান্টু রায় (সম্পাদক), *ভারত বিচিত্রা*, (ঢাকা, মে-২০০৫), (প্রবন্ধ সেলিনা হোসেন : প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্মশতবর্ষে আমরা), পৃ:৩২

৬। প্রাগুক্ত, পৃ:৩১

৭। সুমিতা চক্রবর্তী : *প্রেমেন্দ্র মিত্র*, (কলকাতা,১৯৯৮), পৃ: ২৫

৮। সেলিনা হোসেন : প্রাগুক্ত,পৃ৩১

৯। সুমিতা চক্রবর্তী : প্রাগুক্ত,পৃ: ২৯

১০। প্রাগুক্ত,পৃ: ৪৩

১১। প্রাগুক্ত,পৃ: ৪৬

১২। প্রাগুক্ত,পৃ: ৫১-৫২

১৩। সম্পাদক (নাম উল্লেখ নেই), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা,১৯৮৯)
সম্পাদক (নাম উল্লেখ নেই), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, ২য় খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক (নাম উল্লেখ নেই), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, ৩য় খণ্ড, (কলকাতা,১৯৯৩)

এই গ্রন্থগুলো থেকে বর্তমান অধ্যায়ে যে উদ্ধৃতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে এর পর থেকে সেই উদ্ধৃতির পাশে সংক্ষেপে শুধু খণ্ডের সংখ্যা ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হবে।

১৪। নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদক) : *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মধ্যবিত্তের জীবনসংকট নিরীক্ষণ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এই তিন ধরনের চরিত্রই রয়েছে। তিনি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির চরিত্রবৈশিষ্ট্য অসাধারণ দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন। এর মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্রের সংখ্যাই বেশি। তাদের জটিলতার মাত্রাও ভিন্ন ধরনের। এদের মধ্যে অনেকেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারি, চিত্রশিল্পী, লেখক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্যান্য সৃজনশীল কাজের সঙ্গে জড়িত মানুষ। চালচুলোহীন ভবঘুরে স্বভাবের অসাধারণ কিছু মধ্যবিত্ত পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে। আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোকে অর্থনৈতিক সংকট ও মানসিক সংকট এ দুটো ভাগে বিভক্ত করেই আলোচনার প্রয়াস চালাব।

ঔপনিবেশিক শাসন ও পর পর দুটি মহাযুদ্ধের কারণে বাঙালিকে প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়। এজন্যে একটি শ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রাম বেশ লক্ষযোগ্য। অবশ্য সে সময় বাঙলার বাইরে অর্থনৈতিক সঙ্কট ছিল আরো তীব্র। আন্দোলন সংগ্রাম ও শাসন কেন্দ্রের কারণে কলকাতার বিকাশ ঘটে অতি দ্রুত। সেকারণে সে সময় আইনজীবী (ব্যারিস্টার ও উকিল), চিকিৎসক, নার্স, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক-অধ্যাপক, কবি-লেখক, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিক, কেরানীসহ প্রায় সকল শ্রেণির পেশাজীবী মধ্যবিত্ত পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর ফলে এখানে দ্রুত একটি পেশাজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকাশ লাভ করে। যারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয় ব্রিটিশ সরকারে। এমনকি ব্যবসা বাণিজ্যেও তারা কিছুটা অগ্রসর ভূমিকা পালন করার সুযোগ পায়। বাঙলার বাইরেও তারা মর্যাদাকর আসন দখল করে নিতে সক্ষম হয়। বলা যায়, উনিশ শতকেই বাঙালি জাতির নবজাগৃতি ঘটে। এই নবজাগৃতির সঙ্গে সৃষ্টি হয় কিছু জটিল সংকটও। পরিপক্ব মানসিকতার কারণে এই জটিলতা উজ্জ্বলরূপে প্রাণ পায়। অর্থনৈতিক ও মানসিক সংকট প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তার স্বরূপ নিম্নে আলোচনা করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক সংকট

ভবিষ্যতের ভার গল্পের নায়ক আদর্শবাদী হেড মাস্টার। আদর্শিক স্বপ্ন নিয়ে যোগ দেন স্কুলশিক্ষকতায়। উদ্দেশ্য ছেলেদের মানুষ করবেন। সমাজ ও মানুষের মনে শিক্ষার আলো ছড়াতে গিয়ে যদি সামান্য কষ্টও হয় তাতে তার আপত্তি নেই। পরিচ্ছন্ন ও সংগ্রামী এই

Dhaka University Institutional Repository

মানুষটি স্কুলে যোগদানের পর প্রত্যক্ষ করেন নানা অসঙ্গতি। এসব দেখে তিনি মনে মনে দোষ দেন কর্মরত শিক্ষকদের। অন্যদিকে নিজে এসব সংকট নিরসনে উদ্যোগী হন। আশা তার মানবলোকে ভালো কিছু করার, এমন সুন্দর স্বপ্নের ছবি বিরাজমান তার অন্তরে। স্ত্রী ও মামা স্কুলমাস্টারি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করলে তাতে কর্ণপাত করেন না। স্ত্রী শিক্ষকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না তুললেও এ চাকরিতে যে অর্থ কম এ কথা জানাতেও ভোলেন না। কিন্তু মামা শিক্ষকতার মানসিকতায় আঘাত হানেন। মামা তাকে এও বলেন—

> "সাধ ক'রে কেউ কি মাস্টারি করে! বলে, দশ বছর মাস্টারি করলে গোরু হয়, বিশ বছরে গাধা! ছেলে ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। পাঁচ বছর মাস্টারি করেছে শুনলে মার্চেন্ট আপিসে ঢুকতেই দেয় না –"(২খ, ৪পৃ)

এসব মতের বিরুদ্ধে আদর্শবাদী এই তরুণ শিক্ষকতা সম্পর্কে ধারণ করেন সুউচ্চ মনোভাব। স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষকতা সম্পর্কে তিনি জানান—

> "শুধু সম্মান ? এ কত বড়ো কাজ বলো দেখি! কেরানিগিরির সঙ্গে এর তুলনা হয়! না খেতে পেয়ে মরলেও যে এতে সান্ত্বনা থাকবে কিছু করে মরলাম । ...."(২খ, ৪পৃ)

শিক্ষকদের বিশ্রামাগার ও ছাত্র পড়ানোর কক্ষ কোনোটি শিক্ষার উপযোগী নয় দেখে কষ্ট পান তরুণ শিক্ষক। উঠে পড়ে লাগেন বিদ্যালয়টিকে শিক্ষার উপযোগী রূপ দিতে। ক্লাস রুমে পায়রা পচে গন্ধ বের হয়। শিক্ষকদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন—

> "ওখানে কে উঠবে মশাই। ও খানিক বাদে গন্ধ আপনিই যাবে' খন।" (২খ, ৫পৃ)

স্কুলের দুরন্ত ছাত্র ফনে তা পরিষ্কার করতে চাইলে বাধা না দিয়ে উৎসাহ দেন এই তরুণ শিক্ষক। তার ভালো লাগে এই দুরন্ত ছাত্রকে। নিষ্প্রাণ এই জগতে ফনেকেই একমাত্র প্রাণবান মনে হয় এই তরুণ শিক্ষকের। নানা কাজের মধ্য দিয়ে স্কুলের দিন কাটলেও অর্থসংকটে সংসারের দিন কাটে না। স্ত্রী যথাসাধ্য চেষ্টা করেন অল্প খরচে সংসার চালানোর। স্ত্রীর সান্ত্বনায়ও এ পর্যায়ে তার দুর্ভাবনা যায় না। মেহমানের যত্ন করতে না পেরে লজ্জায় পড়েন। শুধু তাই নয় পায়ের লজ্জা ঢাকতেও জুতোয় পট্টি লাগাতে হয়। তার ঘরে নয়, স্কুলেও টানাটানি। মন যা চায় তা তিনি করতে পারেন না। এতে তার দুঃখবোধ ও হতাশা বেড়ে যায়। তিনি ইনফ্যান্ট-ক্লাসের ছেলেদের জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থাটুকুও করতে পারেন না, পাঠ্য পুস্তকের নতুন তালিকার প্রস্তাব করতে গিয়েও বিপদে পড়েন। এ ধরনের কাজ করে অনেকেই যে বইওয়ালাদের কাছ থেকে পয়সা উৎকোচ গ্রহণ করে তা জানাতে থার্ড পণ্ডিতমশাই দ্বিধা করেন না। চতুর্মুখি সংকটে পড়ে তার শুভবুদ্ধি চর্চার জায়গা দখল করে নেয় হতাশা। এই নিত্য নৈমিত্তিক একঘেঁয়েমি অসহ্য ঠেকে। হাঁপিয়ে উঠেন। চরম আঘাত পান

Dhaka University Institutional Repository

ফনের স্কুল ছাড়ার মধ্য দিয়ে। এই ছেলেটির মাঝেই তিনি প্রাণের স্ফুরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। এ অবস্থায় দুটো টিউশনিও চলে যায়। এদিকে খোকাও আক্রান্ত হয় লিভার দোষে। নিজের অসহায়তার রাগ ঝাড়েন ডিটেকটিভ বই পড়া ছাত্রের উপর।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই পৈশাচিক রাগ প্রকাশ হওয়ায় বিস্মিত হন তিনি। এখানে তার ভোগান্তির শেষ নয়। আরো আছে। অর্থসংকটের কারণে জুতো কিনতে না পারায় ছেঁড়া জুতো পরে বর্ষায় ভিজে পায়ে থাকতে হয়। এতে সর্দি থেকে প্রতিদিন মাথা ব্যথা ধরে যায়। রোগাক্রান্ত হয়ে শরীরের হাড় বেরিয়ে আসে। এ পরিস্থিতি সাহসের সঙ্গে মোকাবেলার চেষ্টা করেন। অবসন্ন শরীর নিয়ে আদর্শবাদী তরুণ স্কুলে শেষের দুই ঘণ্টা বই পড়তে না পেরে বাধ্য হয়ে ছেলেদের লেখতে দেন। শুধু তাই নয় এক পর্যায়ে ক্লাসে ঘুমিয়েও পড়েন।
অভাবে আদর্শবাদী স্কুলশিক্ষকের ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। নেমে আসেন অন্য শিক্ষকদের সমতলে। কাজে ফাঁকি দিলেও শেষ পর্যায়ে তার অনুশোচনা লক্ষ করা যায় না। অভাব-অনটনে পড়ে লড়াইয়ে হেরে যায় মধ্যবিত্ত মানুষের শুভবোধ; তাই ফুটে উঠেছে আদর্শবাদী পরাজিত এ শিক্ষকের মধ্য দিয়ে।
এই গল্পের আরো যেসব চরিত্র পাই তাদের মধ্যে রয়েছেন, ষাটোর্ধ্ব সেকেন্ড পণ্ডিত, থার্ড পণ্ডিত ও ফোর্থ পণ্ডিত। এই তিন জন তরুণ আদর্শবাদী হেড মাস্টারের পূর্বসূরি। অভাবের তাড়নায় তারা নীতি ও নৈতিকতাবোধ হারিয়েছেন। এসে ঠেকেছেন কোনো মতে সময় অতিবাহিত করার চিন্তায়। তবে তারা যে শোষিত হচ্ছেন এই স্বাভাবিক বোধ ও বুদ্ধি তাদের রয়েছে। এই দুর্বহ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার স্পৃহা তাদের মধ্যে নেই। জীর্ণশরীর, ক্লান্ত মন ও মননে তারা আজ চরম অসহায় পরিবর্তিত জটিল সামাজিক প্রেক্ষাপটে। পণ্ডিত মশাইয়ের কথায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন—

> "গবর্ণমেন্টের ইস্কুল হলে এতদিন কবে পেন্‌সান পাবার কথা। ইস্কুল ঠাঁই-নাড়া হলই তো ছবার।" (২খ, ১পৃ)

এক পণ্ডিতমশাইয়ের শারীরিক ও মানসিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে—

> "যে বর্তমান পদে-পদে তাঁর জগতের সব কিছুর মূল্য পালট করে দিচ্ছে, তার ভালো-মন্দ সব কিছুকে নির্বিচারে দাঁত খিঁচনোই তাঁর একমাত্র সুখ। রক্তহীন শীর্ণ চেহারা; দীর্ঘকালের অজীর্ণ রোগ ও বিদ্বেষ মিলে মুখে একটা স্থায়ী বিরক্তির ছাপ এঁকে দিয়েছে।" (২খ, ২পৃ)

আর এক পণ্ডিত মশাই ডাল রকে খবরের কাগজের উপর শুকান। বৃষ্টি আসলে তা ভিজেও যায়। এসব চরিত্রের মধ্যে আমরা মধ্যবিত্তের ছবি পাই, যারা নিষ্পেষিত হয় অর্থের যাঁতাকলে। তারা মুক্তির উপায় বের করতে পারেন না। পারেন না নিজের ভাগ্য বদলাতে।
গল্পের এক অংশে কলকাতা শহরের মধ্যবিত্তের পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে এভাবে—

> "শহরতলির সামান্য বাংলা স্কুল।

Dhaka University Institutional Repository

> শহরতলিটিও প্রাচীন ও দরিদ্র। যে নগণ্য পাকা বাড়িগুলি এখনো তার গৌরব রক্ষা করে তাদের সবারই অতি জীর্ণ দশা। রাস্তাগুলি অপরিসর ও অপরিষ্কার এবং তারই ধূলোর ওপর দিয়ে প্রতিদিন সেখানকার তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অতিকষ্টে করুণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে নগ্ন দারিদ্র্যকে নামমাত্র আবরণে ঢাকবার কঠিন চেষ্টায় যাতায়াত করে।" (২খ, ২৩পৃ)

জ্বর গল্পের নায়ক পেশায় স্কুলমাস্টার। ব্যর্থতা তারও জীবনে নিত্যসঙ্গী। সংসারের ঘানি টানতে সে অপারগ। এক কথায় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যর্থ কাণ্ডারি। তার সম্পর্কে স্ত্রী ও শ্বশুরের মূল্যায়ন এ রকম—

> "রাস্তায় ঘাটে সত্যই তো পয়সা ছড়ানো, কিন্তু কুড়িয়ে নেবারও তাকত চাই।"(২খ, ১৬৫পৃ)

> "নেহাত হতভাগা না হলে আজকের দিনে কেউ আর বেকার নেই।" (২খ, ১৬৫পৃ)

> "মানুষ হলে কেউ স্কুল-মাস্টারি করে আজকের দিনে ? তার চেয়ে রিক্‌শা টানলেও অনেক বেশি লাভ।"(২খ, ১৬৫পৃ)

সে সময় স্কুলমাস্টার সম্পর্কে ধারণা ছিল এমনই। শুধু তাই না অকর্মন্য অক্ষম এক জামাইয়ের হাতে কন্যা দান করার ভুলের কথা কখনো তিনি মুছে ফেলতে পারেন নি। এহেন স্কুলমাস্টার সংসারের হাল শক্তভাবে ধরতে পারে না। তেমনি প্রেমকে সফল পরিণতি দিতে পারে না ।

স্কুলমাস্টারিতে যোগ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার সময় দেখা হয় প্রাক্তন প্রণয়িনীর সঙ্গে। প্রণয়িনীর নাম শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠা ডেকে নেয় স্কুলমাস্টারকে। এখনো তার প্রতি শর্মিষ্ঠার রয়েছে তীব্র আকর্ষণ। দারিদ্র্যের কারণে প্রাক্তন প্রণয়িনীর প্রতি তার স্বাভাবিক আকর্ষণটুকুও আর নেই। এ সম্পর্কে তার মন্তব্য—

> "ভাবলাম বলি— আমার কথা শোনার ধৈর্য কি তোমার আছে শর্মিষ্ঠা ? যেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, সেখান থেকে আমি অনেক ধাপ নেমে এসেছি, তুমি গেছ উঠে। আমি দরিদ্র স্কুল-মাস্টার, ব্রত বড়ো, নিষ্ঠা নেই। যুদ্ধের বাজারে আগুন যেখানেই লাগুক, ছাই হল আমাদের সংসার সবার আগে। তাই আজকের দিনে আলাদীনের প্রদীপ যাদের হাতে তাদের একজনের দরজায় লোভে, দুরাশায় ধন্না দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাও ভাগ্যে সইল না। জ্বরে পড়ে রুগ্‌ণ দেহ নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

> পুনর্মুশিক হয়ে ঘরে ফিরছি। তুমি আমার জীবনে, কবে কী ছিলে তা মনে রাখবার উৎসাহটুকুও আমার নেই।"(২খ, ১৬৭-১৬৮পৃ)

এখানে অবস্থান সম্পর্কে তার বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রক্ত মাংসের একজন মানুষের যে স্বাভাবিক আচরণ তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এমন বাস্তববোধের পরিচয় সে পরেও দিয়েছে।

শর্মিষ্ঠার মানিব্যাগ থেকে এক তোরা নোট বের করে নিয়ে সেখানে সে চিঠির টুকরো রেখে দেয়। তাতে সে লিখেছে—

> "তোমার কাছে অনেক বড়ো পাওনা আমার ছিল, তার সামান্য কিছু শোধ নিলাম।"(২খ, ১৬৮পৃ)

এখানে সে অর্থপ্রাপ্তির ওপরই গুরুত্ব দিয়েছে। অথচ শর্মিষ্ঠার কাছ থেকে তার মানসিক প্রশান্তি লাভের সুযোগ ছিল। শর্মিষ্ঠা তাকে সুযোগ পেয়ে বলেছে—

> "আমার কাছে কত বড়ো পাওনা তোমার ছিল, তার কী-ই বা দিতে পারলাম "(২খ, ১৬৭পৃ)

অভাবের তাড়নায় এককালের প্রাণবন্ত প্রেমিক যুবক এখন একরৈখিক রস-প্রাণহীন স্কুলমাস্টারে পরিণত হয়েছে। অথচ এই পরিণতির জন্য তার কোনো অনুতাপ আছে বলেও মনে হয় না।

চুরি গল্পের স্কুলমাস্টার প্যারিমোহনবাবু ধৈর্যশীল মহৎ ও জীবন সংগ্রামে পরাজিত সৈনিক। কলকাতায় শিক্ষকতা করেন। তিনি কলকাতার মানুষের জীবনবোধের পরিবর্তনকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু নিজে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হতে পারেন নি। অথচ মানসিক দিক দিয়ে প্রবলভাবে আত্মসচেতন এক মানুষ। আর এখানেই জড়িয়ে আছে তার গভীর সঙ্কট। সে সঙ্কটে তিনি নিজেও পুড়েছেন পরিবারের সদস্যদের ভবিষ্যৎ জীবনকে করেছেন কণ্টকিত, ধূসর স্বপ্নহীন। পাঠকের অন্তরকেও মথিত করেছেন। প্যারিমোহনবাবুর সততা পাঠক হৃদয়কে উন্নতবোধ ও মননে পরিশীলিত হতে উদ্বুদ্ধ করে কিন্তু পরক্ষণে সংসার জীবনের গ্লানিকর ব্যর্থতা পাঠক মনে নতুন ভাবান্তর সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক সংকট ও জীবনকে সুন্দর করে তোলার দিক নির্দেশনার অভাবে বিনষ্টির পথে এগিয়ে যায় প্যারিমোহনবাবুর প্রাণপ্রিয় সন্তানেরা। যাদের তিনি প্রবহমান রাখতে চেয়েছিলেন নিজ আদর্শিক ধারায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি সন্তানের নৈতিক অবক্ষয়ের কথা জেনেও কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না। নিষ্ফল ক্রোধে ও আত্মদহনে দগ্ধ হন। প্যারিমোহনবাবু অত্যন্ত দক্ষ ও সৎ শিক্ষক। নৈতিকতার কারণে তিনি দোকানদারকে ভুল করে দেয়া অতিরিক্ত দুটি পয়সা ফেরত দিতে যান। অতিরিক্ত পয়সা ফেরত দিতে গিয়েও তিনি অপমানিত হন।

লেখক প্যারীমোহনবাবুর মানসিক অবস্থাকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "প্যারীমোহনবাবু আবার বাড়ির পথ ধরলেন। আপনা থেকে পয়সা ফেরত দিতে গিয়ে দোকানদারের যে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞাটুকু পেলেন, তাতে আহত না হবার মতো অসাড় এখনো তিনি হননি, কিন্তু তবুও এ ধরনের অবজ্ঞা অনেকটা এখন সয়ে গিয়েছে। সাধারণত মানুষের কাছে অবজ্ঞাই এখন তিনি পেয়ে থাকেন, সে-অবজ্ঞা করুণা বা সদয় সহানুভূতির আবরণে বরং আরো তিক্তই লাগে।"(২খ, ১৮০পৃ)

এমন পরিস্থিতিতে জীবনে তিক্ততা আসাই স্বাভাবিক। কেননা সংসারের প্রয়োজনেই তারই এককালের স্কুল ও প্রাইভেট ছাত্র রাখালের কাছে অপমানিত হতে হয়। সে অপমান হতে হয় রাখালের বন্ধুর সামনে। অথচ এই রাখাল ছাত্রকালে শয়তানি বুদ্ধিতেই ছিল পাকা। কৌশুলী রাখাল তাকে বাড়ির মাস্টার রেখেও বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারে নি। কিন্তু শেষ পরীক্ষায় বেড়া কোনো মতে টপকাতে পেরেছিল। রাখালের ছেলে সৌখিন স্কুলে পড়লেও প্যারীমোহনবাবুকে পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিল। এতে প্যারীমোহনবাবু আর্থিকভাবে বেশ উপকৃত হন।

রাখালের ছেলে যখন কলেজে পড়ে তখন তিনি অংক পড়াতে চেয়েছিলেন। তখন রাখাল যে পরামর্শ প্যারীমোহনবাবুকে দেয় তা রীতিমত অপমানজনক। এখানে রাখালের প্রস্তাব তুলে ধরা হল—

> "আমি বলি কী, মাস্টারমশাই, এ লাইনটাই ছেড়ে দিতে পারেন না ? সারাজীবন মাস্টারি করে তো দেখলেন, জাতও গেল পেটও ভরল না। আমাদেরই শশাঙ্কবাবু, স্কুল ছেড়ে চোরাবাজারে ঢুকে কী রকম ফেঁপে উঠেছেন জানেন তো! পুকুরকে পুকুর চুরি করে মেরে দিচ্ছেন। মাস্টারি নিয়ে পড়ে থাকলে কী আর হত ! উপোস করে দিন যেত তো। আপনি যদি রাজী থাকেন তো বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই সেনেরই একজন লোক দরকার, বলছিল, কেয়াতলা না কোথায় ওর বাইরের কাজ দেখবার জন্যে। একটু সুবিধেমাফিক চোখ দুটো বুজিয়ে রেখে হাত বাড়াতে পারলে দেখবেন, হাত মুঠো করতে পারছেন না— লক্ষ্মী হাত উপছে পড়ছে।"(২খ, ১৮৩পৃ)

বাড়ি ফিরে তিনি আরেক সঙ্কটে পড়েন। মেয়ে উমাকে নতুন শাড়ি পড়তে দেখে অবাক হন। স্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন উমার জন্ম দিনে পুলিনবাবু শাড়িটি উপহার দিয়েছে। সংকোচ ঢাকার জন্য স্ত্রীর কণ্ঠে অতিরিক্ত ঝংকার শুনতে পান। কেনো এ ঝংকার প্যারীমোহনবাবু তাও বুঝেন। অথচ পুলিনবাবুর চরিত্র সম্পর্কে হেমলতা সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। হেমলতার পরিবর্তন প্যারীমোহনবাবুকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। নীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন বলে দুর্ভোগ ও কষ্ট তার বেড়ে যায়। প্যারীমোহনবাবুর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

Dhaka University Institutional Repository

> "প্যারীবাবু সরল ও সত্যাশ্রয়ী বলে নির্বোধ নন। শুধু এতদিন তাঁর দৃষ্টি নিজের দুশ্চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল। এ-ঘনিষ্ঠতার আসল চেহারা আজ এই শাড়িটির সাহায্যে তার সমস্ত জঘন্যতা নিয়ে তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই জীর্ণ বাড়িটার সমস্ত শ্রী ও শালীনতার আবরণ যেমন ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে, তার দুর্বল ইটগুলো যেমন নোনাধরার বিষক্রিয়া ঠেকাতে না পেরে ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ তাঁর সংসারেরও সেই পরিণাম তিনি চোখের ওপর দেখতে পান। অভাবের ছিদ্রপথে কলুষ ও গ্লানি এ-সংসারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে।"(২খ, ১৮৫পৃ)

এই কলুষ ও গ্লানি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যখন প্যারীমোহনবাবু জানতে পারেন তার ছোট ছেলে নেপু চুরি বিদ্যা শিখেছে। এ সংবাদ জানার পরও তিনি কিছু করতে পারেন না। তার চেহারায় চরম ক্রোধ প্রকাশ পেলেও তা স্থায়ী হয় না। তিনি পাখার বাট দিয়ে মারতে গিয়েও তা থেকে বিরত থাকেন। তারপর তিনি পাখাটা সেখানে ফেলে দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ছাতাটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

এই চরম অবমাননাকর অবস্থায় প্যারীবাবুর বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া ছাড়া আর করার কোনো উপায় সত্যি থাকে না। কেননা প্রতিরোধের সমস্ত রাস্তা তার বন্ধ হয়ে এসেছে। এ গল্পে আমরা সৎ, সফল ও সুনাম অর্জনকারী শিক্ষক কিন্তু অভিভাবক হিসেবে ব্যর্থ এক পোড় খাওয়া ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই। এই নিম্ন মধ্যবিত্ত স্কুলশিক্ষকের চরিত্র একদিকে একরৈখিক। কেননা একজন সচেতন শিক্ষক হয়েও তিনি সন্তানদের মানুষ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার সন্তানদেরকে মানুষ করার কোনো পরিকল্পনার কথাও জানা যায় না। যদিও তিনি ছাত্র পড়ানোর সময় অত্যন্ত মনোযোগী। প্যারিমোহনবাবুর জীবন ও সংসারের যে চিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র উপস্থাপন করেছেন তাও বিরল নয়। একমুখিনতার কারণে অনেক স্কুলশিক্ষকের বিপর্যকর অবস্থা প্রায়ই দেখা যায়।

নিশাচর গল্পের নায়ক বিভূতিভূষণ সামান্য বেতনের কর্মচারী। বিয়ের পর থেকে স্ত্রী অমলা অসুস্থ। স্ত্রীর অসুস্থতায় সংসারে সুখের হাওয়া মিলে না। এ অবস্থায় সে স্ত্রীকে চেঞ্জে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। খরচের কথা ভেবে অবশ্য অমলা চেঞ্জে যেতে অসম্মতি জানিয়েছিল। বিভূতি নানাভাবে বুঝিয়ে অমলার আপত্তি দূর করেছিল। অমলা সে সম্বন্ধে কথা পাড়লে বিভূতিভূষণ বলেছে—

> "ভাবনা-টাবনা ছেড়ে তুমি শুধু তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার চেষ্টা করো দেখি।"(২খ, ১১২পৃ)

তবে চেঞ্জে যাওয়া যে তার সামর্থ্যের মধ্যে ছিল তা নয়। অনেক কষ্টে সে অর্থ বিভূতি সংগ্রহ করেছে। লেখক তার এ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখিয়া তারিফ করিবার তাহার সময় নাই। তাহাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয়। এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তাও আধা মাহিনায়। ছুটি ফুরাইলে আরেকটা দরখাস্ত করিতে হইবে; কিন্তু মনিবেরা আর গ্রাহ্য করিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অমলা এক মাসে কিই বা সারিবে। দিন-কুড়ি হইয়া গেল, তবু নিয়মিত জ্বর তো এখনো আসিতেছে। এখানকার লোকেরা বলে অন্তত তিন মাস না থাকিলে নাকি এখানকার জল ভালো করিয়া গায়েই বসে না। কিন্তু তিন মাস ছুটি যদি বা মিলে এখনকার খরচ কুলাইবে কেমন করিয়া? সাহস করিয়া ভগবান ভরসা করিয়া সে রুগ্‌ণ স্ত্রীকে লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে, কিন্তু সাহসেরও একটা সীমা আছে। চেঞ্জের জায়গা হিসাবে বাড়িটির ভাড়া অত্যন্ত অল্পই বটে, কিন্তু সেই অল্পই যে তাহার কাছে দুর্বহ বোঝা।" (২খ,১১২পৃ)

পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করার মানসিকতা বিভূতির নাই তা নয়। অর্থনৈতিক সঙ্কট ও স্ত্রীর রোগ না সারার লক্ষণ তার মনে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। চেঞ্জে আসার শুরুতে তারা দুজনে এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। বিভূতিভূষণ যে সৌন্দর্য সচেতন কম নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় লেখকের এ বর্ণনা থেকে—

> "প্রথম প্রথম তাহাদের কী সুখেই কাটিয়াছে। নূতন দেশের সৌন্দর্য ও বিস্ময় মুগ্ধ চোখে শুধু দেখিয়া নয়, পরস্পরকে বলিয়া যেন তাহারা ফুরাইতে পারে নাই।"(২খ, ১১২পৃ)

বিভূতির মনে শঙ্কা জাগলেও অমলা প্রকৃতির সৌন্দর্যে তখনো বিভোর। অমলা প্রকৃতির সৌন্দর্য সুধা পান করেই তৃপ্ত থাকে নি তা প্রকাশ করতে চেয়েছে বিভূতির কাছে। বিভূতিকে সৌন্দর্য সম্পর্কে বলতে গিয়েই বাধে সঙ্কট। যা দুটি জীবনে নিয়ে আসে অকাল অপমৃত্যু।

অমলা একদিন জানতে চায় অতো কী ভাবছে বিভূতি যে তার কথা শুনতে পায় না। অমলার এ কথায় বিভূতি অসহিষ্ণু হয়ে জানায়—

> "তোমার ও একঘেয়ে এ সুন্দর তা সুন্দর শুনতে আর ভালো লাগে না বাপু! সুন্দর দেখে তো আর পেট ভরবে না।"(২খ, ১১২পৃ)

বিভূতির এ ধরনের কথায় উচ্ছ্বাসের মধ্যে বাধা পেয়ে অমলা লজ্জিত হয়। এ ধরনের কথায় অমলা ভাবে স্বামীর এ বিরক্তি ক্ষণিকের, এখনি সে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে আসবে। তাই সে ভাবে রাগ না করে একটু মজা করবে। কিন্তু বিভূতি স্ত্রীর এ মানসিকতা বুঝতে ব্যর্থ হয়। তখন সে তার অর্থের ফায়দা আদায়ের কথাই ভাবে বেশি করে। প্রচণ্ড অভিমানে দরজায় খিল দেয়ার আগ পর্যন্ত বিভূতি তা বুঝতে পারে না। এ সময় দু চারবার কড়া নেড়ে দরজা খোলার আহ্বান জানিয়ে সে নিজের কাজে চলে যায়। ঘণ্টা খানেক বাদে একই অবস্থা দেখে বিভূতির

Dhaka University Institutional Repository

রাগ হয়। অমলা বেড়াতে যাবে না শুনে বিভূতির রাগ বাড়ে। এ অবস্থায় অমলার কান্না শুনে সে বিরক্ত হয়ে অমলাকে কাঁদতে বলে চলে যায়। কিন্তু বেড়াতে গিয়েও বিভূতির ভালো লাগে না। বিভূতির মনোলোক পড়ে থাকে অমলার সুস্থ হওয়ার দিকে। তাই সে ভাবে—

> "বেড়াইতে অবশ্য তাহার ভালো লাগে না। বাড়ির অদূরে একটা পাথরের উপর বসিয়া মেয়ে জাতটার এই অবুঝ অভিমানের কথাই সে ভাবে। এত রাগারাগি করিবার মতো কী কথা সে বলিয়াছে, আর যদি একটা রূঢ় কথা বাহির হইয়াই গিয়া থাকে, তাহার জন্য কি সন্ধ্যাটা মাটি করিতে হয় এমন করিয়া ? আর কটা দিনই বা আছে। এখানের প্রত্যেকটি দিন যে তাহাকে কী মূল্যে কিনিতে হইয়াছে সে ভালো করিয়াই জানে। এই কটি দিনের উপর সে ভরসা করিয়া আছে। অমলার জ্বর সারানো চাই-ই তাহার ভিতর। এই মূল্যবান দিনের একটি নষ্ট হইয়া গেল ভাবিয়া দুঃখের আর সীমা থাকে না। কে জানে কতটা উপকার এই দিনটিতেই হইতে পারিত। হয়তো কাল আর জ্বর আসিত না!" (২খ, ১১৩পৃ)

এসব কথা ভেবে বিভূতি অন্ধকার হতে বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে আসে। অমলা ঘর হতে বের না হলেও রান্না করতে ভোলেনি, এতে বিভূতির রাগ পড়ে ক্ষোভ জন্ম নেয়। কাছে গিয়ে অত্যন্ত স্নেহের সুরে অমলাকে সে জানায় যে সে ভারী অবুঝ। বিভূতির এ কথায় অমলা রেগে যায়।

বিভূতি অবশ্য এরপরও পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খরচের কথা অমলা বলাতে বিভূতি ফিরে যায় পূর্বাবস্থায়। এ অবস্থায় বিভূতি অসহায়তা ও সঙ্কটকে ধরাগলায় তুলে ধরে এভাবে—

> "বিয়ে হওয়া ইস্তক তো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে ! মরবে তো জানি, তা সোজাসুজি আগে থাকতে মরলে তো আর আমায় এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।" (২খ, ১১৪পৃ)

বিভূতির এ কথায় অমলা দুর্বিষহ জীবনকে বাঁচিয়ে না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্ধকারে দরজা খুলে অমলা বেরিয়ে যায় আর ফিরে না। অমলার জন্য অপেক্ষা করতে করতে একসময় বিভূতি হ্যারিকেন নিয়ে খুঁজতে যায়। অন্ধকার রাতে ব্যাকুল-কাতর কণ্ঠে বিভূতি ডাকতে থাকে অমলাকে। ঐ রাতেই সড়ক দুর্ঘটনায় বিভূতি মারা যায় করুণভাবে। এরপর থেকে বিভূতির যত রাগ ঐ মোটরের উপর। তাই সে মোটর দেখলেই যাত্রীদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করে। এ লক্ষ্য অর্জনে বিভূতি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে গভীর রাতে অরণ্যে ঘুরে বেড়ায়। তেমনি এক ঘটনার শিকার গল্পকথক ও তার বন্ধুরা। অবশ্য অলৌকিকভাবে গল্পকথক ও তার বন্ধুরা বেঁচে যায় সেদিন। *নিশাচর* গল্পের বিভূতি তৎকালীন পুঁজিবাদী সমাজের নির্মম শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তার জীবনে বিষাদ নেমে আসে। অর্থনৈতিক সংকট না থাকলে অমলা ও বিভূতির জীবনে যে করুণ পরিণতি আসে তা হয়তো

Dhaka University Institutional Repository

ঘটত না। কেননা অমলার প্রতি বিভূতি যথেষ্ট সংবেদনশীল। অমলা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর বিভূতি তাকে খুঁজতে বের হয়। এ কাজ করতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার সে প্রাণ হারায়। সংবেদনশীল মন থাকলেও অভাব ও স্ত্রীর রোগ তার জীবনে চরম সংকট সৃষ্টি করেছিল। অমলার প্রতি তার আচরণকে পৈশাচিক হিসেবে দেখা যায় না। তৎকালীন সমাজ ও অমোঘ নিয়তি তাদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আর এই পরিস্থিতিরই নির্মম শিকার বাংলার দুটি সহজ সরল মানুষ। অর্থনৈতিক ও মানসিক বিবেচনায় বিভূতি নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। আমাদের সমাজে শুধু অর্থসংকটের কারণে অনেক সুন্দর সংসারও এভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। পরিণতি ভোগ করতে হয় বিভূতিভূষণের মতো। বর্তমানেও যে এমন পরিস্থিতি নেই তা নয়।

পোনাঘাট পেরিয়ে গল্পের নায়ক বলাই ভবঘুরে বেকার যুবক। ভদ্রঘরেই তার জন্ম। বংশে বামুন। ছাত্র হিসেবেও ভালো ছিল। কিন্তু বেশি পড়া-লেখা করতে পারে নি। আত্মমূল্যায়নে স্ত্রী চপলার কাছে নিজেকে এভাবে তুলে ধরে—

> "তোমার বাবাই তো সব মাটি করলে, ছেলেবেলায় পড়াশুনায় ভালো ছিলাম। সবাই বলতো জলপানি পাব, তা অতদূর আর দেখবার ফুরসৎ হয়নি;....." (১খ, ৯৫পৃ)

বেকার জামাই বলাইকে হালদার কোম্পানির সরকার এক প্রকার কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু বলাইয়ের স্বভাবই আলাদা। কাজে তার মনোসংযোগ নেই। একজনের চালান সে আর একজনের নামে লিখে পাঠিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে সংকট তৈরী হলে খোদ কর্তাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করে—

> "কাল থেকে তাহলে আর আসতে হবে না?" (১খ, ৯১পৃ)

একথা বলার পর সে আবার জানায়—

> "আজ্ঞে, কোনদিন যদি দরকার বোধ করেন ডাক দিলেই আমি আসব, জানেন তো ঐ গুলিখোরের ঘাট।"(১খ, ৯১পৃ)

এই কথা বলে খুব স্বাভাবিকভাবে সে চলে যায়। যেনো কোনো ঘটনাই ঘটে নি। সামান্যতম দুঃচিন্তা করে নি কাজ চলে যাওয়ার পরও। এরপর সে আর চাকরির চেষ্টা করে না। এ থেকে বুঝা যায় বলাই উদাসীন প্রকৃতির। তবে সে অসচেতন নয়। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে সে তুলে ধরেছে। গল্পের শ্রমজীবী মানুষ মেহেরারু, ওসমান, জিয়ুৎ-এর সঙ্গে তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে তার মন্তব্য থেকে এ সত্য অনুধাবন করা যায়। ইট সুরকির মন্দা বাজারকে সে দেখেছে যুদ্ধের ফল হিসেবে। কেননা এদেশের মানুষের সব টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। ফলে শহরবাসীর কাছে টাকা না থাকায় তারা বাড়ি বানাতে

Dhaka University Institutional Repository

পারছে না। ব্রিটিশ সরকারের চালু করা এক টাকার নোটকে সে কাগজ হিসেবে দেখেছে। এ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন—

> "খালি কাগজ! ঐ কাগজ দিয়ে ভুলিয়ে সব টাকা বিলেতে চালান করে দিচ্ছে, তা জানিস ?" (১খ, ৯২পৃ)

সে সময়ের বাজার সম্পর্কে তার এ মূল্যায়ন একজন সচেতন নাগরিকের। রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য উপস্থাপন করলেও মূলত তার স্বভাব হালকা প্রকৃতির। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতায় তার এ স্বভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। লেখক গল্পের এ অংশের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> "একটু চুন।' তারপর একটু থেমে বলে, 'সঙ্গে না হয় একটু কালিও দিও।"(১খ, ৯১পৃ)

অন্যত্র সে বলেছে—

> "মাইরি, রাত্রে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এখন দড়িও পাব না কলসিও না। রাতটুকুর মত একটু সরে শুতে দাও।"(১খ,৯৪পৃ)

স্বামীর এ অবস্থায় চপলার অনুযোগ থাকলেও ছিল অসীম দরদবোধ। স্বামী মর্যাদার সঙ্গে বাস করুক এটা সে চায়। তাই বামুন হয়ে কৈবর্ত্যের কাছে মার খাওয়াটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। চপলার দরদবোধের প্রমাণ পাওয়া যায় বলাই নিখোঁজ হলে। বৃহস্পতিবারে একটা শাখা ভেঙে গেলে মায়ের বকার জবাব সে দিয়েছে এভাবে—

> "ভেঙেছিই তো, কপাল তো পুড়েইছে! আমার হাড়ও জুড়িয়েছে, তোমারাও নিশ্চিন্তি হয়েছ। এক মাস ধরে একটা মানুষের কি আর অমনি খবর মেলে না। আছে কোন আঘাটায় আটকে এতক্ষণ দেখগে যাও। আর দেখবারই বা কার দায় পড়েছে ! তোমাদের কাছে শ্যাল কুকুর বইতো নয় !"(১খ, ৯৪পৃ)

বলাই কুড়েমি স্বভাব ও নেশা করে সংকট তৈরীর জন্য শাশুড়ি ও শ্বশুরের অবজ্ঞার পাত্র ছিল। তারপরও শ্বশুর একটু সহানুভূতিশীল বলেই মনে হয়। কেননা তিনি বলাইকে হালদার কোম্পানিতে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। খোঁড়াবাবুর কাছ থেকে চুরির দায়ে আটকাবস্থায় মুক্ত করেছেন।

ছন্নছাড়া প্রকৃতির বলাইয়ের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এদের প্রতি বলাই বেশ সহানুভূতিশীল। তার চরিত্রে উজ্জ্বলতর দিক হচ্ছে মানুষের নৈতিক অধপতনে সায় না দেয়া। সেকারণে ছোটকাল থেকে দেখে আসা ছুটকির নৈতিকস্খলনকে মেনে নিতে পারে নি। এরই প্রতিবাদে সে খোঁড়াবাবুর খড়ের নতুন গোলা রাতের আঁধারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে প্রতিশোধ নেয়। কেননা ওসমান তাকে জানায়—

Dhaka University Institutional Repository

"খোঁড়াবাবু তাকে মাসোহারা দেয় ত্রিশ টাকা— তার বাপকে দেয় দশ। তাছাড়া নগদ কত দিয়েছে কে জানে !"(১খ, ৯৫পৃ)

বলাইয়ের এই প্রতিবাদী উত্তরণ তাকে সমাজ সচেতন বিপ্লবীর মর্যাদা দেয়। এখানে বলাই চরিত্রের মৌলিকতা। কেননা এমন প্রতিবাদ সব মানুষ করতে পারে না। বলাই পেরেছে। বলাই আগাগড়াই একজন ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সে কোনো অবস্থাতে তার মাথা গরম করে নি। খোঁড়াবাবুর কাছে মৌতাতের আসর থেকে বেপরোয়া ঘাড়ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে যেতে হলেও সে উত্তেজিত হয় নি। ওসমান পরে এসে যখন বলে—

"এইবার হাতে হাঁটতে হবে, ঠেঙের বায়না দিতে বলে আসি খোঁড়াবাবুকে। "'(১খ, ৯৪পৃ)

ওসমানের এ কথায় বলাই হেসে জবাব দেয়—

"তা হলে এতদিন ধরে ছাই নেশা করেছিস। রক্ত যদি গরমই হল তবে আর মানুষের বার হলি কোথায় ? "'(১খ, ৯৪পৃ)

মানুষের স্বাভাবিক আচরণ বলাই জয় করতে চেয়েছে। সে তা করতে সক্ষমও হয়। সে খোঁড়াবাবুর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। গোলায় আগুন দেয়ার পর মাতাল অবস্থায় ওসমানকে সে বলে—

"দেখলি সেলাম ? নেশাখোর মানুষ—আমাদের রাগ করতে নেই, তবে আমাদের সেলাম এমনি!"(১খ, ৯৬পৃ)

অখিল সংক্রান্তি গল্পের নায়ক। বেকার অবস্থায় তাকে কলকাতায় দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হয়, এমনকি দু'মাসের মেসের টাকা বাকি। এ অবস্থায় মেসের সবার কাছে সে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে ওঠে। বুড়ো রুমমেট পর্যন্ত তাকে দেখতে পারেন না। এই বুড়োর সঙ্গে ছোট-খাট কাজ নিয়ে প্রায়ই তার ঝগড়া বাধে। অখিলের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বুড়ো এমন কথা বলতেও ছারেন নি—

"জ্বর তো আপনার রোজই হয়, কিন্তু ভাতের থালায় কারুর চেয়ে কম উৎসাহ কোনো দিন তো দেখলুম না! তাও যদি দু-দুমাসের টাকাটা বাকী না থাকত।– আচ্ছা বেহায়া লোক যাহোক!"(১খ, ৫৫ পৃ)

তবে এই অপবাদ নেহায়েত সত্য হওয়ায় অখিলের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ায় অখিলকে প্রতিকূল পরিবেশ বাধ্য হয়ে সয়ে যেতে হয়। সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। অবশ্য তার মতো অর্থনৈতিক সংকটে থেকে সুখ ভোগের আশাও করা যায় না। তাই তাকে এসব নীরবে সহ্য করতে হয়। যেমন কম্বলের তলা থেকে অখিলকে শুনতে হয়—

Dhaka University Institutional Repository

> "নিচে মেসের ঝি তার নিত্য নিয়মিত কলহ বাধিয়েছে ঠাকুরের সঙ্গে। পাশের 'সীটে'র প্রৌঢ় খিটখিটে ভদ্রলোক তাঁর হাঁপানির একঘেয়ে একটানা কাশিতে কান ঝালাপালা করে তুলছেন। তারি ফাঁকে ফাঁকে, পাশের ঘরের ছাত্রের জ্যামিতি মুখস্ত করার শব্দ, মেসের পেছনে ছাই গাদায় একপাল কাকের কোলাহল ও নিচে ক্রুদ্ধা ঝি বাসন কোসনের উপর গায়ের ঝাল ছাড়ায় তাদের করুণ ধাতব আর্তনাদ এসে পৌছোচ্ছিল।" (১খ, ৫৫ পৃ)

ঠাকুরের সঙ্গে ছাই ফেলে দেয়া নিয়ে অখিল যেভাবে ঝগড়া করে তাতে তাকে আত্মসচেতন মানুষ হিসেবে দেখা যায় না। অর্থনৈতিক সংকটও সবসময় ঝগড়ার মধ্যে থাকার কারণ হতে পারে। এমনকি অর্ধেক পোড়া বিড়ির জন্য অখিল বুড়োর সঙ্গে যে আচরণ করে তাও স্বাভাবিক নয়। লেখক অবশ্য একে জেদের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখিয়েছেন। এ জেদ প্রকাশ করতে গিয়ে তাকে মেসের সবার কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হতে হয়।

অবশ্য পারিবারিক সংকট ও দারিদ্র্য তাকে যেভাবে অক্টোপাসের মতো আকড়ে ধরেছে তাতে এমন আচরণ করাকে অস্বাভাবিক হিসেবে দেখা যায় না।
অর্থনৈতিক সংকট তার এতো প্রবল যে সাত দিনের কথা বলে বন্ধুর কাছে কুড়ি টাকা হাওলাত নিয়ে সে দেড় বছরে পরিশোধ করতে পারে নি। এজন্যে বন্ধুর কাছে বারবার অপমানিত হতে হয়েছে। বন্ধুকে চলতে হয়েছে এড়িয়ে। নেহায়েত দেখা হলে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। এরপর বন্ধুর কাছে এক টাকা চাইতে গিয়ে তাকে এমন কথা শুনতে হয়েছে—

> "তোমার কি একটু লজ্জা হল না অখিল ? ছ্যা ঃ—" (১খ, ৫৯পৃ)

তবুও বন্ধুর পায়ে ধরে তাকে সেদিন এক টাকা নিতে হয়েছে। শুধু বন্ধুর কাছে নয় পাড়ার দর্জির কাছেও তাকে অপমানিত হতে হয়। দীর্ঘদিনেও সে বুড়ো দর্জিকে পাঞ্জাবি বানিয়ে নেয়ার টাকা পরিশোধ করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে অখিলের যে মানসিকতা তা তাকে ব্যক্তিত্বহীন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে।

অন্যদিকে নেমে আসে পারিবারিক বিপর্যয়। সে সংবাদ পায় ভগ্নিপতি মারা গেছে, বোন লীলা অসুস্থ। দেশ থেকে মা চিঠিতে লিখেছেন—

> "তোমার ভগ্নীপতি মারা গেছেন, লীলার ভয়ানক অসুখ, চলে এসো।"
> (১খ, ৫৮ পৃ)

এ অবস্থায় অখিল নতুন বিপদ ডেকে আনে। সে ছাদে উঠে পাশের নতুন বাড়িতে একটি মেয়েকে দেখে। তার চাহনিতে সে মুগ্ধ হয়। মেয়েটিকে দেখে সে নবজীবনের আস্বাদ লাভ করে। অন্যদের চেয়ে তার প্রতি এই মেয়েটির দৃষ্টি ছিল ভিন্ন রকম। মেয়েটির দৃষ্টিতে অবজ্ঞার লেশমাত্র ছায়া নেই। এ অবস্থায় মেয়েটি ভেতরে চলে যায়। তার প্রচণ্ড ইচ্ছে করে

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েটিকে আরেকবার দেখার। উৎকণ্ঠা ও আনন্দে অখিল গান শুরু করে দেয়। মেয়েটিকে ঘিরে তার আনন্দানুভূতি সে এভাবে লেখে—

> "আজ একটি ছোট্ট মেয়ের চাউনি পেয়েছি। আমায় অনেক দুঃখ দিলে দেবতা, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক বঞ্চনার বেদনা; কিন্তু এইটুকুর জন্যে আজ তোমায় প্রণাম করছি। একটি কিশোরীর সকৌতুক চাহনি-তার ভিতর বিপল কোনো ইঙ্গিত নেই, কোনো আশাতীত আশ্বাস নেই, তবু এই চাহনিটুকুর জন্যে তোমায় প্রণাম দেবতা ! কত চাইনিই এ জীবনে দেখলুম-ঘৃণার বিষে ক্রুর, অবজ্ঞার আঘাতে কঠিন, লালসার উগ্রতায় ফেনিল, আর আজ জীবনের মরুপথে এই একটি স্নিগ্ধ অসংকোচ নিষ্পাপ চাহনি। তুমি সংসারে বীভৎস ব্যাধি দিয়েছ, মানুষের হৃদয়ে নির্মমতা দিয়েছ, পৃথিবী জোড়া হাহাকার দিয়েছ, কিন্তু কিশোরীর চোখে এই অসীম রহস্যও দিয়েছ, আর আমায় সে রহস্যের আনন্দ উপলব্ধি করবার ক্ষমতা দিয়েছ— তোমায় বারবার নমস্কার দেবতা!"(১খ, ৫৭ পৃ)

আজন্ম দুঃখী অখিলের এই সুখানুভূতি স্থায়ী হয় না। গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে জীবনের করুণ ট্রাজেডিরও সূচনা করে। কারণ ঐ বাড়ির মহিলা অখিলের এ আচরণে ক্ষিপ্ত হয়। মহিলা হাক-ডাক দিয়ে পরিবেশকে লজ্জাজনক করে তোলে। এ অবস্থায় মেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া অখিলের উপায় থাকে না। সে ভাবে এ কেলেঙ্কারির পর থেকে আর মেসে থাকা হবে না। এরপরে সার্বিক পরিস্থিতির বিষময় চেহারা তার কাছে ফুটে উঠে। সে এই অবস্থাকে দেখছে এভাবে—

> "কাল আবার চলতে ফিরতে পাওনাদারদের তাগাদা আরম্ভ হবে। মাথা রাখবার ঠাঁই খোঁজবার চেষ্টায় হায়রান হয়ে ফিরতে হবে ! আর যদিও না মেস থেকে তাড়িয়ে দেয় মেসের লোকের টিটকারি, গালিগালাজ, ঐ হাঁপানি রোগীর দাঁতখিচুনি শুনতে হবে দিনের পর দিন। এই যে ছেঁড়া চটিটার ভেতরে একটা পেরেক উঠে পা ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে এইটেই পায় দিয়ে চাকরির সন্ধানে ফিরতে হবে, সভয়ে পাওনাদারদের চোখ এড়িয়ে। মার কাতর চিঠি আসবে বারে বারে। সদ্য বিধবা বোনের মিনতি আসবে।"(১খ,৫৮-৫৯ পৃ)

অখিলের সামনের যে জীবন তাকে সে ভয় পায়। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সহজেই সে নিজের জীবনকে সাজাতে পারে না। সে হয়তো চায় মধ্যবিত্তের জীবনকে বেছে নিতে। এ অবস্থায় টিকে থাকতে সে কারো সহায়তা বা সে অনুযায়ী কাজ পায় না। এটি তার জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। কিন্তু মন তার ছুঁয়ে আছে মধ্যবিত্তের জীবন। তাই সে সাধারণের পর্যায়ে নেমে কোনো কাজ বেছে নিতে পারে নি। সে পারতো মায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গায়ে ফিরে

Dhaka University Institutional Repository

যেতে। সেখানে আপাতত কোনো কাজ বেছে নিতে পারতো। তাছাড়া দীর্ঘদিন কলকাতায় থেকে কোনো কাজ জুটিয়ে নিতে না পারাটা তার ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার জন্য তৎকালীন পরিবেশ হয়তো অনেকটা দায়ী। তবে একথা বলা যায়, লেখক অখিলের দুঃখবোধ জাগিয়ে তুললেও তার কাঙ্ক্ষিত কাজ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। এটি অখিল চরিত্রের একটি অস্পষ্ট দিক।

রোমান্টিক স্বভাবের ভীরু অখিলকে জীবনের পরাজয়ই মেনে নিতে হয়। সে বন্ধুর কাছ থেকে নেয়া টাকায় আফিম কিনে মৃত্যুর স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করে। আফিম খেয়ে সে মৃত্যুর আগে একবার মার চিঠি পড়ে নিতে চায়। মার চিঠিতে সে জানতে পারে তার বোন লীলা মারা গেছে। প্রাক্তন প্রণয়ীনির একটা চিঠিও সে পায়। তাতে প্রণয়ীনি লিখেছে তার স্বামীর অসুস্থ অবস্থায় তাকে ও তার সন্তানকে সহায়তা করার জন্য। প্রিয়ার এই আহ্বানে সে নতুন করে বাঁচতে চায়। তার চারপাশের মানুষ এক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করে নি। বুড়ো রুমমেটও না। এমনকি সূর্যবাবুও কোনো সহায়তা করে নি। সূর্যবাবু সকালের কেলেঙ্কারির কথা তুলে তার আফিম খাওয়ার কথাকে ন্যাকামি হিসেবে দেখেছে। এ অবস্থায় সে নিজে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ডাক্তারের বাড়িতে সে পৌছাতেও সক্ষম হয়। কিন্তু দরজায় আঘাত দেবার সামর্থ্যও ক্ষীণ হয় আসছিল। এ অবস্থায় হাতের মুঠোয় ছিল তার ছবির চিঠি।

পুন্নাম গল্পের ললিত স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। মানসিকভাবে সে বেশ পরিপক্ব। সে সমাজসচেতন একজন মানুষও। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে সে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। তাকে সামান্য পড়াশুনা করেই কাজে প্রবেশ করতে হয়। তার এই ত্যাগ জীবনের শুরুতেই তাকে সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে।

এক পর্যায়ে নৈতিকস্খলন ঘটলেও সে সংবেদনশীল মনকে পরাজিত করতে পারে নি। অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে সচেতন থাকলেও সে জীবনমুখি ভাবনার পরিচয় দিয়েছে। জীবনের দাবিকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। বিয়ের পর সংসারের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। তার অবস্থায় তা পালন করা বেশ কষ্টসাধ্য এটাও সে জানে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সে বিয়ে করবে না বলেই ঠিক করেছিল। বিয়ে ও জীবন সম্পর্কে তার ভাবনা ছিল এমন—

> "বিয়ে তো সে করবে নাই ঠিক করেছিল। আর সেজন্য কারুর কোন চাড় ছিল বলেও বোধ হয় না। বাংলা দেশের পুরুষ সাধারণতঃ যে বয়সে বিয়ে করে তা পেরিয়ে যাবার পরও তার সংকল্প অটুট ছিল, কিন্তু টলেনি এমন কথা বলা যায় না। মনে মনে যেন একটা বিপুল অতৃপ্তি দিন রাত তাকে পীড়া দিয়েছে। বিয়ে,— পরিপূর্ণ জীবন, নারীর সাহচর্য, একটি একান্ত নিজস্ব সংসার রচনার আনন্দ, অস্পষ্টভাবে এই সমস্তর জন্য ক্ষুধা তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে। চির কৌমার্য্যের গৌরবে মন তার কোনদিন উল্লসিত হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেনি,

Dhaka University Institutional Repository

> কেবলি অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে— এই একক জীবন ব্যর্থ, পঙ্গু। দারিদ্র্যের কথা সে ভাবেনি এমন নয়, কিন্তু মন তার বারবার বিদ্রোহ করে বলেছে মানুষের দেওয়া দারিদ্র্যের জন্য জীবনকে নিষ্ফল করে রাখবার কোন অধিকার তার নেই।"(১খ, ৬ পৃ)

বিয়ের পরে সংসার জীবনে তার টানাপড়েনের পরিচয় জানা না গেলেও তাদের সংসার জীবনে সংকট শুরু হয় ৪ বছরের রোগাক্রান্ত শিশুকে নিয়ে। চার বছরের খোকার সমস্যা নিয়ে গল্প শুরু হয়েছে।

কান্না ও একঘেয়েমি বায়না তার স্বভাবজাত। এই শিশুর এক ঘেয়েমি কান্না ও বায়নায় তাদের জীবনের সুখ বাধাগ্রস্ত হয়। ললিত আর তার স্ত্রী বিচক্ষণা ছবি রোগাক্রান্ত এই শিশুকে নিয়ে বিপদে পড়ে। লেখক চার বছরের এই শিশুকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "কাশি সর্দি সারে তো খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে– তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে তো চলেইছে।
> প্যাকাটির মত সরু চারটে হাত পা নড়বড় করে, ফ্যাকাসে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি জুল জুল করে—সে চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো। শিশুর চোখ সে নয়— জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্ত মুখে কোন বৃদ্ধ যেন সে চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।" (১খ, ৫ পৃ)

এহেন খোকার বায়নায় ললিতের স্ত্রী ছবি অনেক সময় নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। চরমভাবে বিরক্ত হয়ে উঠে খোকার প্রতি। বিশেষত ললিতের ঘুমে সমস্যা করলে ছবি চরমভাবে বিরক্ত হয়। সে মেরে বসে খোকাকে কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও অতি স্বাভাবিক আচরণ করে ললিত। খোকার আচরণ সম্পর্কে তার বক্তব্য—

> "অসুখে ভুগে ভুগেই না অমন খিটখিটে হয়েছে" ।(১খ, ৬ পৃ)

ললিত স্ত্রীর প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। খোকার বায়না ও চিৎকারে ক্লান্ত স্ত্রীর প্রতি সে তাকাতে পারে না। এ অবস্থায় সে শিশুকে চেঞ্জে নিয়ে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে। কিন্তু টাকা সংগ্রহ সে করতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে একদিন নিজে থেকে ডাক্তার খোকাকে দেখতে আসে। এসময় স্নিগ্ধ অনুযোগের সুরে ডাক্তার তাদের বলে—

> "আপনারা এখনো চেঞ্জে নিয়ে যাননি ! নাঃ, আপনারা ছেলেটাকে বাঁচতে দিলেন না দেখছি।"(১খ, ৮পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

অসহায় ও সুহৃদহীন ললিত সামান্য সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে যায়। নিজে থেকে ডাক্তার তার খোকাকে দেখতে আসায় সে পুলকিত হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্ত্রীকে এ কথা বলার মধ্য দিয়ে—

> "কিন্তু ডাক্তার আমাদের একটু ভালোবাসে, দেখেছ ছবি? ঠিক ব্যবসাদারী আমাদের সঙ্গে করে না। না ?"(১খ, ৮পৃ)

সহানুভূতিতে ললিত যেমন বিগলিত হয়ে তেমনি আঘাতে হয়ে ওঠে পাথরের মতো কঠিন। ডাক্তার যখন বলে—

> "দেখুন, এমন করে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্য এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত— ঠিক বলুন জেল হওয়া উচিত নয় ?"(১খ, ৬ পৃ)

ডাক্তারের এমন কথার আঘাতে ললিত কঠিন পাথরের মতো হয়ে যায়।

এরপর ললিত লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করে খোকাকে চেঞ্জে নিয়ে যায়। চেঞ্জে গিয়ে খোকা সুস্থ হয়ে ওঠে।

সুন্দর ও সরলতার প্রতি ললিতের আকর্ষণ ছিল প্রবল। এটি ধরা পড়ে খোকাকে চেঞ্জে নিয়ে গিয়ে সেখানে সহজ সরল সুন্দর ও মেধাবী টুনুর প্রতি তার প্রবল আকর্ষণের মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে টুনুর সঙ্গে খোকার চরম স্বার্থপর আচরণের কারণে ললিত চরম লজ্জা পায় ও অনুশোচনায় ভোগে।

টুনুর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবলতর। একারণে টুনুর মৃত্যুতে সে অস্বাভাবিক হয়ে যায়। আর এ সময় সে প্রকাশ করে কিছু কঠিন সত্য। যা মানুষের জীবনে সংগোপনে হলেও বিরাজ করছে। এ সম্পর্কে তার মন্তব্য—

> "আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মত আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে। নইলে আমাদের এত চেষ্টা এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি !" (১খ, ১২ পৃ)

এরপর সে স্ত্রীর কাছে স্বীকার না করে থাকতে পারে না কিভাবে চেঞ্জে আসার টাকা সে সংগ্রহ করেছে।

টাকা চুরি করে খোকাকে চেঞ্জে নিয়ে আসার বিষয়টিকে সে সায় দিতে পারে না। সে জানে তার এই চুরি ধরা পড়বে না। কিন্তু তা তার মনকে চিরদিন দহন করে যাবে। ছবি চুরির কথায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে সে বলেছে—

Dhaka University Institutional Repository

" কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা! এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না ! চিরকাল ধরে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।"(১খ, ১৩পৃ)

ললিতের এই যে আত্মদ্বন্দ্ব তা তাকে স্বার্থপর মানুষের কাঠগড়া থেকে মুক্তি না দিলেও একেবারে বিবেগহীন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে না। বলা যায়, কঠিন দায় মেটাবার জন্যেই সে এ অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং তা শুধু একবারের জন্যেই। এই রোগ তার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে নেশায় পরিণত হয় না। তাই বলা যায় ললিত সুস্থ জীবন যাপনই করতে চেয়েছে। ক্রোধ হিংসা ও অনৈতিক কাজে তার কোনো সায় নেই।

সাধারণ মানুষের করুণ পরিণতির একটি চরম রূপ প্রতিফলিত হয়েছে শুধু কেরাণী গল্পের মার্চেন্ট অফিসের কেরানীর মধ্য দিয়ে। মার্চেন্ট অফিসের এই কেরানী সাদাসিধে ছেলে মাত্র। তার বিয়ে হয় তেমনি একটি মেয়ের সঙ্গে। তার দাম্পত্য জীবন ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে তার সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সে স্ত্রীর মান-অভিমানকে জটিল করে দেখে নি। স্বাভাবিকভাবে তার সমস্যা বুঝাবার চেষ্টা করেছে। ছেলেটি বন্ধু বৎসলও। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছুটির দিনে দুএকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আনার মধ্য দিয়ে। ছুটির অবসর দরিদ্র কেরানী তার স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ আলাপে কাটিয়ে দেয়। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

"সেদিন বিছানায় আলস্যে হেলান দিয়ে গল্প করবার দুপুর। জ্ঞানাভিমানহীন কেরাণী আর কেরাণী প্রিয়ার সাধারণ আলাপ। জটিল তর্কের দুরূহ সমস্যার গোলক ধাঁধায় তারা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয় না, সহজেই সে সব মীমাংসা করে ফেলে।" (১খ,১-২পৃ)

অর্থনৈতিকভাবে হীন অবস্থায় থাকলেও ছেলেটি সৌন্দর্য প্রিয়। অফিস থেকে হেটে এসে ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে স্ত্রীর জন্য ফুলের মালা কিনে সৌন্দর্য প্রিয়তার পরিচয় দেয়।

ছেলেটি তার সামর্থ্যের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি যত্নবানও বটে। স্ত্রীর অসুখ হলে সে রাঁধতে বারণ করে দেয়। কেননা রাঁধলে আগুনের তাপে জ্বর বেড়ে যেতে পারে। স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে সে এমন দিব্যিও দিয়ে বসে—

"যে আজ রাঁধবে সে আমার মরা মুখ দেখবে।"(১খ, ২পৃ)

এই দিব্যিতে স্ত্রী অভিমান করলে তা ভাঙ্গানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা সে চালায়। কিন্তু একটি সন্ত ান জন্মের পর স্ত্রী সুতিকারোগে আক্রান্ত হলে তার যথার্থ চিকিৎসা সে করতে পারে না। তবে স্ত্রীর অসুখে সে চরমভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। স্ত্রীকে সুস্থ করে তোলার উদ্যোগ নেয়। বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়ার তার সামর্থ্য না থাকায় হেটে এসে ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে সে স্ত্রীর ওষুধ যোগানোর চেষ্টা করেছে। সে স্ত্রীকে ছলনা করে বৃথা আশ্বাস দেয় সেরে উঠার। এই মিথ্যা ছলনার জন্য সে কষ্টও পায়, এজন্য লুকিয়ে কাঁদেও। স্ত্রীর চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করতে

Dhaka University Institutional Repository

না পারলেও তার সুচিকিৎসার ইচ্ছা ছিল। ছেলেটির এ ভাবনার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যাবে—

> "কোনো সময় হয়ত একবারটিও মনে হয় যদি সে এমন গরীব না হত, আরো ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে দেখত।" (১খ, ৪পৃ)

তবে তা ভাবনাতে সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তবে তার কোনো প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। তার এ কথা থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে সে স্ত্রীর যথার্থ চিকিৎসা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা তাকে আদর্শ স্বামীর মর্যাদা থেকে স্থানচ্যুত করে। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তার প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো অর্থ পাবার চেষ্টা করেছে বলেও কোনো তথ্য জানা যায় না। অথচ তার অফিস অর্থনৈতিকভাবে বেশ শক্তিশালীই ছিল। কেননা এই ছেলেটিই বছরের পর বছর ধরে বড় বড় বাঁধান খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আমদানি, রফতানির হিসাব লেখে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ করার জন্য সে স্ত্রীর যথার্থ সহায়তাও পেয়েছে। মেয়েটি অসুখের সময়ও স্বামীর অফিসের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। এ অবস্থায় ঐ অফিস থেকে কোনো সহায়তা না পাওয়া চরম অমানবিক আচরণ। যা সব পাঠকের চোখে বড় হয়ে দেখা দেয়। তবে পুঁজিবাদী এসব প্রতিষ্ঠান থেকে এমন আচরণ পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা তারা শুধু মানুষকে শোষণ করে নিজের অর্থভাণ্ডার স্ফিত করতে চায়। এমন প্রতিষ্ঠান থেকে অনৈতিক উপায়ে সে অর্থ সংগ্রহ করতে পারতো। যেমনটি করেছিল *পুন্নাম* গল্পের নায়ক ললিত। এ পথে এই দরিদ্র সহজ-সরল কেরানী অগ্রসর হয় নি। এমন অবস্থায় নৈতিকতা হারানোকে অস্বাভাবিক বলা যায় না।

স্ত্রীর চিকিৎসায় ব্যর্থ হলেও নৈতিকতা ও কর্মস্থলে দায়িত্বশীল আচরণ তার চরিত্রে বিশেষ উজ্জ্বলতা দান করে। স্ত্রীর চিকিৎসায় যেখানে তার অর্থের প্রয়োজন সেখানে সে অর্থ আয়ে উদ্যোগী হতে পারতো। কিন্তু তা সে পারে নি তার মানসিক দুর্বলতার কারণে। অনেক সময়ই এই দুর্বলতা সংসার জীবনে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যেমনটি হয়েছিল ঐ দরিদ্র কেরানীর জীবনে।

এ দরিদ্র কেরানীর জীবনের দুঃখময় চিত্র অঙ্কন করেছেন কোন্ প্রেক্ষিতে পরে তিনি সে সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

> "আমার প্রথম ছাপানো গল্প এই মেস-বাড়িটির এই ঘরটিতেই এক নিশুতি রাত্রে লেখা। পরিবেশ ও আবহাওয়া ভূতের গল্পের পক্ষে অনুকূল হলেও গল্পটি তা বলে ভুতুড়ে নয়। সে গল্পের নামও ছিল 'শুধু কেরানী'।.... শনিবার রাত্রে মেস একেবারে ফাঁকাই হয়ে যায়।
> আমার যিনি রুম-মেট ছিলেন, তিনিও সেদিন বাড়ি গেছেন। ঘরে আমি একা। ---হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এল। জানলা দিয়ে ঘরে বৃষ্টির ছাট আসছে দেখে, জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি একটা চার ভাঁজ করা পোস্টকার্ড জানলার পাল্লা খোলা রাখবার জন্যে কোণে আটকান

Dhaka University Institutional Repository

আছে। জানলাটা বন্ধ করে নেহাৎ অলস কৌতূহল ভরেই ভাঁজ করা পোস্টকার্ডটা খুলে একবার দেখলাম....।

পুরানো মাস দু'এক আগেকার চিঠি। গোপনীয় বা অসাধারণ কোন কিছুই তার মধ্যে নেই। সাধারণ গরীব বাড়ির খবরাখবর, তারই সঙ্গে দু'একটা ফাই ফরমাজ।..... চিঠির একটি লাইন কিন্তু আমার মনে কেমন দাগ দিয়ে গেল। পিসিমা লিখেছেন— 'বউমার আজো জ্বর এসেছে। দেখতে দেখতে তো দুমাস হয়ে গেল। ঘুষঘুষে জ্বর ত কিছুতেই যাচ্ছে না। কলকাতায় নিয়ে ভালো কোন ডাক্তারকে একবার দেখালে হয় না?'

ঠিকানার লেখা নামটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চিঠিটা কাকে লেখা জানিনা।....

বাইরে ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত আমার মেসের ঘর থেকে একটি নিরুত্তর সকরুণ প্রশ্ন আমায় অনেক দূরে আর একটি দরিদ্র গ্রাম্য সংসারে তখন নিয়ে গেছে।

অনেক প্রেমের গল্পই এ পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে হিলিওট্রোপ রঙের শাড়ি পড়ে রডোড্রেনড্রন গাছের তলায় যারা অনুরাগের রঙীন খেলা খেলে, তাদের কথা যেন আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। মনে হল রাঙা মাটির পাহাড়ী দেশে বিবাগী হয়ে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় বসে যারা বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের বেদনা নেহাৎ জোলো।

কিছু যাদের নেই,— যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোন গল্প কি হতে পারে না? হোক্ বা না হোক্ তাদের কথাই লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লিখলাম শুধু এক কোরানীর গল্প।"[১]

শুধু *কেরানী* গল্প সম্পর্কে দীনেশরঞ্জন দাশ বলেছেন—

"শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প শুধু কেরাণী। একটি কেরাণী যুবক ও তাহার স্ত্রীকে নিয়া এই গল্প। এই দুইটি মানুষের প্রেম ও স্পৃহার মধ্যে কোনও আবিলতা নাই।.... কালক্রমে স্ত্রীকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও স্বামী তাহার নিবিড় প্রেমকে ঘটা করিয়া হাহুতাশ করিতে দেয় নাই। স্ত্রীও স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে যে কতখানি কষ্ট পাইতেছিল তাহা তাহার একটি কথায় শেষ দিকে বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।"[২]

সত্যমিথ্যা গল্পের নায়ক অপূর্ব। পেশায় সে পকেটমার ও মাদক বিক্রেতা। নিজেও সে মাদক সেবন করতে অভ্যস্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে অপূব অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র।

naka University Institutional Reposito

891 44309

ISP 891 443009

KIS.

~~891.44 30~~

RAB

Dhaka University Institutional Repository

সে পকেট মারতে যেমন পটু তেমনি তার মানুষের মন জয় করার সহজ ক্ষমতাও ছিল। সে মিথ্যে কথা বলতে বেশ পারঙ্গম। এসব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও গল্পের আর একটি মূল চরিত্রের সহায়তা সে লাভ করে।

গল্পকথক চায়ের দোকানে অপূর্বকে আবিষ্কার করে আশ্চর্য হন। অপূর্ব চা খেয়ে অবলীলায় তার টাকা কি হল তা জানতে চায় দোকানদারের কাছে। তার পকেটের টাকা হারিয়ে যাওয়া যেনো দোকানদারের দোষেই হয়েছে। অথচ তার পকেটে কোনো টাকাই ছিল না। অপূর্বের কথায় দোকানদারও রেগে যায়। এখানে দোকানদারের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে অপূর্ব তা ছিল এক প্রকার কৌশল। কারণ তার উদ্দেশ্যই ছিল দোকানদারকে রাগিয়ে তোলা। যেনো দোকানদার বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে বিরূপ আচরণ করে। দোকানদার তা করেছেও। তাই বলা যায় এটি অপূর্বের পরীক্ষিত কৌশল। সে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কাজে লাগায়। সে অপমানিত হওয়ার কথা তুলে গল্পকারের কাছে দু আনা পয়সা চেয়ে বসে। দু আনা পয়সা পেয়ে সে গল্পকারের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র তৈরী করে। এটিই তার লক্ষ্য ছিল। অসাধারণ অমানবিক ব্যবহারের আবরণে এই কৌশলী শ্রেণিটি মানুষের মন জয় করে। যেমনটি করতে সক্ষম হয় অপূর্ব।

এই শ্রেণির মানুষের ব্যবহারে কোনো খুঁত আপাত দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। তারা যে কোনো মানুষের মন পড়তে পারে যেমনটি পেরেছিল অপূর্ব। এই অপূর্ব সম্পর্কে গল্পকারের মূল্যায়ন—

> "দোষ ত্রুটি অবশ্য তার যথেষ্ট ছিল। সন্ধ্যাবেলা হয়তো বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘর আমার অসাক্ষাতে খুলে আমার ভালো ভালো পোশাকগুলি বেছে পরে সে বেরিয়ে গেছে। পরের দিন কিন্তু কিছু বলবার অবসর সে দিত না। নিজে থেকে সহস্রবার ক্ষমা চেয়ে আমায় অবশেষে লজ্জিতই করে তুলতো।" (১খ,৮৪-৮৫পৃ)

অন্যত্র আর একটি মূল্যায়ন—

> "সেদিন সত্যি ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলুম এবিষয়ে তাকে শাসন করে দিতেই হবে। কিন্তু লোকটা যেন অন্তর্যামী।"(১খ, ৮৫পৃ)

অপূর্ব অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে ওস্তাদ। সে গল্পকারের মেসের বিনয়বাবুসহ সবার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে। অবশ্য তা নিয়েছে সবার মন জয় করেই। এই যাদুতে সে মেসের ঠাকুরের কাছ থেকে পর্যন্ত পাঁচ টাকা হাতিয়ে নেয়।

অপূর্ব গল্প বানাতেও সুপটু। সে গোয়েন্দাগিরির চাকরি করে বলে গল্পকথককে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে। গল্পকথকের চুরি হওয়া মানিব্যাগ ফেরৎ দেয়ার মাধ্যমে সে এই গল্প মেরে বসে। গোয়েন্দাগিরির চাকরি সম্পর্কে তার মন্তব্য—

Dhaka University Institutional Repository

> "ঝকমারির কাজ ভাই এই গোয়েন্দাগিরি। এক এক সময়ে মনে হয় ছেড়ে দিই, কি নিষ্ঠুরতা যে করতে হয় এক এক সময়!" (১খ, ৮৫পৃ)

এমনকি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গল্পকারের কাছে এসে সারাদিন সে তার এই সাত বছরের মেয়ে ডলুর কথাই বলেছে। আর গল্পকথক অপূর্বর এ গুণের কারণে টাকা দিয়েছেন একের পর এক। শেষ বারের মতো অপূর্বর চাওয়া পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন গল্পকথক। বিনয়বাবু বদমায়েশ অপূর্বকে টাকা দিয়ে ঠকেছেন বললেও তার মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয় নি। কেননা তিনি তাদের চেয়েও অপূর্ব সম্পর্কে সত্য খবর জানেন।

রবীন্দ্রনাথের *কাবুলিওয়ালা* গল্পের কাবুলিওয়ালার মেয়ে যে বিয়ের উপযোগী হয়েছে তা বুঝতে পারে নি। ঠিক তেমনি অপূর্বও বুঝতে পারে না অপূর্বর সাত বছরের মেয়ে দশ বছর বাদে আজ সতের বছরের যুবতীতে পরিণত হয়েছে।কাবুলিওয়ালার মধ্যে সন্তানের জন্য রয়েছে অপরিসীম মায়া-মমতা। মিনির বাবার কথায় এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেনর

> "তখন সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম— তখন বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বত— গুহাবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্ত চিহ্ন আমারই মিনিকে স্বরণ করিয়া দিল।"[৩]

অপূর্বর অন্তরে আজ সাত বছরের সে ডলুই জাগরুক। এই গুণের কারণে বিনয়বাবুর কাছে অপূর্বকে গল্পকথক এভাবে তুলে ধরেছেন—

> "আমি আপনার চেয়ে আরেকটু বেশি খোঁজ নিয়েছি, বিনয়বাবু! দশ বছর ধরে ওর স্ত্রী কন্যা নেই জানি, কিন্তু এই দশ বছর ধরে সমস্ত অন্যায় অপরাধ জুয়াচুরির ভেতর ও সেই সাত বছরের মেয়েকে খোঁজবার জন্যে সমস্ত জায়গা তোলপাড় করে বেড়িয়েছে, যেখানে কোনো ছোট অসহায় মেয়ে দেখেছে সেখানে উন্মত্ত হয়ে তাকে আদর করেছে। অসম্ভব প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলেছে, এমনি কি ওর সেই সাত বছরের মেয়ে বেঁচে থাকলে আজ যে সতেরো বছরের হয়েছে সে খেয়াল পর্যন্ত ওর নেই, এই পাগলামিটুকুর কথা বোধ হয় আপনি জানেন না। ওর সমস্ত কথা হয়তো মিথ্যে ওর মনের সে সাতবছরের মেয়ের জন্যে ব্যাকুলতা মিথ্যে নয়।"(১খ,৮৮-৮৯পৃ)

কাবুলিওয়ালা খুনি হওয়া সত্ত্বেও যেমন পাঠকের সহানুভূতি লাভ করে তেমনি শঠ প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও অপূর্ব পাঠকের করুণা আকর্ষণ করে সন্তান বাৎসল্যের কারণে। আর তাই-ই অপূর্বকে ব্যতিক্রমি শঠ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে।

অপূর্ব তার শঠতা গল্পকথকের কাছে শেষবার প্রকাশ করেছে এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "তোমার কাছে আগাগোড়া মিথ্যে বলে এসেছি। প্রথম দিন মিথ্যে অভিনয় করে তোমার কাছে চায়ের পয়সা আদায় করেছি, তোমার ব্যাগ চুরি করে গোয়েন্দাগিরির গল্প করেছি, সুতরাং আজ যদি আমার কথায় তুমি অবিশ্বাস কর তাহলে তোমার দোষ দেওয়া যায় না।..." (১খ, ৮৭পৃ)

সময় ও যান্ত্রিকতার শিকার লাল তারিখ গল্পের নায়ক যুগল। সে রেলওয়ের সামান্য কর্মচারী। সময় ও যান্ত্রিকতার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারার দায় তাকে চরমভাবে মোকাবেলা করতে হয়। বলা যায় যান্ত্রিকতার শিকার যুগল। এই যান্ত্রিকতাকে যুগল মেনে নেয় যদিও তার বিরুদ্ধে সে চরম বিরক্তি প্রকাশ করে। তবে একবার শুধু ভাবা ছাড়া যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তকে লড়াই করতে দেখা যায় না। যান্ত্রিকতা সম্পর্কে লেখক তার অভিমত প্রকাশ করেছেন অরণ্য স্বপ্ন গল্পে। এই গল্পে লেখক যান্ত্রিকতা সম্পর্কে বলেছেন—

> "এই তার নিয়তি, এই বুঝি এ শতাব্দীর নিয়তি। জীবনের বদলে কয়েকটা অভ্যাসের দাস্ত্ব, খানিকটা অর্থহীন যান্ত্রিকতা।" (১খ,১২৮পৃ)

এর থেকেও চরম যান্ত্রিকতার শিকার হতে হয় লাল তারিখ গল্পের নায়ক যুগলকে। এমন যান্ত্রিকতার শিকার হয়েছিল সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ীর বাবা ঈশানও। সেও মেয়ের বিয়ের জন্য কাঙ্ক্ষিত দিনে ছুটি পায় নি। ঈশানের এ অবস্থা সম্পর্কে গল্পের একটি অংশ এমন—

> "কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া, সে-পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু অপূর্বর মা কহিল,"এই মাসে দিন ভালো আছে,আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"
> উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত-হৃদয় ঈশান আর-কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমত মাল ওজন করিতে লাগিল।"[৪]

বিয়ের দু'বছরের মাথায় যুগল চাকরিতে যোগ দেয়। চাকরিতে যোগ দেবার পর ছুটি না পাওয়ায় শুরু হয় তার জীবনের জটিলতা। কেননা চাকরিসূত্রে সে বিদেশে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। বেশ কবার ছুটিতে বাড়ি আসবে বলে সে স্ত্রী যূথিকাকে চিঠিতে জানায়। কিন্তু ছুটি না পাওয়ায় তার বাড়ি ফেরা হয় না। বার বার এমনটি হওয়ায় যুগল সম্পর্কে যূথিকা ভিন্ন কথা ভাবতে বাধ্য হয়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় যূথিকার এমন মনোভাব থেকে—

> "এবারে যুগল যদি না আসে তা হলে পরে এসে আর যূথিকাকে দেখবার আশা যেন না করে। সে অবশ্য জানে যে, যুগলের তাতে আজকাল কিছুই আসে যায় না। নইলে এক বছরে সে কি সত্যি আর

Dhaka University Institutional Repository

> ছুটি নিতে পারত না ? ছুটি নেই— ছুটি নেই, ওসব বাজে কথা। কোন অফিসে আবার ছুটি থাকে না! অফিসের সাহেবদের কি নিজেদের বাড়ী ঘর বৌ ছেলে নেই যে, বাড়ী যাব বললে তারা ছুটি দেয় না! আসল কথা যুগল আর আসতে চায় না।"(১খ, ১২০পৃ)

স্ত্রীর চিঠি পাওয়ার পর যুগলের মনে যে কষ্ট হয় নি তা নয়। যুগল এ অবস্থাকে দেখেছে এভাবে—

> "যুগল সে চিঠি পড়ে একটু হেসেছিল। তার পর সারারাত ঘুমোতে পারে নি। যূথিকাকে পরে গিয়ে সে দেখতে পাবে না, সত্যি এ ভাবনায় তার ঘুম হয় নি এমন নয়। কিন্তু মন তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যূথিকা সেখানে কেমন কষ্টে আছে তাতো সে নিজেই পারে বুঝতে। এতদিনে তার একবারও ছুটি না পাওয়া যে সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। ভাগ্যের যেন অহেতুক আক্রোশ আছে তার ওপর।"(১খ, ১২০পৃ)

যূথিকার ভাবনায় যখন দাম্পত্য সম্পর্কের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তখন যুগলের অবস্থা ছিল আরো সংকটময়। সে দেখে সহকর্মি অবিনাশবাবুর সুখী দাম্পত্য জীবন। অথচ যুগলের এমনটি করার সামর্থ্য থাকলেও সে তা পারছে না। এর থেকে কোনো মানুষের জীবনে আর কি জটিলতা বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় যুগল ভাবে প্রথমবার আসার সময়ই সঙ্গে করে যূথিকাকে নিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু সে সময় যুগল ভাবতে পারে নি ছুটি পাবে না।

যুগলকে মেনে নেয়ার মানুষ বলেই মনে হয়। অর্থাৎ যুগল আপসকামি। যে কারণে ছুটি বাতিল হলে কষ্ট পাওয়া ছাড়া কোনো প্রতিক্রিয়া সে ব্যক্ত করতে পারে না। এ সময় বার বার ছুটি না পাওয়ায় একবার সে ভাবে যে সিক লিভের কথা লিখে সে চলে যাবে। কিন্তু তা সে পারে না। এরপর কর্তৃপক্ষের আদেশ সে নির্দিধায় পালন করেছে। এ অবস্থায়ও সে চাকরি ছাড়ার সাহস দেখাতে পারে না। প্রয়োজনীয় সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা যুগলের জীবনে চরম ব্যর্থতা।

যুগল শুধু আপসকামিই নয় বেশ একটু সহজ সরলও। সে কারণে হেড সিগন্যালারের সামান্য সহানুভূতিতে সে গলে যায়। তার মনে হয় হেড সিগন্যালার মশাই তাকে একটু বুঝি স্নেহ করেন।

এই দীর্ঘ সময়েও একবারের জন্য বাড়িতে যেতে না পারা যুগলের একটি বড় ব্যর্থতা। যা তার পূর্ব স্বভাবের ঘোর বিরোধী। কেননা সংসারের প্রতি তার আসক্তি নেই এমন নয়। বরং তাদের মধ্যে আসক্তি একটু বেশিই। এ পাড়ায় ও পাড়ায় ছিল তাদের দুজনের বাড়ি। এ সামান্য ব্যবধানের ছাড়াছাড়িকে তারা মানতে পারে নি। চাকরিকালেও সে নানান পরিকল্পনা করেছে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার ।

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা সে সবসময়ই লালন করেছে। তাই ছুটি পাওয়ায় নাইট ডিউটি করার পরপরই রওনা দিয়েছে। বাড়িতে ফিরে কল্পনার সঙ্গে মিল সে পায় না। বৃষ্টিতে ভিজে সে অসুস্থ হয়। স্ত্রীর অসুস্থতার খবর পায় পিসিমার কাছে। তবে এটা জেনেও যুগলের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় না সেভাবের

> "না, মন দমবার কি আছে ! সে জানে কালকেই না হয় পরশু সব ঠিক হয়ে যাবে– আবার সব ভালো লাগবে যেমনটি সে ভেবেছে।"(১খ, ১২৬পৃ)

যুগলের সর্বশেষ এ ভাবনার মধ্যে সে প্রমাণ করেছে সত্যিকার অর্থে সে আপোষকামি একজন মানুষ। আর পাঠক তাকে দেখে ভাগ্যাহত একজন মানুষ হিসেবে।

আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উদ্যোগের চরম অভাব লক্ষ করা যায় না তার মধ্যে। নাইট ডিউটির পর রওনা দিয়ে সে একবার চরম উদ্যোগী হওয়ায় দৃষ্টান্ত দেখায়। একারণে পীড়ন থাকা সত্ত্বেও যুগলের প্রতি মানুষের সহানুভূতি তেমনভাবে জাগ্রত হয় না। বলা যায় একমুখি স্বভাবের নিম্ন আয়ের চাকরিজীবী যুগল। যুগলের একমুখিতার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পের এ অংশ থেকে—

> "বাধ্য হয়ে তাকে চাকরির জন্যে বিদেশে আসতে হয়েছে। কিন্তু বিদেশ তার ভালো লাগে না। যে ছোট শহরটিতে সে আছে তার চারিধারে নীল পাহাড়। তার পাশ দিয়ে পরিচ্ছন্ন একটি বালুনদী বয়ে যায়। কিন্তু এসব সৌন্দর্য যুগলের ভালো লাগে না। কেমন যেন শুকনো মনে হয়, কেমন রুক্ষ। শুধু যে যূথিকার অভাবেই ভালো লাগে না তা নয়, তার কারণ আলাদাও আছে। তার মন সব দিক দিয়েই একনিষ্ঠ। তার মন আগেই বাঁধা পড়ে গেছে। বাঁধা পড়ে গেছে সেই ছোট একটুখানি গ্রামের প্রেমে। সেই গ্রামটিতে থাকতে পেলেই সে সব চেয়ে খুশি হত। কেন সে খুশি হত, তা সে অবশ্য বুঝিয়ে বলতে পারবে না জিজ্ঞাসা করলে। বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা তার নেই। শুধু সে জানে, সে গ্রামের কথা ভাবতেই তার ভালো লাগে। পিয়ালী নদীর ওপর দিয়ে হয়ত ভাঁটায় হেঁটেই পার হওয়া যায়।"(১খ, ১২৩পৃ)

নিশাচর গল্পে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ অমলা। তার স্বামী বিভূতিভূষণ সামান্য বেতনে চাকরি করে। এক কথায় বলা যায় নিম্ন মধ্যবিত্তের টানাটানির সংসার। যেখানে কোনো সাধ মেটানোর জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়তো দূরের কথা কখনো অতি প্রয়োজনও পূরণযোগ্য নয়। তেমনি অমলার সংসারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য। এ পরিস্থিতিতে অমলার অসুখ তাদের দাম্পত্য জীবনকে বিষময় করে তোলে।

বিভূতির জীবনে অমলা সঙ্কট হয়ে উঠেছে এ সত্য যেদিন বিভূতি প্রকাশ করে সেদিনই অমলা আত্মহত্যা করে। বিভূতি সেদিন কথা প্রসঙ্গে ধরা গলায় বলেছিল—

Dhaka University Institutional Repository

> "বিয়ে হওয়া ইস্তক তো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে ! মরবে তো জানি, তা সোজাসুজি আগে থাকতে মরলে তো আর আমায় এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।" (২খ, ১১৪ পৃ)

অসুস্থতা দূর করতে বিভূতি স্ত্রীকে চেঞ্জে নিয়ে যায়। নতুন জায়গায় এসে গ্রামের সহজ-সরল পল্লীবালা প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়। অমলার মুগ্ধ হওয়ার কারণ অন্তর্নিহিত রয়েছে তার সীমাবদ্ধ সুযোগের সঙ্গে। কেননা গ্রামের চার দেয়ালের পল্লীবালা হওয়ায় বিশাল মোহময় পৃথিবী ছিল তার কাছে অতি সঙ্কীর্ণ। লেখক তার এই অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "কাজ করিতে করিতে দিনে অন্তত একশবার সে খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাকে। স্বামীকে অন্তত একশতবার দিনে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সেই এক কথাই বলে, 'ভারি সুন্দর দেশ, না গো?"(২খ,১১২পৃ)

প্রকৃতির সুন্দর রূপে যখন অমলা মুগ্ধ তখন বিভূতিকে জড়িয়ে ধরে দারিদ্র্যের করাল গ্রাস। বিভূতি অর্থচিন্তায় অমলার মতো প্রকৃতির সৌন্দর্যে ডুব দিতে পারে না। বিভূতির মনে এমনটি হবার যথেষ্ট কারণও অবশ্য আছে। লেখক তার অসহায়তাকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "বিভূতিভূষণের অত উৎসাহ নাই। সে শুধু সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া সায় দেয়। পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখিয়া তারিফ করিবার তাহার সময় নাই। তাহাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয়। এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তাও আধা মাহিনায়। ছুটি ফুরাইলে আরেকটা দরখাস্ত করিতে হইবে; কিন্তু মনিবেরা আর তাহা গ্রাহ্য করিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অমলা এক মাসে কিই বা সারিবে। দিন-কুড়ি হইয়া গেল, তবু নিয়মিত জ্বর তো এখনো আসিতেছে। এখানকার লোকেরা বলে অন্তত তিন মাস না থাকিলে নাকি এখানকার জল ভালো করিয়া গায়েই বসে না। কিন্তু তিন মাস ছুটি যদি বা মিলে খরচ কুলাইবে কেমন করিয়া ? সাহস করিয়া ভগবান ভরসা করিয়া সে রুগ্‌ণ স্ত্রীকে লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে, কিন্তু সাহসেরও একটা সীমা আছে। চেঞ্জের জায়গা হিসাবে বাড়িটির ভাড়া অত্যন্ত অল্পই বটে, কিন্তু সেই অল্পই যে তাহার কাছে দুর্বহ বোঝা।"(২খ,১১২ পৃ)

অমলা সুস্থ না হয়ে উঠায় এই পরিস্থিতিতে বিভূতি চিন্তিত হয়ে পড়ে। এসময় অমলা এলাকার সৌন্দর্য সম্পর্কে তার অনুভূতি জানাতে চায়। জবাবে বিভূতি জানায়—

> "তোমার ও একঘেয়ে এ সুন্দর তা সুন্দর শুনতে আর ভালো লাগে না বাপু ! সুন্দর দেখে তো আর পেট ভরবে না।"(২খ, ১১২ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর এমন মন্তব্যে উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে অমলা লজ্জিত হয়। অমলা সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হলেও একেবারে অবিবেচক বা বুদ্ধিহীন নয়। সে নির্মল আনন্দে মেতে উঠেছে এটাই এক্ষেত্রে সংকট তৈরী করেছে।

এক্ষেত্রে অমলার মূল্যায়ন ছিল এমন—

> "স্বামীর ভাবনা যে কী তাহা সে জানে না, এমন নয়, কিন্তু স্বামী নিজেই তাহাকে বারবার সকল ভাবনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছে। চেঞ্জে আসার কথায় খরচের কথা ভাবিয়া সে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু স্বামী নানাভাবে বুঝাইয়া তাহার সে আপত্তি দূর করিয়াছে।"(পৃ:১১২,দ্বি:খণ্ড)

সামান্য অভিমান থেকে সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে। অভিমানে সেদিন সন্ধ্যায় অমলা বের হয় নি। অন্যদিকে বিভূতি ভাবে আজকের দিনটিতেই হয়তো অমলা ভালো হয় উঠতো। একটি দিন হারানোয় বিভূতির আফসোসের শেষ থাকে না। অমলা ও বিভূতি একে অপরের সমস্যা বুঝে না তা নয়। তাদের ভালোবাসাতেও ফাটল ধরে নি। মান-অভিমানের শিকার অমলা। ঐ একটি দিনের ভুলে অমলাকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়। এখানে অমলাকে আবেগপ্রবণ হিসেবেই দেখতে হবে। কেননা তার একগুয়েমির কারণেই বিভূতির সমঝোতার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অমলা যদি বিভূতির মন জয়ের চেষ্টায় সাড়া দিতো তাহলে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেত তারা। তবে বিভূতি অসহিষ্ণু না হলেও পারতো। সেই সঙ্গে বিভূতির এমন মন্তব্য অমলাকে এতদিনের লালিত ভয়কে জয় করতে সাহস জুগিয়েছিল। বিভূতি যাকে ভরসা করে অমলাকে ফিরাতে যায় নি। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণেই মূলত ব্যর্থ হয় দুটি জীবন।

চুরি গল্পের একটি নারী চরিত্র উমা। উমা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বাবা সামান্য বেতনভুক জরাজীর্ণ স্কুলের শিক্ষক। ফলে অভাব নিত্যদিন জড়িয়ে থাকে তাদের সংসারে। এমনি পরিবেশে বেড়ে উঠে উমা।

উমার বয়স গল্পে সঠিকভাবে জানা না গেলেও সে যে বড় হয়েছে এটা অনুধাবন করা যায় তার মায়ের এ বক্তব্য থেকে। হেমলতা স্বামীকে বলেন—

> "উমা যে বড়ো হয়েছে সে খেয়াল আছে?" (২খ, ১৮৫ পৃ)

তবে উমা বড় হয়ে উঠলেও তার মানসলোক গঠনের পূর্ব পরিচয় পাওয়া যায় না। এমনকি তার শিক্ষা সম্পর্কে গল্পে কোনো আলোচনা নেই। প্যারিমোহনবাবুকে অপর ২ সন্তান দেবু ও নেপুর পড়া নিয়েও সিরিয়াস হতে দেখা যায় না। ছাত্রদের প্রতি তার যে নিষ্ঠা তা থেকে সন্তানরা বঞ্চিত হয়েছে। বাবার অর্থনৈতিক অবস্থাই এর প্রধান কারণ। বাবার এই উদাসীনতার প্রভাব খুব ভালোভাবে পড়েছে সন্তানদের উপর। উমা তার ব্যতিক্রম নয়। উমার গলা যে ভালো তার পরিচয় পাওয়া যায় পুলিনবাবু যখন হেমলতাকে বলে—

> "উমার যা মিষ্টি গলা, আমি ওকে গান শেখাব মাসিমা।" (২খ, ১৮৫ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়েও উমার আগ্রহ লক্ষযোগ্য নয়। তবে হেমলতার মানসলোকের যে পরিবর্তন ঘটে তেমন পরিবর্তন অনুধাবন করার সুযোগ নেই উমাচরিত্রে। কেননা সে অনুসরণ করেছে মায়ের পরিবর্তিত মানসিকতাকে। উমার মধ্যে ভোগবাদী মানসিকতা বিদ্যমান। নীতি-নৈতিকতার বিচার করার মানসচেতনা তার গড়ে ওঠে নি এবং সে এ নিয়ে ভাবেও নি। তাই চরিত্রহীন পুলিনবাবু সম্পর্কে সে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করে নি। তার জন্মদিনে পুলিনবাবু শাড়ি উপহার দিলে সে তা গ্রহণ করেছে। সে শাড়ি পড়ে বাবার সামনে উপস্থিত হতেও তার কোনো দ্বিধা নেই। এই দ্বিধাহীন উমার জীবনে শেষ পরিণতি কি তা জানা যায় না। কেননা এখানেই থেমে গেছে উমা চরিত্রের বিকাশ। উমার মানসপ্রবণতা বিশ্লেষণ করে বলা যায় উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিহীন বাড়ন্ত মেয়ে যে জীবনমুখি আচরণ করে উমাও তেমন আচরণ করেছে। তবে উমা চরিত্রটি ভিন্নভাবেও বিকশিত হতে পারতো। শিক্ষক পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও সে সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করেছে। অবশ্য এমন পরিবেশে উমার মতো চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তবে একথা বলা যায়, উমা চরিত্রের মধ্যে যদি আত্মপীড়ন বা কোনো জটিলতা থাকতো তাহলে তা তার চরিত্রে ভিন্ন মাত্রা এনে দিত। একারণে বলা যায় উমা চুরি গল্পের একটি অপরিণত ও জটিলতাবিহীন অতি সাধারণ চরিত্র।

দাতা গল্পের নায়িকা বা মূল নারী চরিত্র বীথি। তবে এ গল্পে নারী চরিত্রের ভূমিকা খুব বেশি উজ্জ্বল নয়। বীথি গল্পের প্রধান চরিত্র চিত্রশিল্পী মহিমের স্ত্রী।

মহিম ফ্রান্সে শিল্পকর্ম শিখতে যাওয়ার কথা বলে বীথিকে বিয়ে করে। এভাবে গল্পের অবয়বে বীথি জড়িয়ে যায়। এ গল্পের শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করে বীথি চরিত্রটির কোনো স্বীকয়তা দৃশ্যমান নয়। অবশ্য এই স্বকীয়তা না থাকবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অল্প বয়স, শিক্ষার অভাব, মানসিক অপরিপক্বতা তদুপরি অর্থনৈতিক দুর্বল ভিত্তি ও পরিবারের শক্ত কাঠামোর অনুপস্থিতি। এসব বক্তব্যের স্বপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় মহিমের কলেজ জীবনের বন্ধু ও তার অর্থ সহায়তাকারী অনিমেষের ধারণা থেকে।

অনিমেষের কাছে টাকা নিয়ে ফ্রান্সে যাওয়ার কথা বলে কিছু দিন বাদে বীথিকে বিয়ে করে। মহিমের এ আচরণে অনিমেষ বিরক্তই হয়েছিল। বিরক্ত মহিমের উপর নয় হয়েছিল বীথির উপর।
এ সময় বীথিকে দেখে অনিমেষের মনে হয়েছিল—

> "বীথিকে দেখলে, ভালো করে যার পাখনা গজায়নি, তেমনি ভীরু, অসহায় একটা পাখির ছানার কথাই মনে পড়ে। শ্রী নেই, সৌষ্ঠব নেই, দুর্বল অপরিণত দেহের শঙ্কিত করুণ দুটি চোখে পৃথিবীর সকলের কাছে যেন সব সময় আশ্রয় ভিক্ষা করছে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনবার আর কি মেয়ে পেল না মহিম ! এইরকম একটা স্রোতের শ্যাওলার মতো

Dhaka University Institutional Repository

মেয়ে মহিমের পায়ে জড়িয়ে তার প্রতিভাকে ব্যর্থ করে দেবে কেন?"
(২খ, ২৬৪ পৃ)

না মহিমের প্রতিভা ব্যর্থ করে দেবে বীথি এ ছিল ভুল ধারণা। কেননা বীথির মধ্যে আলাদা সত্তাই নেই। যা সংকট ডেকে আনবে। অনিমেষও পরে অবশ্য এটি বুঝতে পারে। সেকারণে বিরক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত বীথির প্রতি অনিমেষের মনে করুণাই জাগে। এক্ষেত্রে অনিমেষের মূল্যায়ন ছিল এমন—

"বোঝা গেছল যে মেয়েটা আর যাই হোক শৃঙ্খল নয় মহিমের। তার আলাদা কোনো সত্তাই নেই তো শৃঙ্খল হবে কি করে।" (২খ, ২৬৪ পৃ)

বিয়ের পর ছবি নিয়ে কোনো আলোচনা হলে বীথি ছিল তার নীরব শ্রোতা। মহিম ও অনিমেষের আলোচনা শুনতে সে প্রবল আগ্রহী। ছবি সম্পর্কে মহিম কোনো মন্তব্য জানতে চাইলে বীথি কোনো কিছু বলতে পারতো না। তবে মহিমের এমন প্রশ্ন যে বীথির মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না তা কিন্তু নয়। এমন প্রশ্নে বীথি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় লজ্জায় সে মাথা নিচু করে নেয়। তবে এই প্রতিক্রিয়াটুকু ছাড়া বীথির মানসলোকের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। অনিমেষের ওপর মহিমের নির্ভরশীলতায় বীথির কোনো মন্তব্য নেই। তেমনি মন্তব্য নেই মেয়ের জন্ম দিন আয়োজন ও মূল্যবান লকেট উপহার দেয়াতেও। এমনকি অনিমেষের বাড়িতে না ওঠে মহিম সাধারণ একটা আশ্রয় বেছে নেয়াতে তার বিরূপ মনোভাব নেই। এসব ক্ষেত্রে কোনো মন্তব্য, অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া না থাকায় চরিত্রটি হয়ে উঠেছে একেবারে সহজ সরল। নাগরিক জটিলতার কোনো ছাপই তার মধ্যে পাওয়া যায় না। এসব কারণে চরিত্রটি একরৈখিক ও অনুজ্জ্বল।

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় বীথির মধ্য দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র নগর সভ্যতার একটি বিশেষ দিক চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। যা হলো নগরসভ্যতার জটিল জীবনে মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে অসংলগ্ন থেকে জীবন যাপন করা। তখন কলকাতার মতো শহরে এমন নারীচরিত্র বিরল দৃষ্ট নয়। অনেক গ্রাম্য সাধারণ নারীকে স্বামীর অবস্থানের কারণে কলকাতার জীবনকে বেছে নিতে হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মৃন্ময়ী* ছোটগল্পের মৃন্ময়ী চরিত্রটি এর উজ্জ্বল উদাহরণ। মৃন্ময়ী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"…. একটি সামান্য অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকার..."[৫]

এখনো আমাদের শহরজীবনে এমন নারী চরিত্র প্রবেশ করছে না এমন নয়। তবে এখন কিছু কিছু গ্রামে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার কারণে নারীরা জটিল জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে। সে সময় গ্রামে কিন্তু এমন সুযোগ সুবিধা ছিল না। তাই বলা যায়, *দাতা* গল্পে বীথির যে ভূমিকা তা অপ্রাসঙ্গিক ও দৃষ্টিকটু নয়। এটা মনে হয় না বীথির সামাজিক অবস্থানের কারণে।

Dhaka University Institutional Repository

অনিমেষের বর্ণনা ছাড়া বীথির পারিবারিক জীবন কাঠামো সম্পর্কে কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। সেকারণে অনিমেষের মূল্যায়ন ও বীথির ভূমিকার ওপর নির্ভর করেই তার সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে হয়।
বীথিকে বিয়ের পর মহিম মাঝে মাঝে দিনের পর দিন বাড়ি থেকে বেরোয় না। এমনকি স্ত্রীর সঙ্গে ছবি আঁকার পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করে। তবে মহিম বিয়ের বেশ ক বছর পর সবচেয়ে বড় যে সিদ্ধান্তটি নেয় তা হলো আর অনিমেষের সাহায্য না নেয়া। অনিমেষের বাড়িতে তো সে উঠেই নি এমনকি তার পর আর তার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে নি।

শকুন্তলা গল্পের নায়িকা শকুন্তলা। তার জীবনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এ গল্পের কাহিনী। দরিদ্র পরিবারেই সে জন্ম নেয়। তার বাবা কলমের কৃতদাস কেরানী। অষ্টম পুরুষে এই কেরানীগৃহে পরী জন্ম নেয়। তার কেনো ভাই ও বোন নেই। তবে তার মায়ের সাধ ছিল একটি ছেলে ও মেয়ে হলে নাম রাখবে নিখিলেশ আর শকুন্তলা। এই শকুন্তলা জন্ম নেয় এমন এক সময়ে যখন তার মা-বাবা সন্তান হবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।
শকুন্তলা যে পরিবেশে জন্ম নেয় সেখানে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। লেখক সে পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> "তাদের সরু বাঁকা নোংরা গলির মধ্য দিয়ে গৃহহারা বেওয়ারিশ, বংশগৌরবহীন কুকুরের দল সকালে বিকালে আস্তাকুঁড়ে ঝগড়া করে বেড়ায় শুধু। ছাদের কার্ণিশে, ডাস্টবিনের গায়ে সারে সারে কাকেরা বসে কোলাহল করে। ময়ূরের পালকও একটা সে গলির ত্রিসীমানায় নেই।" (১খ,৬৩পৃ)

তবে শকুন্তলা ভাগ্যবতীও বটে। কেননা অন্য কেরানীগৃহের সন্তানদের মতো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে মানুষ হতে হয় না। বাবা-মার একলা সন্তান হওয়ায় ভালোভাবে হেসে-খেলে শকুন্তলার শৈশব কেটে যায়।
সে শকুন্তলা উপাখ্যানের শকুন্তলার মতো আলবালে জলসেচন না করলেও ইটের ভাঙা আলসের ওপর ভর দিয়ে ছাদের অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে। বছর দুই তিনের বেশি তার স্কুল পড়াও হয় না। বাবা তাকে আদর করে বুড়ি ডাকে। তবে তার সম্পর্কে তার মায়ের মনোভাবের কৌতুককর অথচ বাস্তব অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে–

> "মা ডাকে 'খুকি', আর রাগ হলে বলে 'শুকনি'।"(১খ,৬৪পৃ)

নিম্ন মধ্যবিত্ত নারীর যে কাজ তা তাকে বাবার বাড়িতে বিয়ের আগে শিখতে দেখা যায়। এসময় সে যে আচরণ করে তা তার পরিবেশে অতি স্বাভাবিক আচরণ। এই স্বাভাবিক স্বভাবের কারণে শকুন্তলাকে কোনো জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় না। তবে বই পড়ার সামান্য শখ ছাড়া জীবন সম্পর্কে তার ধারণার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তার কিশোরী অবস্থাকে লেখক এভাবে তুলে ধরেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

> "সে এখন সকাল বিকালে মার সঙ্গে রান্নার কাজে যায়, দুপুরে শেলাই এর কলে বসে শেমিজ ব্লাউজ শেলাই করে, কখনও বা মাকে বই পড়ে শোনায়, কখনো অনমনে রান্না ঘরের ছাদের উপর গিয়ে অসীম অনাদি নীলাকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবে সেই জানে। বিকেলে সে সযত্নে চুল বেঁধে আর্শির সামনে বসে একান্ত মনে নিজের মুখখানি দেখে।" (১খ,৬৪পৃ)

খুব স্বাভাবিক নিয়মে শকুন্তলার ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানীর সঙ্গে বিয়ে হয়। তার বিয়ের দিনে যে ঘটনাগুলো ঘটে তাও এই নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্য অস্বাভাবিক নয়। তবে তার বিয়ের রাতে প্রকৃতি অনুকূল ছিল না। সেজন্য বয়যাত্রীদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তার বিয়েতে যেমন অনেক আলো জ্বলেছিল তেমনি অনেক গোলমালও হয়েছিল। এভাবেই সে পরিচিত গলিপথ ছেড়ে স্বামীর সংসারে যায়।

শকুন্তলার জীবনে কোনো বাঁক বা উত্তেজনাও নেই। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। একারণে লেখকের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় যে, সে ভবিষ্যতে দক্ষ কেরানীবধূ হয়ে উঠবে এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সুখে শান্তিতে সংসার করবে।

মানসিক সংকট

মল্লিকা গল্পের নায়ক সুবিকাশ উচ্চ বেতনে মোম্বাইতে কর্মরত। সেখানে অদ্ভুত পোশাক পরিহিত বাঙালি শ্রীপতির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। শ্রীপতিই বাঙালি হিসেবে সুবিকাশকে চিনতে পেরে গর্ববোধ করে। অন্যদিকে চৌপাটির ছত্রিশ জাতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয়ার গর্বও সে কম করে না। এই শ্রীপতিই একদিন জোড় করে সুবিকাশকে বস্তি এলাকার বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য কোনো বাঙালি প্রবেশ করতে না চাইলেও শ্রীপতির সংসার বেশ সাজানো। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে তার বাসার কেনো মিল নেই। এখানেই শ্রীপতির স্ত্রী মল্লিকার সঙ্গে সুবিকাশের পরিচয় হয়। তারপর সে নিয়মিত সেখানে যাতায়াত শুরু করে। মল্লিকার রূপে বিমোহিত সুবিকাশ ভুল করে বসে সব হিসাব-নিকাশ। এর কৈফিয়ৎও অবশ্য সে দিয়েছে। নৈতিকতার দিক থেকে পরিচ্ছন্ন থাকার একটি ক্ষীণধারার প্রয়াস তার মধ্যে লক্ষযোগ্য। সুবিকাশের মানসিকতা সম্পর্কে লেখক জানান–

> "প্রথম দিন আর কিছুই সে বোঝেনি। বোঝেনি বেশ-কিছুদিন পর্যন্ত। বুঝলে আকণ্ঠনিমগ্ন হবার আগে সে হয়তো নিজেকে সাবধান করবার একটু নিষ্ফল চেষ্টাও করত। যত ক্ষীণই হোক, তার সামাজিক বিবেকই তাকে বাধা দিত যথাসাধ্য।"(২খ, ২৩৪ পৃ)

এই না বুঝার অবশ্য একাধিক কারণ বিদ্যমান। কেননা মল্লিকা সিঁদুরও পরে না। কথায়, আচরণে ও সাজ পোশাকেও নয়। শ্রীপতির বয়সও অনেক বেশি। তাই মল্লিকা যে শ্রীপতির স্ত্রী সুবিকাশ তা কল্পনাও করতে পারে নি।

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনা করতে পারলেও যে সুবিকাশের মন বাধা মানতো তা মনে হয় না। এক্ষেত্রে তার আচরণকে মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত করা যায়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীপতি ও মল্লিকার বিয়ের দিনে দেয়া উপহার থেকে। সুবিকাশের দেয়া দুটি উপহার অত্যন্ত দামী। তাছাড়া শ্রীপতিকে টাকা ধার দেয়া থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুবিকাশকে লক্ষ করে শ্রীপতির মন্তব্য ছিল এমন—

> "তোমার তো হাত ঝাড়লে পর্বত! হাজারটা টাকায় তাতে টোলও খাবে না।"(২খ, ২৩৬পৃ)

শুধু বিত্ত নয় মল্লিকার সঙ্গে তার আচরণও তাকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানসিকতায় স্থান করে দিয়েছে। বিয়েবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে শ্রীপতি উপহার পাওয়া ঘড়ি পড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুবিকাশ চেয়েছে মল্লিকার মনের অর্গল ভাঙতে। মল্লিকা আর শ্রীপতির বিয়েটা যে স্বাভাবিক নয় তাও স্পষ্ট করে জানিয়েছে। মল্লিকাও জানিয়েছে সে ভালোবেসেই শ্রীপতিকে বিয়ে করেছে। এরপর আর একদিন মল্লিকা টাকা ধার চাওয়ায় সুবিকাশ অপমানিত বোধ করে। এরপর মল্লিকা জানায় শ্রীপতিকে মুক্তি দেবে বলে তার টাকার প্রয়োজন। এ অবস্থায় সুবিকাশ জানতে চায় মল্লিকা তার কাছে আসবে কি না। মল্লিকা এই শর্তে ঘর ছারতে রাজি হয় সবকিছু ছাড়িয়ে অনেক দূরে যদি নতুন জায়গায় সুবিকাশ তাকে নিয়ে যায়। তারপর ঝড়ের গতিতে আয়োজন সম্পন্ন হয়। তারা চেপে বসে ট্রেনে। এরপর সুবিকাশ ওষুধ আনতে গেলে মল্লিকা সরে পড়ে। তবে হাতব্যাগটা রেখে যায়। মল্লিকা ছোট ফাঁকি সুবিকাশকে দেয় নি বড় ফাঁকিই দিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের অধিকাংশ প্রেমিক পুরুষ যেখানে মানসিকভাবে দুর্বল সেখানে সুবিকাশকে ভিন্নরূপে পাওয়া। সুবিকাশ একনিষ্ঠভাবে পেতে চেয়েছে মল্লিকাকে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার জড়তা তাকে আড়ষ্ট করতে পারে নি। এমনকি অতি উচ্চ বেতনের চাকরি পরিত্যাগ করতেও সে দ্বিধা করে নি।

বৃষ্টি গল্পের নায়ক প্রতুল পেশায় ডাক্তার। কলকাতায় হাসপাতালে কর্মরত। রোগী দেখতে গিয়ে হাসপাতালের সেবিকা লতিকাকে সে ভিন্নভাবে আবিষ্কার করে। প্রতুলের ভালোলাগার আগে লতিকা হাসপাতালের বহু সেবিকার ভিড়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল।

লতিকাকে আবিষ্কার করার পর তার সঙ্গে প্রণয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। হাসপাতালে আসার জন্য সুবিধামতো গাড়ি না পেয়ে প্রতুল ট্যাক্সি ডেকে বসে। কিন্তু তখনো তার মনে দ্বিধা লতিকা এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবে নাতো ? ডাক্তারের তখনকার অবস্থা এভাবে উন্মোচিত হয়—

> "লতিকা ট্যাক্সিতে উঠেছে। বাঁ হাতে শাড়িটিকে একটু সামলে নিয়ে হেলান দিয়ে বসেছে। নিজের সৌভাগ্যে বিশ্বাস করতে না পেরে আমি উঠলাম ঠিক অভিভূতের মতো। তারপর ট্যাক্সির স্টার্ট নেবার ঝাঁকুনি। আচ্ছন্ন ভাব আমার কেটে গেল।"(২খ, ৩০পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

সরাসরি প্রতুল তার মনোভাব লতিকার কাছে প্রথমেই প্রকাশ করতে পারে নি। এটি তার দ্বিধাহীনতা নয় মানসিক দুর্বলতা। মানসিক দুর্বলতার কারণে সে লতিকার প্রতি সুগভীর টান অনুভব করলেও তা প্রকাশ করতে পারে না। তাকে আশ্রয় নিতে হয় নিত্যদিনের সাধারণ আলাপচারিতার। তার মনের রূপ যে ভিন্ন ছিল তা এ অংশ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়—

> "আবার নীরবতা ! ট্যাক্সি হাসপাতালের রাস্তায় এসে পড়েছে! সময় নেই সময় নেই ! এ সুযো'গ আর কখনো মিলবে না। কী করছ প্রতুল? লতিকার দেহের উষ্ণ কোমল স্পর্শও তোমাকে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি? লতিকার চোখে কি ব্যগ্র প্রতীক্ষার আভাস তুমি দেখতে পাওনি? বলো, একটা কিছু বলো; প্রতিদিনের এই তুচ্ছ অর্থহীন আলাপের আবরণ সরে যাক।" (২খ, ৩০পৃ)

প্রতুল যে লতিকার প্রেমে নিমগ্ন হয়েছে এটা সে খুব ভালো করেই বুঝতে পারে। লতিকাকে পাওয়ার জন্য জার্মানিতে যে গ্র্যান্ট পেয়েছে তা সে প্রত্যাখ্যান করে। প্রতুলের গ্র্যান্ট প্রত্যাখ্যানকে লতিকাও মেনে নিতে পারে নি। শুধু তাই নয় লতিকা এ বিষয়ে এরপর প্রতুলের আর কোনো কথাই শুনতে চায় নি। এমনকি তার সঙ্গে দেখা করতে প্রতুলকে নিষেধ করে। গ্র্যান্ট প্রত্যাখ্যান করা সম্পর্কে লতিকার অভিব্যক্তি ছিল এমন—

> "হ্যাঁ কেন জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যা বলবে তাও জানি অবশ্য। বলবে— আমার জন্যে! কিন্তু কেন আমার জন্যে তুমি এতবড়ো ত্যাগ করবে? এ তোমার ত্যাগ তো নয়, আমার ওপর তোমার এ অত্যাচার; সারাজীবন ধরে তুমি এই ভেবে গর্ব করবে যে আমার জন্যে তুমি তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েছ, আমার জন্যে করেছ অসামান্য আত্মত্যাগ। সমস্ত জীবন আমায় তুমি রাখতে চাও অপরাধী করে, তোমার সে আত্মপ্রসাদের দৃষ্টির বিষে আমার জীবন জর্জরিত করতে দেব না, কিছুতেই আমি দেব না তোমায় তা করতে, তোমার এই ত্যাগ আমি চাই না।" (২খ, ৩৮-৩৯ পৃ)

এখানে লতিকা কিন্তু প্রতুলকে প্রত্যাখ্যান করে নি, করেছে তার আত্মত্যাগকে। আর এখানেই প্রতুল ভুল করে বসে। সে পারতো গ্র্যান্ট গ্রহণ করতে। একটু জীবনমুখি হলে প্রতুল এ বিপদ থেকে রক্ষা পেত।

সংযমী আবেগ তাকে দিতে পারতো পূর্ণতা। তার মেধা সম্পর্কে ডা. মৈত্রের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

> "আমি গোড়া থেকেই জানতুম, প্রতুল, তোমার ভেতর অসাধারণ পার্টস্ আছে! তুমি আমাদের হাসপাতালের গৌরব। কিছুদিন বাদে বলব দেশের গৌরব।" (২খ, ৩৬ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা শহরের পেশাজীবী শশাঙ্ক *ভূমিকম্প* গল্পের নায়ক। সে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। এ প্রেক্ষাপটে এমন শ্রেণির মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক। শশাঙ্কের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে এসব ক্ষেত্রে স্বপ্নভঙ্গকে সে মেনেই নিয়েছে। এক্ষেত্রে তার মানসিকতা মধ্যবিত্তের হলেও অস্বাভাবিক নয়। সে স্বপ্নচারী নয়। সেজন্য এসব স্বপ্নভঙ্গ তার মনকে বিষিয়ে তুলতে পারে নি। বরং ঘা খেয়ে খেয়ে সে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। এসব মেনে নিয়েছে একটি আশায় হয়তো সে প্রেমের ক্ষেত্রে অন্তত সফল হবে। এখানে বাস্তবায়িত হবে তার মনের আশা প্রশান্ত হবে তার হৃদয়। এই চাওয়াকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু তার সে স্বপ্নও পূরণ হয় নি। এখানে শশাঙ্কের জীবনের চরম ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতাবোধই তাকে বিষণ্ন করে। এখানে মালতীর সঙ্গে যে মানসিক দূরত্ব রয়েছে তা বাইরে থেকে বুঝার উপায় নেই। মালতী তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। এতে কোনো ত্রুটি লক্ষ করা যায় না।

এক অদ্ভুত সংযম ও দক্ষতায় মালতী এগিয়ে নেয় দাম্পত্য জীবনকে। এখানেই শশাঙ্কের সংকট। এই সংকটের একটি কারণ হিসেবে শশাঙ্কের প্রথম স্ত্রীর কথা বিবেচনায় আনতে হয়। তবে এটিকেও জোরালো কারণ বলা যায় না। কেননা শশাঙ্কের প্রথম স্ত্রীকে মালতী অবমাননা করবে না তার স্বীকৃতিও প্রথম দিনে আদায় করে নেয়। তার প্রথম স্ত্রীর ছবির প্রতি মালতী যত্নও নেয়। সে এ অবস্থার মধ্য দিয়েও মালতীর ভালোবাসা আদায় করতে পারে নি। মালতী সব আয়োজন করে নিখুঁতভাবে কর্তব্যের কারণে, সেখানে আনন্দ পূজার কিছু থাকে না। এই নীরস কর্তব্যবোধই পীড়িত করে শশাঙ্ককে। তাদের মানসিক দূরত্ব অবশ্য ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় স্বাভাবিক হওয়ার সুযোগ এসেছিল। মালতী সে সময় শশাঙ্কের কাছে খুব সহজভাবে ধরা দিয়েছিল। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার শক্তি শশাঙ্ক ও মালতীর হৃদয়ে প্রেমের আলোড়ন তুলেছিল। ভূমিকম্প থেমে যাওয়ায় এই পরিবর্তন পূর্ণতা পায় না। অসহায়ভাব কেটে গেলে মালতী শশাঙ্কের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। আবার সে ফিরে আসে পূর্বাবস্থায়। সেই আত্মস্থ অবিচলিত মালতী। ভূমিকম্প মালতীর মনে প্রতিক্রিয়া না জাগালেও শশাঙ্ককে বিধ্বস্ত করে। আত্মস্থ হওয়ার পর মালতী শশাঙ্কের প্রথম স্ত্রীর ভাঙা ছবি তুলে ধরে জানায়—

"সকালে কাচ বাঁধিয়ে নিয়ে এসো।"(২খ, ৬৮পৃ)

এ গল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় শশাঙ্ক দাম্পত্য জীবনে সুখ আশ্বাদ থেকে বঞ্চিত। তার বঞ্চনার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তার মধ্যবিত্ত সুলভ পরিবর্তনহীন মানসিকতাকে। কেননা শশাঙ্ক তার প্রথম স্ত্রীর স্মৃতি মুছে ফেলে নতুন সংসার শুরু করতে পারে নি। এটাকে একদিকে কোমল মনের সুন্দর গুণ হিসেবে দেখা যায়। তবে তা সংসারের জন্য ক্ষতিকরই। এ ক্ষতি থেকে মুক্ত নয় শশাঙ্কের দাম্পত্যজীবন। স্মৃতি আকরে রাখার মানসিকতাই শশাঙ্ককে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রাপথ গল্পের নায়ক অজয় পাটনায় চাকরি করে। অর্থনৈতিক বিবেচনায় নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেই তার অবস্থান। বিশেষত স্ত্রী মলিনাকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন পাটনায় যাচ্ছিল তার আচরণ থেকে তা স্পষ্ট হয়। ভালোভাবে ট্রেনে খাওয়ার তার বাসনা আছে কিন্তু সামর্থ্য নেই। এই অর্থনৈতিক সংকট অজয়কে অনেকটা স্বার্থপর করে তোলে। তবে অর্থসংকটই এর মূল কারণ নয়। মূল কারণ নিহিত রয়েছে অজয়ের মানসিকতায়। সেকারণে কুলিকে ওয়াদা করেও দু পয়সা কম দিতে চায়। এতে কুলি আপত্তি করবে এটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় অজয় তার মুখকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিকৃত করে। হৈ চৈ সৃষ্টি করে কেলেঙ্কারি বাধায়। তার আরও বিকৃত মনের পরিচয় পাওয়া যায় পানওয়ালাকে ঠকানোর মধ্য দিয়ে। দোকানির কাছে অচল দোআনি চালিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। তার এ আচরণ অপ্রত্যাশিত হলেও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে তা লক্ষ করা যায়। আমাদের সমাজে বাস্তবেও এমন অনেক মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। স্ত্রী মলিনার প্রতিও অজয় সুপ্রসন্ন ছিল তা নয়। বর্ধমান স্টেশনে এক অসতর্ক মুহূর্তে তা প্রকাশ পায়। অজয় তার আশার মিহিদানা সীতাভোগ কেনার জন্য ফেরিওয়ালাকে একটা সিকি দেয়। অজয় দূরে থাকায় মলিনা তা নিতে গেলে হাত ফসকে পড়ে যায়। এতে অজয় রুষ্ট হয় মলিনার ওপর। তার গলার স্বর ও মুখের অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করে। সে ফেরিওয়ালাকে বকাবকি করতেও দ্বিধা করে না। তার এসব আচরণ অবশ্যই সুস্থ মানুষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। এর কারণ হিসেবে গল্প শেষে যা জানতে পারি তা হল, মলিনার মতো সাধারণ একটি মেয়েকে পেয়ে সে দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। সে মলিনাকে বোঝা হিসেবেই দেখেছে। এ জীবন টেনে নেয়াতে তাই তার মনে কোনো উন্মাদনা নেই। বরং এ থেকে জন্ম নিয়েছে বিকৃতি। যা বেশ দৃষ্টিকটু ও অস্বাভাবিক। লেখক বলেছেন, অজয় সত্যিই সুপুরুষ। কিন্তু অজয় বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুপুরুষ হলেও মনের দিকটি তার পঙ্কিল।

এই পঙ্কিলতা এসেছে অজয়ের মধ্যে স্ত্রীকে যেভাবে সে কল্পনা করেছে সেভাবে না পাওয়ার জন্য। রেলের মধ্যে অজয় তন্ময় হয়ে দেখেছে এক সুন্দরী মহিলাকে। মলিনার দৃষ্টিতে তা এড়ায় নি। এ সময় তাই মলিনা তাকে ভুলে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে অভিযোগ করে—

> "আহা মনে নেই যেন। ঝাঁঝাঁয় যারা নেমে গেল গো। তোমার দিকে থেকে-থেকে চাইছিল। নামবার সময়ও পিছু ফিরে তাকাল। তুমিও তো চাইছিলে— আমি যেন দেখিনি।"(২খ, ৮৬ পৃ)

পরক্ষণেই মলিনা আবার বলেছে—

> "বেশ সুন্দরী কিন্তু, তোমার সঙ্গে মানাত। তবে ভারি বেহায়া বাপু।" (২খ, ২৬পৃ)

অমীমাংসিত গল্পের নায়ক প্রকাশ শহুরে চাকরিজীবী। মধ্যবিত্ত এই চাকরিজীবীর জীবনে অর্থনৈতিক সংকট নেই। সংসার জীবনকে সে গ্রহণ করেছে আন্তরিকতার সঙ্গে। এই আন্ত-

Dhaka University Institutional Repository

রিকতা নিহিত রয়েছে তার স্বভাবের মধ্যে। কম গুরুত্ব দিয়ে কোনো কাজ করা তার চরিত্রের মধ্যে নেই। প্রতিটি কাজকে সে সমান গুরুত্ব ও তাতে সমান মনোযোগ দিয়ে করতে চায়। যে কাজ সে করে তাতে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। সমাজ সংসারে এ ধরনের মানুষ আঘাত পায় সবচেয়ে বেশি। তবে তা কাটিয়ে উঠার অসাধারণ অন্তর্নিহিত শক্তিও তাদের মধ্যে বিরাজ করে। একারণে প্রকাশ স্ত্রীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে। স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতার যে চিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র অংকন করেছেন তা গল্পের সমস্ত অবয়ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এ প্রবণতা প্রকাশের জীবনে সৃষ্টি করে নতুন সংকট। আর তা হয় বিবাহ পূর্ব জীবনে প্রেম নিয়ে। প্রকাশ জড়িয়ে পড়েছিল একটি মেয়ের প্রেমে। গল্পে সে প্রেমের বর্ণনা নেই। তবে প্রকাশের ড্রয়ারে ছিল সে প্রণয়ের প্রমাণপত্র। আর তাতে স্পষ্ট হয়েই আছে তার সে প্রেমের স্বরূপ। যা এতদিন ভুলেই ছিল প্রকাশ। একদিন স্ত্রীকে নীল মলাটের নোট বই ফোলিও ব্যাগে রাখতে বলার মধ্য দিয়ে শুরু হয় সংকটের। খাওয়া শেষ করে প্রকাশ গিয়ে দেখে তার আগের চিঠিগুলো ইতস্ততভাবে ছড়ানো। তা দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এমনভাবে দৈব তার বিরুদ্ধে বাদ সাধবে তা তার কল্পনার অতীত। কেননা মানসিক সংকট তৈরির বীজ তাতে রয়েছে। এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

> "কোনো দাগ তো তাহার মনে নাই। সেসব যেন আর-এক জীবন, অন্য কাহারো জীবনের কাহিনী। বইয়ে পড়া কোনো গল্পের মতো সেসব দিন তাহার কাছে অস্পষ্ট সুদূর হইয়া গেছে। একদিন সে যে এমন করিয়া তলাইয়া গিয়াছিল, সে দিনকার আঘাত বেদনা আনন্দ অত সত্য ছিল তাহার জীবনে, তাহা ভাবিতে তাহার বিস্ময় লাগে ! তাহার প্রকৃতিই বুঝি এই, কিন্তু সে কথা কে বুঝিবে ?" (২খ, ১০৯ পৃ)

প্রকাশ তার প্রেমের বিষয়টি কেনো প্রথম পরিচয়ের দিন অপর্ণাকে বলে নি তা নিয়েও তার কোনো অনুশোচনা নেই। প্রকাশ সে ঘটনাকে সামনেও আর আনতে চায় নি। আমাদের বিশ্বাস এটা না করা তার মনোলোকের স্বাভাবিক প্রবণতা। কারণ আমরা জানি প্রকাশ যখন যা করে তা পরম আন্তরিকতা দিয়েই করে। সে জন্যেই যা অতীত হয়ে গেছে তাকেও সে দ্রুত গতিতে ভুলতে চায়। হয়েছিলও তাই। একটি দুর্ঘটনাই আজ তার মনে চঞ্চলতা সৃষ্টি করেছে। তাই সেদিন প্রকাশ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করে অতি দ্রুত অফিসের উদ্দেশে বের হয়। এ ঘটনার পর সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরতেও সে সাহস করে না। এ অবস্থায় প্রকাশ স্ত্রীর মুখোমুখি হতে ভয় পায়। তাই বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটিয়ে দেরি করে বাসায় ফেরে। তবে সে জানে এ পরিস্থিতিতে অপর্ণা এখনো ঘুমায় নি। সারাদিন প্রকাশ ঠিক করেছে কিভাবে এই বিষয়টি মোকাবেলা করবে। ক্ষণে ক্ষণে সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। ঘরে ফিরে অবাক হয়েছে স্ত্রীর স্বাভাবিক আচরণ দেখে। সে দেখায় তার মনে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এমন—

> "প্রকাশ যেন বিমূঢ় হইয়া গেছে। এও কি সম্ভব ? না, এখনো নিজের এরকম সৌভাগ্য বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না যে ! এমনও কি

Dhaka University Institutional Repository

হইতে পারে যে, অপর্ণা ফাইলগুলি ঘাঁটিবার সময় চিঠিগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে নিজে কিছুই পড়ে নাই।" (২খ,১১০পৃ)

সে আরো ভাবে—

"অপর্ণা গভীর আঘাত পাইয়াছে মনে করিয়া তাহার সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিত ও বেদনা- জর্জর হইয়া গেছে, অপর্ণা কোনো আঘাত পায় নাই সন্দেহ করিয়া তাহার সমস্ত জীবন যে বিষাক্ত হইয়া গেল !"(২খ, ১১১পৃ)

না শেষ পর্যন্ত প্রকাশ তার এ সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে নি। বিশ্বাস না হওয়ার পরিণতি মোড় নেয় চরম এক সংকটময় জীবনের শকটে। এমন একটি বিষয় তার মনে রেখাপাত না করায় প্রকাশ ভেবেছে তার স্থান কি অপর্ণার জীবনে এতই সামান্য। তাই প্রকাশ অপর্ণার জীবনের সমস্ত আচরণের নতুন অর্থ দাঁড় করায়। সে ভাবে তার অতি আবেগের কারণে হয়তো এই শূন্যতা আগে বুঝতে পারে নি। এই সন্দেহ মীমাংশার সত্যিই তো কোনো পথ নেই। তাই প্রকাশকে এই অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হতে হবে সারাজীবন। এখানে তার জন্য সংকট হলো তার সিরিয়াসনেস। সে এই বিষয়টি খুব স্বাভাবিকভাবে নিতে পারতো। সে ভাবতে পারতো হয়তো স্ত্রী সত্যিই তা দেখে নি। এমনটি ভাবার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ছিল। এমন চিঠি পাওয়ার পর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে না তা না ভাবাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু প্রকাশ তা অনুধাবন করে নি তার একনিষ্ঠ আচরণের কারণে। এখানেই তার জীবনে চরম ব্যর্থতা ।

স্টোভ গল্পের শশিভূষণ শহরে চাকরি করে। বরাবরই সাহসহীন এক মানুষ। তার সাহসহীনতার পরিচয় পরপর পাওয়া যায়। শশিভূষণ সাহসহীন আচরণের কারণে প্রেমে সফল হতে পারে নি। তার প্রাক্তন প্রণয়িনী মল্লিকার সঙ্গে কলকাতায় এক সঙ্গে কলেজে পড়তো। সে সময় তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় না শশিভূষণের দুর্বলতায়। মল্লিকা বিয়ের বিষয়ে শশিভূষণের মতামত জানতে চাইলে সে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করার কথা জানায়। শশিভূষণের এ আচরণে মল্লিকা স্বাভাবিকভাবে আহত হয়েছে। এরপর মল্লিকা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে চায় নি। এখানেই মল্লিকা ভুল করেছে। কেননা শশিভূষণের মতো মানুষ নিজে থেকে কিছু করতে পারে না এ তার জানা ছিল। তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। শশিভূষণের চরিত্র লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

"উপায় কী ? ঠিক শশিভূষণেরই যোগ্য উত্তর। এই শশিভূষণের সত্যকার চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে বসে আছে। শ্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই। পাঁচ বৎসর আগেও এমনি করেই সে দুর্বলভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন এতটুকু দৃঢ়তা তার মধ্যে থাকলে হয়তো তাদের জীবনের ইতিহাস আর-এক রকম হতে পারত।"(২খ, ১৬০পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

শশিভূষণের সাহসহীনতায় স্ত্রী বাসন্তীকে পেতে হয়েছে মানসিক দুর্ভোগ। কেননা সে স্বামীর কাছে মল্লিকা সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে পারে নি। কিন্তু মৌন হয়ে থাকতে দেখে কষ্ট পেয়েছে। মনে হয়েছে শশিভূষণ তাকে বিয়ে না করলেই পারতো। তার এমনটি মনে হওয়ার যৌক্তিক কারণও রয়েছে। স্বামীর কাছে এ বিষয়ে জানতে না পারলেও বাসর রাতে তাকে মল্লিকার প্রণয়ের কথা শুনতে হয়েছে। প্রতিবেশীরা বুঝিয়ে ছেড়েছে মল্লিকা ও শশিভূষণের সম্পর্ক কি ছিল।

এক্ষেত্রে শশিভূষণ একটু সাহসী হতে পারতো। কিন্তু তা সে পারবে না। কেননা এর উত্তর জড়িয়ে আছে তার মনস্তাত্ত্বিক চেতনায়।

যেমন সে খানিকটা বিকল স্টোভ জ্বালানোর সময় চরম উত্তেজনায় ভুগে। ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে আসে। সে স্টোভ জ্বালাতে স্ত্রীকে বাধা দেয়, বিরত রাখতে চায় মল্লিকাকে স্টোভে পাম্প করা থেকে। কিন্তু সে তা পারে না, কিন্তু সারাক্ষণ আশঙ্কায় থাকে কখন না জানি ফেটে যায় স্টোভটি। শশিভূষণ সব মিলিয়ে ভাবনাহীন মধ্যবিত্তের জীবন কাটাতে চায়। স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যও তাকে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। অতি স্বাভাবিক ও সরলীকৃত এক চরিত্র *স্টোভ* গল্পের শশিভূষণ। সমাজের মানবচরিত্রের নানা দিক উন্মোচনে সহায়তাকারীদের মধ্যে শশিভূষণও একজন হয়ে আছে।

থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ গল্পের নায়ক প্রশান্ত শহুরে মধ্যবিত্ত। সে সংবাদপত্র পড়ে, পৃথিবীর খোঁজ খবরও রাখে। চীন-জাপানের যুদ্ধে চীনের উপর অত্যাচার তাকে ব্যথিত করে। প্রশান্ত অনেকটা আনমনে হলেও জাপানি যুদ্ধবিমানের বোমায় বিধ্বস্ত চীনের নগরের খানিকটা বিবরণও অন্যমনস্কভাবে পড়ে। কিন্তু তার দৃষ্টির বেশির ভাগ নিবিষ্ট থাকে থার্মোফ্লাস্কটির উপর। যে থার্মোফ্লাস্কটি আগে হঠাৎ তুবড়ে গিয়েছিল। এই থার্মোফ্লাস্কের সূত্র ধরে তার মন সবচেয়ে বেশি করে পুড়ে যায়। যে মানসিক সংকটকে প্রশান্ত দূরে রেখেছে সচেতনভাবে তাই আবার জেকে বসে। প্রশান্তর এ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে—

> "শুধু দৃষ্টি নয় তার চিন্তাও ওই থার্মোফ্লাস্ককে কেন্দ্র করে অনেক দূরে ঘুরে এসেছে— সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর। সেইটেই আশ্চর্য! এসব চিন্তাকেই তো সে এতদিন সাবধানে, সযত্নে দূরে ঠেলে রেখেছে। এত প্রবল ভাবাবেগে সে সমস্ত চিন্তা, সে সমস্ত স্মৃতি উদ্বেলিত যে একবার আমল দিলে আর সে থই পাবে না, বাস্তবতার কঠিন আশ্রয়ে বাঁধা স্বাভাবিক সুস্থ বুদ্ধির নোঙরও তার উপড়ে যাবে, একথা সে জানত। তাই সে কপাট বন্ধ করে রেখেছে, মনের সুইচ কেটে দিয়েছে সামান্য একটু বিপদের আভাসে।"(২খ, ১১৯পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

প্রশান্তের বিপদের বলয় গড়ে উঠে স্ত্রী মায়াকে ঘিরে। মায়ার দুটি আচরণকে সে কোনোভাবে মিলাতে পারে না। সাধারণ জিনিসের প্রতি মায়ার রয়েছে অসীম ব্যাকুলতা অন্যদিকে অরুণবাবুর কথা আসলে তার মনে জাগে অপরিসীম ঔদাসীন্য।

প্রশান্ত চায় অরুণবাবুর কথা উঠলে মায়া তা হাসি-ঠাট্টা হিসেবেই নিক। কিন্তু মায়া তা করে না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় প্রশান্ত যখন ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবার কথা বলে তখন মায়া তেমনটি হলে তাকে নামিয়ে দিতে বলেছিল। মায়ার কথা শুনে প্রশান্ত পরিহাস করে বলেছিল—

"এলাহাবাদে'?"(২খ, ১২০পৃ)

মায়া তখন এর উত্তরে নিজেকে সংযত করে বলেছিল—

"এলাহাবাদ হয়ে তো আমরা যাচ্ছি না!"(২খ, ১২০পৃ)

অর্থাৎ অরুণবাবুর বিষয়টি পরিহাসের নয় বলেই মায়া তা সেভাবে নিতে পারে না। এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বিচলিত করে প্রশান্তকে। অথচ এক টাকা বেশি দিয়ে লক্ষ্ণৌ শহরে ফ্লাস্ক কেনায় প্রশান্তকে অনেকক্ষণ ভর্ৎসনা করে মায়া।

একদিন কলকাতা থেকে কিছু দূরে রেলওয়ে কাটিংসে'র জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়ে অরুণবাবুর মানসিকতা প্রশান্ত আবিষ্কার করে এভাবে—

> "সত্যি লোকটা মেকী, আগাগোড়া নকল— নকল, কখনো কোনো উপন্যাসের, কখনো কোনো নতুন-পড়া মনস্তত্ত্বের বইয়ের, কখনো একেবারে সাধারণ গড্ডালিকা-সংস্কারের। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকের এক সাজানো হতাশ প্রেমিক!"(২খ, ১২২পৃ)

অথচ এই অরুণবাবুর কথা তুলে প্রশান্ত নিজেকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করার নেশায় মেতে ওঠে। মাছ ধরার এক ফাঁকে অরুণবাবুকে বলে—

> "কলকাতায় এসেছেন অথচ দেখা করতে যাননি বলে মায়া দুঃখ করছিল।"(২খ, ১২২পৃ)

অরুণবাবু এর জবাব দেয় অত্যন্ত করুণ পরিহাসের সুরে, তা ছিল এমন—

> "তার কাছে অনেক বড় দুঃখ আমার পাওনা। অত সামান্য দুঃখে আমার অপমান হয় — বলবেন!" (২খ, ১২৩পৃ)

এ ধরনের আলাপচারিতার এক পর্যায়ে প্রশান্ত জানায়, অরুণবাবু এসেছেন জেনে মায়া চা তৈরী করে দিয়েছে। অরুণবাবু মায়ার বানানো চা বলে পান করতে চান। কিন্তু অরুণবাবুকে

Dhaka University Institutional Repository

চা দেয়া হয় না। ছিপি খুলতে গিয়ে সমস্ত চা পড়ে যায়। লজ্জিত হয় প্রশান্ত। পড়ে যাওয়া চা অরুণবাবুর জীবনের একটি বিশেষ দিক প্রতীকায়িত করে। প্রশান্তকে এই প্রতীকায়িত অর্থই বেশি করে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে। এরপর বাড়ি এসে প্রশান্ত যখন মায়ার কাছে জানতে পারে অরুণবাবু চা পান করেন না। অরুণবাবুর চা পান করার কথা পর্যন্ত মায়া এখনো মনে রাখাতে প্রশান্তের মনে জ্বালা ধরে। প্রশান্ত সে জ্বালাকে গোপন করতে সক্ষম হয় না।

মায়া যখন অসুস্থ হয় তখনো ঠাণ্ডা না হলেও ফ্লাস্কের জলই সে প্রশান্তকে দিতে বলেছে। এরপর মৃত্যুশয্যা নেয় মায়া। তার বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তার। কিন্তু তখনো আত্মপীড়ন দূর হয় নি প্রশান্ত'র। তাই সে মায়াকে বলে–

> "মায়া, অরুণবাবু এসেছেন দেখতে, অরুণ..."(২খ, ১২৪পৃ)

এর জবাবে মায়া চোখ বুজেই বলেছে—

> "জানি"(২খ, ১২৪পৃ)

এরপর মায়া তলিয়ে যেতে থাকে অচেতনতার জগতে। তাই মায়া হঠাৎ আচ্ছন্নতার ভেতর বলে ওঠে—

> "আমায় তুমি ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি...।"
> (২খ, ১২৪পৃ)

প্রশান্তের এই যে আত্মদ্বন্দ্ব তার অবসান হয় না। অবসান হয় মায়ার জীবনের। তবে এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য উদ্বেল ছিল প্রশান্ত। তার এ মনোভাব লেখক প্রকাশ করেছেন এভাবে—

> "জানা হল না, কিছুই জানা হল না। নিষ্ঠুর যবনিকা এল নেমে, তবু উত্তর মিলল না রক্তাক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রশ্নের, বিষাক্ত কীটের মতো যা তার বুক ভেদ করে বেরিয়েছে।"(২খ, ১২৩পৃ)

এই প্রশ্নের উত্তর প্রশান্ত পায়ও না। রঙচটা থার্মোফ্লাস্ক হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কিন্তু থেকে যাবে প্রশান্তের প্রশ্ন। তাইতো লেখক বলেন—

> "জীবনের দেবতার এরকম পাইকিরি ট্র্যাজিডির কারবার এই প্রথম নয়। যুগে যুগে পৃথিবীময় ছড়ানো ধ্বংসস্তূপের আবর্জনায় একটা রঙ-চটা টোল-খাওয়া থার্মোফ্লাস্ক, আর একটা বুক-চেরা প্রশ্ন!"(২খ, ১২৪পৃ)

প্রশান্তের জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে তার আত্মপীড়ন থেকে। আর সেই আত্মপীড়ন থেকে বিদায় নেয় মায়া। আজ বিংশ শতাব্দীতে নাগরিক জীবনের যে আত্মজটিলতা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা সেদিনও বিদ্যমান ছিল ভারত বর্ষের নগর সভ্যতার পীঠস্থান কলকাতায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমেন্দ্র মিত্রের *থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ* গল্পের নায়ক প্রশান্ত তারই উদাহরণ। এটা এমনই এক যন্ত্রণা যার শেষ নেই। সন্দেহের অন্ধকারে ডুবতে থাকে দুজন, কিন্তু কোনো উত্তর মেলে না। যেমন পায় নি প্রশান্ত।

ভিড় গল্পের নায়ক অজয়। তার জীবনে ভিন্ন এক সংকট তুলে ধরেছেন লেখক। এখানে অজয় ও তার নববধূর সংসার যাপনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অজয়ের স্ত্রীর নাম করুণা। অজয় ও করুণার মধ্যে মানসিক কোনো সংকট নেই। তাদের দাম্পত্য জীবনে মানসিক সংকট না থাকলেও অজয়ের মনমূলে অতৃপ্তির বীজ বোপিত হয়। তাই তার মানসিক সংকটের কারণ। সংকট এমন যে তা থেকে যেনো কোনো মুক্তি নেই। অসহায়ভাবে অজয়কে তা মেনে নিতে হয়। অজয় বিয়ের রাতে করুণার সঙ্গে ভালোভাবে শান্তিতে কথা বলার সুযোগ পায় না। ফুলশয্যার মধুর নির্জনতার চারিধারে জনতা চড়াও হয়ে এসেছে নানাভাবে। জায়গার অভাবে অনেকে শুয়েছে বারান্দায়। পাশের ঘর দখল নিয়েছে দূর সম্পর্কের এক পিসি তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে। তার ছেলেটি সারারাত থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। আর পিসিমা তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেন। টিন সেডে মাঝে মাঝে পায়ের লাথির শব্দ পাওয়া যায়। এরই মাঝে তাদের সলজ্জ পরিচয় নেয়ার চেষ্টা। অবশ্য অভাবের সংসারেই অজয় মানুষ হয়েছে। এ অভাব যেনো তার পিছু ছাড়তে চায় না। যতদূর মনে পড়ে জায়গার টানাটানি সে সবসময় মোকাবিলা করে এসেছে। সে হাত-পা ছড়িয়ে আয়েশ করার মতো স্থান ও নির্জনতার সুখকে উপভোগ করতে কখনো পারে নি। নিভৃত একটা ঘর তার ভাগে কখনো জুটেছে বলে মনে পড়ে না। তাই এসব কিছুতে সে অভ্যস্ত।

তার ছোটবেলার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এভাবে—

> "ছেলেবেলা একটি ছোট ঘরে তাদের চারজনের কেটেছে। খুড়তুত, জেঠতুত তারা তিন ভাই আর এক সমবয়সী মামা। পড়াশোনা শোয়া সবই সেই ঘরে। বাড়তি অতিথি এলে সে ঘরেই আবার তাদের জায়গা দিতে হয়েছে।" (২খ, ১২৭পৃ)

বিয়ের পর বাড়ি-ঘর একটু ফাঁকা হতে না হতেই করুণাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়েছে। এর পরপরই হঠাৎ চাকরি পেয়ে অজয়কে বিদেশে যেতে হয়। তারপর পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেও অজয় তেমনভাবে একাকী কাছে পায় না করুণাকে। পরদিন সবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যেতে হয় মধুপুর। সস্তায় বাড়ি ভাড়া পাওয়ায় তাদের সেখানে হাওয়া বদলের জন্য যাওয়া।

এ পর্যায়ে দিদি আর ভগ্নিপতি অনন্তবাবুর সঙ্গে করুণাকে নিয়ে ট্রেনে মধুপুর যাত্রা করতে হয়। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়ের মুখোমুখি হয় তারা। ভিড়ের মাঝে সাঁওতাল নারী পুরুষদের অসহায়তা অজয়ের মনকে নাড়া দেয়। লেখক তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "বিজয় দেখেছে বই-কি! প্ল্যাটফর্ম যেন হাটকে হার মানিয়েছে। মানুষের একটা বিশাল তাল। অসহায় একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ তারই ভেতর মোটঘাট নিয়ে ট্রেনের দরজায় দরজায় কাতরভাবে আশ্রয় চেয়ে ফিরছে। পুরুষদের পিঠে বাঁধা মোট, মেয়েদের পিঠে বাঁধা ছেলে-মেয়ে। এমন অবোধ অসহায় পশুর মতো কাতরতা তাদের দৃষ্টিতে যে মায়া হয়। এ ট্রেনে বুঝি তাদের না গেলেই নয়। এর আগে কত ট্রেনে তারা এমনি উঠতে গিয়ে হতাশ হয়েছে কে জানে। পারতপক্ষে কে তাদের জায়গা দেবে!" (২খ, ১২৬পৃ)

ট্রেনের মধ্যেও প্রচণ্ড ভিড়। দিদি ও করুণাকে মেয়েদের গাড়িতে তুলে দিতে হয়। করুণাকে নিয়ে এক সঙ্গে যেতে পারলে অজয়ের ভালো লাগতো, কিন্তু তা হয় না। পরের স্টেশন আসানসোলে অজয় খবর নিতে চায় করুণার। আসানসোল পৌঁছাতে মাত্র কুড়ি মিনিট সময় লাগবে। এটুকু সময়ও এখন কাটতে চায় না। আসানসোল প্লাটফরমে গিজ গিজ করে মানুষ। অজয় গাড়ি থেকে নামার পর অনন্তবাবু একটা 'হিন্দু চা' দিয়ে যাওয়ার ফরমায়েশ দেয়। অনন্তবাবুর এই হিন্দুত্বের চেতনায় অজয়ের মনে হাসি পায়। তার হাসার কারণ সে জানে, পয়সা বাঁচানোর জন্যই অনন্তবাবুর এই গোঁড়ামি। অন্যদিকে অজয়ের মন তখন ভিন্ন চিন্তায় আচ্ছন্ন। অজয়ের মনে সংশয় আসানসোলে সে করুণার সঙ্গে দেখা করতে পারবে তো ? এমনটি ভাবার সময় সেকেন্ড ক্লাস একটা কামরা চোখে পড়ায় বিজয়ের সত্যি ঈর্ষা হয়, এ কামরায় অজয় দেখে আয়েশ করে এক দম্পতি সময় অতিবাহিত করছে । বাইরের ভিড় এই দম্পতিকে স্পর্শ করে না। অজয় তাদের ভ্রমণের সুখকে এভাবে প্রত্যক্ষ করেছে—

> "কি নিরুদ্বেগ স্বাচ্ছন্দ্য! স্বামী-স্ত্রী এদিকের বার্থটা বুঝি রিজার্ভ করে চলেছেন। পরিপাটি করে বিছানাটা পাতা, তার ওপর স্ত্রী ট্রে থেকে চা তৈরী করতে ব্যস্ত। স্বামী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোনো ফেরিওয়ালাকে বুঝি ডাকছেন। মানুষের উন্মত্ত ঢেউ গাড়ির ভেতর গাড়ির ওপর যে আছড়ে পড়েছে তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই।" (২খ, ১২৮পৃ)

এরপর বিজয় মেয়েদের সঠিক কামরাটা পায়। ভিড়ের মাঝে অজয় অনেক কষ্টে দিদি ও করুণার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। বিজয় আশ্চর্য হয়, যখন দেখে এই ভিড় করুণাকে অবসন্ন না করে উন্মাদনা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে করুণার উৎফুল্ল মন সত্যিই বিজয়ের কাছে অবিশ্বাস্য।

ভিড়ের মধ্যে বিজয় অবশ্য করুণার কাছে পানি পৌঁছে দিতে পারে না। কেননা উল্টোদিক থেকে দৌড়ে আসা একটা লোকের গায়ে লেগে ভাড়টা ভেঙে যায়। এ অবস্থায় চার ধারের জনতাকে তার বিষ মনে হয়। বিজয় জানে মধুপুর গিয়েও তার নিভৃত অবসর মিলবে না। কেননা অজয় মধুপুরের পরিস্থিতিকে বর্ণনা করে এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "জ্যেঠতুত ভাইয়েরা গেছে পুত্র পরিবার নিয়ে, মামারা এসেছেন সদলে। মাসিমা আসছেন তাঁর ছেলে, মেয়ে, জামাই নিয়ে দেশের ম্যালেরিয়া সারাতে। আত্মীয়তার একটা রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। আদর্শ হয়তো খুব বড়; কিন্তু নিজেকে স্বার্থপর, আত্মসুখী বলে ধিক্কার দিয়েও সে মনের উদ্ধত বিদ্রোহ দমন করতে পারে না। অসহ্য এই ভিড় আর ভিড়, অযাচিত সান্নিধ্যের উপদ্রবের গ্লানি আর অবসাদ।" (২খ, ১২৯পৃ)

শুধু তাই নয় অজয়ের ভগ্নিপতি অনন্তবাবু আস্ফালন করবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অবস্থাতেই নিজের সুবিধাটুকু আদায় করে নেবেন নির্লজ্জভাবে।

এতসব কিছু দেখেও অজয় পরিবর্তিত হতে পারে না। পারে না প্রতিকূল পরিবেশেও নিজের স্বার্থটুকু আদায় করে নিতে। সে শুধু জর্জরিত হতে থাকে অক্ষম আক্রোশ আর আত্মগ্লানিতে।

দাতা গল্পের নায়ক মহিম চিত্রশিল্পী। ছাত্রাবস্থায় তার ছবি আঁকার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ছিল। বলা যায় সে মেধাবী।

সাধারণের চেয়ে ব্যতিক্রমি বলেই কলেজে উঠেই বেশ পরিচিতি পায়। ছবি আঁকাই শুধু নয় অনেক কিছুতেই সে পারদর্শী। মানুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতাও তার ছিল। প্রতারণার মাধ্যমে মহিম পরিচিত হয় অনিমেষের সঙ্গে। অনিমেষ ধনীর সন্তান। সে প্রয়োজনে গাড়িতে কলেজে আসে। তার হৃদয় যেমন প্রশস্ত তেমন ভাগ্যের অনুগ্রহে অর্থের ভাণ্ডারও তেমনি প্রায় অফুরন্ত। এমনি সৌভাগ্যবান অনিমেষের কাছে দশ টাকা ধার চেয়ে মহিম এক প্রকার পথ আগলে দাঁড়ায়। সে মায়ের মৃত্যুর কথা বলে দশ টাকা ধার চায়। অনিমেষের কাছে তা আদায়ও করে নেয়। মায়ের মৃত্যুর কথা বলে প্রতারণা করে টাকা আদায় করায় মহিমের উপর অনিমেষ চটে যায়। এ ধরনের আচরণ যে কাম্য নয় তা জানানোর জন্য অনিমেষ মহিমের হোস্টেলে যায় । সেখানে গিয়ে মহিম সম্পর্কে তার ধারণায় পরিবর্তন আসে। মহিমের আঁকা ছবি দেখে মুগ্ধ হয় অনিমেষ। প্রতারণা করলেও মহিমের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে অনিমেষের। মহিম সম্পর্কে অনিমেষের ধারণা লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "মহিম ছবি আঁকে। তার হস্টেলের ঘরময় ছড়ানো সেই ছবিই অনিমেষ প্রথম দিন দেখেছিল। অনিমেষ বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু তারা বহুদিনের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ধনী পরিবার। ছবি সম্বন্ধে কিছু বোধ ও রুচি তার রক্তেই আছে। প্রথম দিন ঘরের সেই এলোমেলো ছড়ানো ছবি দেখেই সে বুঝেছিল, কথায় যতই থাক, মহিমের রঙ-তুলিতে ফাঁকি নেই।"(২খ, ২৬৩পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

এরপর অনিমেষের ধনভাণ্ডার ছিলো মহিমের জন্য উন্মুক্ত। অনিমেষের দানও অনেকদিন কোনো প্রশ্ন করা ছাড়াই মহিম গ্রহণ করে। এমনকি অনিমেষের ভাড়া ফ্ল্যাটে উঠতে তার বাধে নি। মহিমের একমাত্র কন্যার জন্মদিনেও অনিমেষ নজর কাড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। মহিম ফ্রান্স যাওয়ার জন্য যে টাকা নিয়েছিল তা দিয়ে হঠাৎ একটি অতি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। মেয়েটি মহিমের প্রতিভা বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াবে মনে করে অনিমেষ উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য উৎকণ্ঠার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর সম্পর্কের সংকট তৈরি হয় মহিমের মনোলোকে। কথা ছিল অনিমেষ ফ্রান্সে যাওয়ার আগে মহিম তার বাসায় উঠবে। কিন্তু মহিম তা না করে ফ্ল্যাট থেকে উধাও হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে অনিমেষ এটুকু জানতে পারে । এর সাত বছর পর অনিমেষ দেখা পায় মহিমের।

তার আগে অনিমেষ উদ্যোগ নিয়েছিল মহিমের ছবি নিয়ে প্রদর্শনী করার। অনিমেষ নিজের বাড়িতে সে প্রদর্শনীর আয়োজনও করে। বিচক্ষণ সমালোচকরা এই অচেনা শিল্পী সম্পর্কে কৌতূহল দেখিয়েছিলেন। প্রদর্শনী চলাকালে মহিম একদিন উন্মাদের মতো এসে তা লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মহিমের বাসায় গেলে অনিমেষকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অনিমেষের প্রশ্নের উত্তরে মহিমের মেয়ে রুনু জানায় যে, তার বাবা দেখা করবেন না। সেদিন অনিমেষের হাতে একটি চিঠি তুলে দেয় রুনু। তাতে প্রতিফলিত হয় মহিমের মানসিকতা। মহিম চিঠিতে লেখে—

> "তোমার প্রশ্রয় না পেলে আমার প্রতিভার সে মিথ্যা দম্ভ ফুলে ফেঁপে উঠে আমার নিজের সত্যকে বোধহয় এতদিন আড়াল করে রাখত না। সে মিথ্যার দম্ভ আমি জীবন থেকে বাদ দিতে পেরেছি। তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঋণও শোধ হয়ে গেছে মনে করি। এখন দেখা হলে কেউই কাউকে ঠিক বুঝতে বোঝাতে পারতাম না।" (২খ, ২৬৬পৃ)

এ গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্ত মহিমের জীবনবোধে অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। যেখানে অন্যের কাছে ধারের জন্য হাত পাততেও বাধতো না সেখানে সেই মহিমই স্বাভাবিকভাবে পেয়ে আসা দানও আর নিতে চায় না। শুধু তাই নয় সে সম্পর্কও আর টেনে নিতে আগ্রহী নয়। অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করাই স্বাভাবিক আচরণ। সন্দেহ নেই এই পরিবর্তনই মহিমকে আলোকিত চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে। এ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় গল্প শেষে লেখকের মন্তব্যে—

> "সারাজীবন ধরে দিতে দিতে সে-ই কি গেল ছোটো হয়ে, আর নিতে নিতে মহিমই কি শেষ পর্যন্ত বড়ো হয়ে গেছে চাওয়ার ওপরে উঠে!"(২খ, ২৬৬পৃ)

একটি রাত্রি গল্পের নায়ক সুব্রত কলকাতার অধিবাসী। ব্যক্তি জীবনে ব্যর্থতা তার মনে অবিশ্বাস হতাশা ও সংশয় সৃষ্টি করেছে। অবশ্য সুব্রত সেই সময় ও যুগের প্রতিনিধি যেসময় সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস প্রবলভাবে ছড়িয়েছিল। লেখক তাঁর সময়কে দেখেছেন এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "এযুগে আমরা সবাই অল্পবিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।" (২খ, ৬৯পৃ)

এই কঠিন আবরণ তার মনের মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এইখানে তার মনের তারুণ্য অস্তমান। যদিও তার দৈহিক অস্তমান যৌবন এখনো বিদ্যমান। এই সময়ে তার মানসপ্রবণতা ছিল এমন—

> "সুব্রত যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেখানে অস্তমান যৌবনের আলো এখনো আছে, কিন্তু নেই উজ্জ্বলতা। দেহের নয় মনের যৌবনই এসেছে তার ম্লান হয়ে। সে ক্লান্ত— আত্মার দুঃসহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আশা, আদর্শ, প্রেরণার ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে বাস করছে। প্রতিদিনের সূর্যোদয়কে সাগ্রহে অভিনন্দিত করবার উৎসাহ আর তার নেই।" (২খ,৭০পৃ)

এমনি মানসিক অবস্থায় সুব্রত কলকাতা শহরে রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায়। এই ঘুরে বেড়ানো তার ভালো লাগে। রাতের অন্ধকারে যেনো সে স্পষ্টভাবে লেখা সেই দিনের পাতাগুলো পড়ে কোন অস্তিত্বের আভাস পায়। তবে সুব্রতের চরিত্রবৈশিষ্ট্য এই যে অন্যরা যেভাবে জীবনের শূন্যতা ও হতাশাকে মেনে নেয় সে তা পারে না। এই পরিস্থিতি সুব্রতকে হাঁপিয়ে তোলে। তাই সে রাতের আঁধারে পথে বের হয়। তেমনি একদিন রাতে চৌরঙ্গীর কাছাকাছি আসার পর খুঁজে পায় তার হারানো প্রাক্তন প্রণয়িনীকে। অন্ধকারে সে দেখতে পায় আবছায়া এক নারী মূর্তি। যে নারী মূর্তিকে দেখে চমকে উঠে প্রশ্ন করে—

> "তুমি!"(২খ, ৭০পৃ)

হ্যাঁ এই নারী আর কেউ নয় তারই পরিচিত মীরা। যে মীরার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল ট্রাম্ভা ফলসে। সেখানে মীরার পরিবার গিয়েছিল পিকনিকে আর সুব্রত ঐখানে একটা স্যানাটোরিয়াম গড়ার চেষ্টা করেছিল। সেই সূত্রে মীরার বাবার সঙ্গে তার আলাপ ও মিরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মীরা সে সময় সংকোচ পরিহার করে একটু ধরা দিয়েছে সুব্রতের কাছে। তখন মীরার মনে গড়ে ওঠা ভালোবাসাকে সুব্রত অনুরাগ আকর্ষণের সাধারণ দৈনন্দিন অভিনয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। মিথ্যা দুর্বলতার ভান করতেও তার বাধে নি। ভান করার অভ্যস্ততার কারণে সুব্রতের ক্লান্ত মন মীরার সংস্পর্শে সাড়া দেয় নি। তারপর সুব্রতের সঙ্গে আজকের পরিপূর্ণ নারী মীরার দেখা হয়। এই সাক্ষাতে তার মনে মীরাকে পাবার বাসনা জাগে। তবে সেই আকাঙ্ক্ষা সাময়িক। সে মীরার ওপর তার হাত রেখে উষ্ণতা পাবার চেষ্টা করেছে। এই সময় সে মীরাকে জানিয়েছে সত্যিকারভাবে এবার সে তাকে পেতে চায়। সে সদর্পে তার অতীতকে মিথ্যে হিসেবেও ঘোষণা করে। কিন্তু এই ঘোষণাও ক্ষণিক আবেগের প্রকাশ। মাত্র একটি রাত পার হওয়ার পর সুব্রতের এই আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না। রাতের সে উষ্ণতাকে

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন সত্যি কিনা তাই তার মনে প্রশ্ন জাগে। সত্যকে যাচাই করার মতো সাহস তার হয় না। সে রাতের সামান্য প্রাপ্তিই তার জীবনের জন্য যথেষ্ট। সেটুকু সে পুঁজি করে বাঁচতে চায়। অপরূপ রাতকে তার জীবনে অক্ষয় করে রাখতে চায়। এ প্রসঙ্গে তার উচ্চারণ—

> "রাত্রির এই রহস্য-পরিচয় সে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে টেনে এনে ধূলিমলিন করবে না।" (২খ, ৭৬পৃ)

বাস্তব জীবনে প্রবেশের ভয় তার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ও দুর্বলতা । কেননা সুব্রত যে রঙিন রাত ধরে রাখতে চায় সে আলোই তাকে একসময় বিপর্যস্ত করবে আর হয়েছেও তাই। পুরুষের এই সাহসহীনতার কারণে অনেক প্রেম ঝরে যায়। দুটি মন হয় রক্তাক্ত। এই ভয়কে জয় করার মধ্য দিয়ে প্রেমের স্বার্থকতা। কিন্তু সবাই যে এক্ষেত্রে সফল হয় তা নয়। সেই অসফল প্রেমিক মনেরই প্রতিনিধি *একটি রাত্রি* গল্পের নায়ক সুব্রত।

পুনরুক্তি গল্পের অনিরুদ্ধবাবু পেশায় কেরানী। তার জীবনের দুটি দিক ধরা পড়েছে এ গল্পে। এর একটি হল তার দাম্পত্য জীবন অন্যটি প্রেমের। দাম্পত্য জীবন ও বিয়ের পূর্বে প্রণয় সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষা ও আচরণে তার মানসিকতা ফুটে উঠেছে। যেখানে তার পোড় খাওয়া জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে। রক্ত মাংসের প্রাণময় অনিরুদ্ধের যন্ত্রে পরিণত হবার চিত্র।

ছাত্রজীবনে অনিরুদ্ধের সঙ্গে ইলা নামে একটি মেয়ের প্রণয় গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ইলা স্কুলমিস্ট্রেস হয়। অনিরুদ্ধের দুর্বলতায় তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক চূড়ান্ত পরিণতি পায় না। অনিরুদ্ধের ব্যর্থতায় ইলা দেবীকে বেছে নিতে হয় একাকী জীবন। ভালোবাসাকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার চূড়ান্ত ইচ্ছে ইলা দেবীর ছিল। আকাঙ্ক্ষার ঘাটতি ছিল অনিরুদ্ধের। প্রেমকে যৌক্তিক পরিণতি দেয়ার সাহস অনিরুদ্ধের নেই। যা তার পরের জীবনেও দৃশ্যমান হয়।

আস্থা ও সাহসহীনতায় স্ত্রীকে ভয় পায় অনিরুদ্ধ। এই ভয়ের কারণে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে সে যে আচারণ করেছে তাতে তার পূর্ব জীবনের বিপরীত মেরুতে অবস্থান। অর্থাৎ তখন সে আস্থাহীনতার সংকটে ভুগছে। সেকারণে খর্বকায় ও কর্তৃত্ব পরায়ণ স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে ইন্টার ক্লাসের চেয়ে সেকেন্ড ক্লাসের সুবিধাগুলো দৃষ্টিকটুভাবে দেখাতে উদ্যোগী হয়। যা তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতার হানি ঘটায়। সে সেকেন্ড ক্লাসের গুণকীর্তন করেছে সন্তানদের কাছে আবার স্ত্রীর ধমকানিতে তার সমালোচনাও করছে। এসব আচরণে তার চরিত্রের হালকাভাবই ফুটে ওঠে। সেকেন্ড ক্লাস সম্পর্কে তার মন্তব্যগুলো পর্যায়ক্রমে ছিল এমন—

> "রোদ লাগছে তো জাল দেওয়া জানলাটা তুলে দে না ভুলো। এ কি ইন্টার ক্লাশ পেয়েছিস, রোদ এলেই কাঠের সার্শি ফেলে গরমে পচে মরতে হবে। দিব্যি জাল দেওয়া সার্শি, রোদও আটকাবে হাওয়াও আসবে।" (১খ, ১৪১পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

"নড়বার জায়গা আছে একটু, সেকেন্ড ক্লাশ না গোয়াল ঘর, কান মলে শুধু ডবল ভাড়া আদায় করে ছাড়লে।" (১খ, ১৪১পৃ)

অনিরুদ্ধের মনে যে ভয় স্থায়ীভাবে আসন পায় তাই নয়, তার জীবনের প্রাণময়তা নির্জীব হয়ে আসে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

"বৃহৎ পরিবারের ভারে বিব্রত, এই নিতান্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত নিরীহ কেরানী ও জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা যার মুখের রেখাকে কঠিন করে তুলেছে—" (১খ, ১৪৩পৃ)

অনিরুদ্ধ মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্তই হয় নি মিথ্যা বক্তব্য দেয়ার প্রবণতাও অর্জন করেছে। তাই স্ত্রীর কাছে তার অবস্থান বড় করে তোলার জন্য এমন মন্তব্য করতে হয়—

"খৃস্টান নয় গো, খৃস্টান নয়–লেডী ডাক্তার ! অমনি চালচলন হয়ে গেছে এখন। মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষের কাজ করলে হবেই তো। আমি আবার ওকে ছেলেবেলা পড়িয়েছি। তখন কলকাতায় ওদের বাড়ি থেকে বাজার সরকারী করি আর ওদের দুভাই বোনকে পড়াই। বাপটার ছিল সব সাহেবী চাল, মেয়েটা তাই ধিঙ্গি হল এমন ! তখন বাজার সরকারী করতাম, এখন আমায় সেকেন্ড ক্লাসে দেখে অবাক হয়ে গেছে !" (১খ, ১৪৪পৃ)

ইলা দেবীর পেশা সম্পর্কে অনিরুদ্ধ যে বক্তব্য রেখেছে তাকে প্রগতিশীল বলা যায় না। স্ত্রীর কাছে ইলার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলেও ইলার সামনে সে পুলকিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় অনিরুদ্ধ সত্যের মুখোমুখি হতেও ভয় পায়। সেকারণে ইলার বাবার মৃত্যুর সংবাদের কথা জানালে অনিরুদ্ধ "জানি" এই একটি কথা দিয়ে তার উত্তর দেয়। স্ত্রীর সামনেও সে ইলার সঠিক পরিচয় দিতে পারে না। এটা মধ্যবিত্তের অবনতিশীল দুর্বল মনের বহিঃপ্রকাশ। সে দুর্বলতা সেকেন্ড ক্লাসে উঠার পর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

পঞ্চশরের চতুর্থ গল্পের নায়ক রমেশ। মানসদ্বন্দ্ব, স্ত্রীর প্রতি কপট ভালোবাসা ও তজ্জনিত অনুতাপ এই বিপরীতমুখি বৈশিষ্ট্য রমেশকে জটিল করে তুলেছে। স্ত্রীর প্রতি কপট আচরণ করার পর সৃষ্ট অনুতাপ তাকে একরৈখিক চরিত্র থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিন বছর ধরে তার স্ত্রী, সরযূ অসুস্থ। এই তিন বছর সে প্রাণপণে স্ত্রীর সেবা করে এসেছে। এজন্যে রমেশ চরিত্রে অসাধারণ মহত্ত্ব আরোপ করা যেতো কিন্তু তার অন্তরে লালিত জটিলতার কারণে এ কৃতিত্ব পেতে পারে না। কারণ তার এই সেবা নিখাদ ছিল না। এরমধ্যে আত্মসুখ লাভের বিষয়টি জড়িত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা অকুণ্ঠ থাকে না। সেখানে জড়িয়ে যায় দ্বিধাবোধ। সে প্রতারণা করে বসে এসময়। যখন তার স্ত্রীর অসুস্থতা বেড়ে যায় তখন এটা সে করে। এ পর্যায়ে স্ত্রীর আবেগময় আবেদন রমেশকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। স্ত্রীর স্নেহসূচক নিষেধ সত্ত্বেও সে শ্রীহীন শুষ্ক হাড় বেরুনো গালে অধর স্পর্শ করে। কিন্তু তাতে আন্তরিকতার কোনো ছোঁয়া ছিল না। এই কপটতার কারণে স্ত্রীর প্রতি দীর্ঘ সেবাযত্নের আর কোনো মূল্য থাকে না। এখানে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রমেশ শুধু স্ত্রীকে খুশি করার জন্যেই সব কিছু করে। এতে প্রকৃত ভালোবাসার টান বা তাগিদ থাকে না। এই বক্তব্য তার যথার্থ প্রমাণ—

> "জানি, সে তার অধরেই এই স্পর্শটি প্রত্যাশা করেছিল। তবু সে জানতে পারলে না এই আবেগহীন চুম্বনের অপমানটি।" (২খ, ৩০৫পৃ)

অন্যদিকে এই ভালোবাসাহীনতার বিপরীত প্রান্তে ছিল সরযূর বিশ্বাস। সরযূ এক কোলে মাথা রেখে ঘুমালে রমেশ সুযোগ পায় তার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের। দেখে তিন বছরে দুটি হৃদয়ের জগতে পরিবর্তন এসে গেছে। এ সময় রমেশ আরো সিদ্ধান্ত নেয়—

> "ভাবলাম, কাল সোহাগের প্লাবনে সরযূকে অভিভূত বিস্মিত করে দেব। ভণ্ডামির চূড়ান্ত হয়ে থাক !"(২খ, ৩০৬পৃ)

এমন সিদ্ধান্তের পরপরই তাই রমেশ সরযূর প্রতি উদাসীনতা দেখায়। সরযূ স্বামীর সহায়তা চেয়ে ডাকতে থাকে। রমেশ তা শুনতেও পায়। কিন্তু অলসতার কারণে এ ডাকে আর সাড়া দেয়া হয় না। এরপর সরযূ পিকদানিটা নিজেই তুলতে গিয়ে পড়ে যায়। হঠাৎ শব্দ শুনে এরপর রমেশ বাধ্য হয়ে উঠে। দেখে সরযূ মাটিতে পড়ে গোঙ্গাচ্ছে। সরযূর এ অবস্থায় রমেশ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বাঁধভাঙা কান্না কেঁদেছিল সেদিন সে, জ্বলেছিল চরম অনুতাপের জ্বালায়। এই অনুতাপ রমেশকে একজন অসাধারণ সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে তুলে ধরে। তবে তা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আবার কপটতা আকড়ে ধরে সে। আবার নির্লজ্জ পিশাচের মতো রমেশ জিজ্ঞাসা করে—

> "কি দরকার ছিল সরযূ ? আমায় ডাকনি কেন ?"(২খ, ৩০৬পৃ)

তবে রমেশ যে চূড়ান্ত ভণ্ড তাও নয়। দীর্ঘ পরিশ্রমে হয়তো তার আলস্য এসে থাকতে পারে। এটি যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেও হতে পারে। স্ত্রীর আহ্বানে তাকে সহায়তা করতে রমেশকে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। রমেশ ঐসময় যতটুকু সচেতন ছিল তাতে তার এ ধরনের অলসতাকে সমর্থন করা যায় না। ভালোবাসাহীনতার কারণে সে এমনটি করেছে। নীতিবাদী মন তাকে অনুশোচনা করতে বাধ্য করেছে। এটি অবশ্যই সরযূ ও রমেশ উভয়ের জন্য ট্র্যাজেডি। তবে সে জেনে শুনে যে কপটতা করেছে তা কোনোক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষেই তো সরযূকে ভালোবাসতে তার কোনো বাধা ছিল না। ভালো সেভাবে বাসতে না পারলে সে যে একেবারে অমানুষ নয় তা আবার বুঝা যায়। সরযূ যখন তাকে বলে এ ঘটনায়

Dhaka University Institutional Repository

তো রমেশের কোনো দোষ নেই। তখন কিন্তু রমেশ নীরবে চোখ ফিরিয়ে না নিয়ে পারে নি। এটি অবশ্যই তার ভালো একটি গুণ ।

তবে শেষ পর্যায়ে রমেশের মধ্যে সত্যিকার অসাধারণ মানসিক পরিবর্তন ঘটে। সে আন্তরিকভাবে সরযূকে ভালোবাসতে না পারলেও সরযূর ধারণাকে ভাঙতে দিতে চায় না। এ প্রসংগে রমেশের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়—

> "এতদিন পরে আজ সরযূর শিয়রে বসে এতদিনকার নিজেকে নিজে ঠকাবার কদর্য চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে, প্রথম অসংকোচে সহজ মনে সহজ প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, 'ভগবান! সরযূকে তাড়াতাড়ি নাও। নিজেকে যে আর বিশ্বাস করতে পারি না। মৃত্যু-বর দিয়ে তাকে নিষ্ঠুর সত্যের আঘাত থেকে স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা থেকে আড়াল করে রাখো। আমার অন্ত -রের একান্ত অনুরোধ— তাকে তাড়াতাড়ি নাও। মানুষকে এত দুর্বল করে গড়ে এমন অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলা কি তোমার বিষম পরিহাস নয় বিধাতা ?"(২খ,৩০৭পৃ)

রমেশ চরিত্রের জটিলতা ও আত্মদ্বন্দ্ব আধুনিক মানুষের আত্মদহনেরই ফসল। আধুনিক যুগের সামাজিকতার আবরণ রক্ষাকারী মানুষ মনের বিরুদ্ধেও অনেক ক্ষেত্রে অভিনয় করতে বাধ্য হয়। এমন অভিনয় করাটা এক্ষেত্রে এড়ানো যায় না। সমাজের চোখের ভয়ে তারা তা করে না। যেমন রমেশ সমাজকে উপেক্ষা করে সত্যের মুখোমুখি হতে পারে নি। রমেশ আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত উচ্চ মধ্যবিত্তের সুযোগ্য প্রতিনিধি।

অমোঘ গল্পের বিনয়বাবু উচ্চ মধ্যবিত্ত পেশাজীবী। কলকাতায় প্রথম ডাক্তারি শেখার সাহস যারা করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। সংস্কার জয় করে মরা কাটবার এই বিদ্যা অর্জনকারী ১৯ বছর বয়সী এই তরুণের নারীভাগ্যও ছিল সুপ্রসন্ন। সে হিসেবে মধ্যবিত্তের যে জটিল জীবনসংগ্রাম তা বিনয়বাবুকে মোকাবেলা করতে হয় না। তার ভাগ্য সুপ্রশন্ন এজন্য যে, তার আত্মীয় গল্পের নায়িকা নলিনীর বাবা কলকাতার মর্যাদাবান ব্যক্তি। নলিনী সে যুগের মেয়েদের অগ্রবর্তিনী। নলিনীর বাবা ব্রাহ্মণ না হয়েও সে যুগে অত্যন্ত প্রাগ্রসর ব্যক্তি ছিলেন। নলিনী তারই মেয়ে। নলিনী জানালা শার্শি বন্ধ করে ছ্যাকরা গাড়ি চড়ে প্রত্যেহ স্কুলে যেতো। শুধু তাই নয় তার চলা-ফেরা পাড়ার যুবকদের জিহ্বার খোরাক যোগাত।

এমন সৌবাগ্যবতী মেয়ের সঙ্গে বিনয়বাবু মেলা-মেশার সুযোগ পান। এক পর্যায়ে এই আদুরে মেয়ে নলিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কও হয়। বিনয়বাবু নলিনীর বাবার প্রিয় পাত্র হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বভাবের নলিনীর বাবা বিনয়কে পছন্দ করবেন এটাই স্বাভাবিক। তদুপরি বিনয়বাবু ছিলেন নলিনীদের জ্ঞাতি। তবে জ্ঞাতি হওয়া বড় কথা নয়। নলিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ বিনয়বাবু পান ডাক্তারি বিদ্যা শেখা শুরু করার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

এক বিয়ের অনুষ্ঠানে বিনয়বাবু ও নলিনীর মধ্যে মনের ভাব বিনিময় হয়। বিনয়বাবু সমাজ সচেতন একজন মানুষও বটে। তিনি তার সময়কে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সে সময় সম্পর্কে তার মূল্যায়ন—

> "লক্ষ করলে বোধ হয় যে আমাদের প্রেমের আলাপেও ছিল তখন সে যুগের সংস্কার-উন্মাদনার প্রভাব। তোমাদের যা গা-সওয়া হয়ে গেছে আমরা তখন নতুন স্বাদ পেয়ে জাগরণে নিদ্রাতেও তা ভুলতে পারছি না।"(২খ,৬০পৃ)

নলিনীর সঙ্গে বিনয়বাবুর এ ভালোবাসা স্থায়ী পরিণতি লাভ করে না। তবে এ ক্ষেত্রে বিনয়বাবুর বিশ্বাস তার ভালোবাসাকে যৌক্তিক পরিণতি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কেননা তার বিশ্বাস ছিল নলিনীর বাবা মানুষের সমালোচনা শুনে মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দেবেন না। তার বিশ্বাস নলিনীর বাবা এ সমালোচনা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। এই ভরসায় বিনয়বাবু ডাক্তারি পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সুদূর পশ্চিমে মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে চলে যান। এতে অবশ্য নলিনীর বাবার উৎসাহও কম ছিল না। নলিনীর বাবা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ছিল এমন—

> "নলিনীর বাবার সাহস ও মানসিক সবলতায় আমার ছিল অটুট বিশ্বাস। আর যেই টলুক–মানুষের জিহ্বা সঞ্চালনে তিনি যে টলবেন না এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হায় মানুষের মন !"(২খ, ৬১পৃ)

নলিনীর বাবা সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেন নি। তিনি মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেন। উচ্চ বেতনের মর্যাদাপূর্ণ চাকরি নিয়ে বিদেশে যাওয়াটা বিনয়বাবুর জন্য সংকট হয়ে দেখা দেয়। নলিনীর অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাওয়াতে বিনয়বাবুর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানা যায় না। সামাজিকভাবে উচ্চ আসনে থাকায় তার প্রতিক্রিয়া ছিল সহজ, স্বাভাবিক। নলিনী এক বছরের মাথায় বিধবা হয়ে ফিরে আসলে বিনয়বাবু আবার উদ্যোগী হন নতুন করে সম্পর্ক স্থাপনে। বিনয়বাবু আকাঙ্ক্ষা পূরণে নলিনীদের বাড়িতে পর্যন্ত যান।

নলিনীর বিশ্বাসবোধের পরিবর্তন আসায় বিনয়বাবুর এ চেষ্টা সফল হয় না। স্বামীকে হারিয়ে নলিনী শান্তির জন্য নতুন আশ্রয় খুঁজে পায়। তা হচ্ছে ধর্মীয় জীবন যাপনে নিজেকে সমর্পণ করা। যে জীবনে মানুষ খুঁজে পায় চিরায়ত প্রশান্তি। ধর্ম পালনের অমৃত সুধা পেয়ে নলিনী স্বাভাবিকভাবে বিনয়বাবুর দিকে আর অগ্রসর হয় নি। নলিনীকে পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় চেষ্টায় আমরা তার প্রতি ভালবাসার চেয়ে করুণা প্রকাশ করতে দেখি। একারণে তার এ প্রয়াস সফল হয় না। বিনয়বাবুর প্রতি নলিনী যে আস্থাশীল ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। নলিনী বিয়ের আগে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা তাও গল্পে উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বিনয়বাবুর চরিত্র বিশ্লেষণে এ কথা বলা যায়, জীবনমুখি আচরণ তার মধ্যে পাওয়া যায় না। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মানসিক দিক দিয়ে তিনি উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হতে পারেন নি। যদি সামাজিক মর্যাদা ও বিত্ত তার জীবনে এসেছে। এ অবস্থায় উচ্চ বিত্তশ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে পারলে পরবর্তীকালে প্রবাসে তাকে একাকি জীবন কাটাতে হতো না। তার এ পরিণতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় মধ্যবিত্তের কল্পনাশ্রয়ী জীবন ভাবনার কথা । বিনয়বাবুর এ সংক্রান্ত মনোভাব ছিল এমন—

> "ট্র্যাজিডি তো সেইখানেই! অপরূপ, রহস্যময় এই মানব-আত্মা, শূন্য আকাশ যে দেবতায় ভরিয়ে তোলে, প্রেমকে মৃত্যুর ওপারেও জয়ী করবার যে স্পর্ধা করে, শেষ পর্যন্ত সেও একটা শুকনো, কুৎসিত ডাক্তারী শাস্ত্রের অধীন। ডাক্তারী শাস্ত্রের অমোঘ বিধান তার সমস্ত আদর্শ, সমস্ত স্বপ্নকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে থেঁতলে নিজের নির্দিষ্ট পথে চলে যায়।"(২খ, ৬৩পৃ)

পঞ্চস্বরের প্রথম গল্পের নায়ক অনন্ত অর্থনৈতিকভাবে বেশ সচ্ছল। সে স্নেহধন্যও। জাগতিক বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হিসেবে তাকে দেখা যায়। সে স্বার্থ উদ্ধারে পটু। সে ভালোবাসে তাদের ভাড়াটের মেয়ে চিত্রাকে। যাকে সে বালিকা বয়স থেকে দেখেছে। এই চিত্রাকে গ্রীষ্মের তপ্ত কর্মহীন দুপুরে অনন্ত নবযৌবনা হিসেবে আবিষ্কার করে। যার হৃদয়কে আজ সে চেনে না। কিন্তু তার জন্য এখন অনন্তের কৌতূহলের শেষ নেই।

তার প্রেম সার্থক করার জন্যে নবযৌবনা চিত্রার মায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। চিত্রার দরিদ্র মাকে যেমনি আর্থিক সহায়তা করে তেমনি তার বাবার সখের অর্থও যোগান দেয়। বসবাসের কষ্ট লাঘবের জন্য চিত্রার মাকে আলাপকালে অনন্ত বলে—

> "আপনাদের উত্তরের ঘরটার পেছনে অতখানি জায়গা মিছিমিছি পড়ে আছে। ভাবছি ওখানে একটা ঘর তোলবার বন্দোবস্ত করব, আপনাদেরও তো এই ঘরটায় ভাঁড়ার আর শোবার ব্যবস্থা একসঙ্গে করতে বেশ অসুবিধা হয়।"(২খ, ২৮৩পৃ)

এ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের মানসিকতা সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আর্থিক সহায়তা দিয়ে অভাবী মানুষের মন খুব সহজে জয় করা যায়। কেননা এসময় অভাবী মানুষ তার অর্থ প্রাপ্তিকেই বড় করে দেখে। সবক্ষেত্রে হয় তো এমনটি নয়। যারা নয় তারা ব্যতিক্রম। অধিকাংশের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য। যেমনটি সম্ভব হয়েছিল চিত্রার বাবা-মায়ের মন জয়ের বেলায়। বাবা-মায়ের মন জয় করতে পারলেও চিত্রার মানসিক দৃঢ়তায় অনন্ত উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয় নি। চিত্রা ভালোভাবে গ্রহণ করে নি অনন্তের এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়াসকে। চিত্রা এই অর্থসহায়তা দেয়াকে ঘুষ হিসেবে অভিহিত করায় অনন্তকে আহত হতে দেখা যায়। মনে মনে এর জবাবে অনন্ত বলেছে—

> "আমার হীনতাকে, আমার নির্বুদ্ধিতাকে তুমি যত পার ভর্ৎসনা কর, চিত্রা, আমার স্পর্ধাকে যত পার বিদ্রূপের কশাঘাত করো, কিন্তু তোমায় আমি ভালোবেসেছি, এই কথাটি অবিশ্বাস কোরো না। তোমার সমস্ত অমূলক অপবাদের মধ্যে এইটুকুই সত্যি যে আমি তোমার ভালোবাসা চাই। সে কি এত অন্যায়, চিত্রা ? ভাগ্যক্রমে আমার বাপ ধনী, সেটা কি আমার একটা অপরাধ, চিত্রা ? ভাগ্যক্রমে হয়তো আমি অপ্রিয়দর্শন নই, তার জন্যে আমি কি ভালোবাসার অধিকার থেকে বঞ্চিত হব ? "(২খ, ২৮৪পৃ)

কিন্তু তার এ বক্তব্য চিত্রার কাছে উপস্থাপন করতে পারে না। তার মধ্যে জাগে উচ্চবিত্তের রক্তের প্রতাপ। আর এখানে নিশ্চিত হয়ে যায় দু'জনের ব্যবধান, সে ব্যবধান আর্থিক। অনন্ত এই আর্থিক শক্তি থেকে মুক্ত হতে পারে নি। প্রেম লাভ নয় ইগোই এখানে তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। শ্রেণি ব্যবধান সম্পর্কে সে সচেতন এ মনোভাব তারই প্রমাণ। অনন্ত আত্মবিশ্লেষণ করে এভাবে—

> "কিন্তু তখন শিরায় শিরায় আদিম প্রপিতামহের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দিতে হবে। অপমানের প্রতিশোধ চাই। "(২খ, ২৮৪পৃ)

অনন্তের এই আত্মবিশ্লেষণ আমাদের বক্তব্যের পক্ষে জোরালো সমর্থন । তবে অনন্ত চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নারীত্বের অপমান করায়। সে যেভাবে চিত্রার নারীত্বে আঘাত হেনেছে তা যে কোনো সচেতন নারী হৃদয়কে শক্ত করে তোলে। জাগায় প্রতিশোধের স্পৃহা। চিত্রা প্রতিশোধ নিয়েছিল হাতের পেপার ওয়েট দিয়ে অনন্তকে আঘাত করে। যার ফলে অনন্তের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক সমালোচনা থেকে বাঁচতে বাস ওঠাতে হয় চিত্রার পরিবারকে। অনন্ত চিত্রার নারীত্বে আঘাত হেনেছিল এভাবে—

> "তুমি বুদ্ধিমতী চিত্রা, আমার মতলবটা বুঝতে তোমার দেরি হয়নি। কিন্তু একটু ভুল করেছ তোমার অহংকারের দরুন; তোমার ভালোবাসা কেনার জন্যে মূল্য দিচ্ছি মনে করে নিজেকে অযথা একটু সম্মান দিয়েছ। ভালোবাসা কেনা যায় না সে আমিও জানি, তুমিও জানো। যার জন্যে দাম দেওয়া যায়, তারই জন্যে দিয়েছি। তোমার ভালোবাসার জন্যে এক কানাকড়ি দেওয়াও আমি অপব্যয় মনে করি।"(২খ, ২৮৪পৃ)

সে চিত্রার বিস্ময়ের জবাবে আরো বলেছে—

Dhaka University Institutional Repository

> "অত আহত বিস্ময়ের ভান দেখিয়ো না, চিত্রা, তাতে দর বিশেষ বাড়বে না, বরঞ্চ এমন সুযোগটা হাতছাড়া— "(২খ, ২৮৪পৃ)

এই মন্তব্যের পর আহত অবস্থায়ও মর্মাহত চিত্রার নিদারুণ লজ্জাকর অসহায়তা দেখে শিউরে উঠেছিল অনন্ত। আর সেকারণে অসুস্থ অবস্থায় তার মনের পরিবর্তন হয়। মার কাছে চিত্রাদের খোঁজ নেবার চেষ্টা করে। সে এসময় চিত্রা ও মাসিমাকে আসতে বলার জন্য চিঠি লিখতে মাকে রাজি করতে সক্ষম হয়। তার বিশ্বাস ছিল চিত্রা তার ভুল বুঝতে পারবে। এ সম্পর্কে অনন্তর বিশ্বাস—

> "আর আমি এটা ঠিক জানি মা তুমি লিখলে তারা না এসে পারবে না। আমি জানি যে চিত্রা অনুতপ্ত না হয়েই পারে না। যদিও আমি তাকে সেদিন যে অপমান করেছিলাম তার বদলে এই আঘাতটুকু না পেলে নারীর ওপর চিরকালের মতো অশ্রদ্ধা হয়ে যেত। আমি জানি মা, সে শুধু সংকোচেই আসতে পারছে না।"(২খ,২৮৭পৃ)

দেখা যায় অনন্ত তার ভুল শুধরে নেবার প্রয়াস চালাচ্ছে। এই উদ্যোগের কারণে অনন্ত চরিত্রটি একেবারে একরৈখিক হয়ে যায় নি। অহংকারের ফাঁক গলিয়ে কখনো জেগে উঠেছে তার হৃদয়। তাদের প্রেম ব্যর্থ হওয়া সম্পর্কে তাই তার মূল্যায়ন—

> "চিত্রা আমার এতদিনের সমস্ত আচরণকে বিকৃত করে তার নারীত্বের মর্যাদার প্রতি অপমানের চেষ্টা বলে ভুল করলে কেন ? যেখানে কোন বাধা ছিল না, সেখানে আমরা যুক্তিহীন প্রাচীর গড়ে এমন করে পরস্পরকে দূরে ঠেলে রাখলাম কেন ?"(২খ, ২৮৫পৃ)

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মানবিক অনুভূতিগুলো জেদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরাবর জেদই বড় সংকট হিসেবে সামনে আসছে। অনন্তের এই আহ্বানেও চিত্রা সাড়া দেয় নি। শেষবার অনন্ত চেষ্টা চালায় আসামে জিতেনের বাড়িতে গিয়ে। যেখানে মাসিমা ও চিত্রা আশ্রয় নিয়েছে চিত্রার বাবা মারা যাওয়ার পর। সেখানেও অনন্ত প্রয়োজনীয় সময়ে জেদকে সংবরণ করতে পারে না। পুনরায় আহত করে চিত্রার মনকে। চিত্রার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বলেছিল—

> "আর কে বলে ভুল করেছিলে, চিত্রা ? জিতেন বাবু ? তাহলে আমারই বা দোষ কি, চিত্রা ? তোমার যে গভীর রাত্রে এমন করে জিতেনবাবুর পা জড়িয়ে কাঁদার অভ্যাস আছে তা আমি আর কী করে জানব।" (২খ, ২৯২পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

অনন্ত বারবার একই ভুল করছে দেখা যায়। এই ভুল সে করেছে তার পারিবারিক অবস্থানের কারণে। আর এটি অনন্ত চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তবে এ কথাও ঠিক যে অনন্তের চরিত্রে বৈপরীত্যও দেখা যায়। দশ বছর পরেও তার সে বৈপরীত্য দূর হয় নি। যা অনন্ত চরিত্রটিকে জটিল করে তুলেছে। এই জটিলতা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা মানুষের। কেননা এই শ্রেণির মানুষ যা সঙ্কট তৈরী করে মনের মধ্যে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তা করে না। এটি এ শ্রেণির মানুষের পরিণত আচরণ। যৌবনে যা দোলাচল করে বৈপরীত্যের মাঝে। অনন্তও এমন আচরণ করেছে। দশবছর পর চিত্রার চিঠি পেয়ে তার অবস্থান তুলে ধরেছে এভাবে—

> "আজ দশ বছর পরে সেই মেয়েটির চিঠি এসেছে। এবং সে চিঠি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছি। প্রেমের চেয়ে অহংকারকে আমরা বড়ো করেছিলাম। সে অহংকার আমাদের হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারেনি। হৃদয় হয়তো আজও তৃষিত। কিন্তু আজকের বাতাস সে দক্ষিণের নয়— উত্তরের !"(২খ, ২৯২পৃ)

অধরদাস *দৃষ্টি* গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও ব্যতিক্রমী চরিত্র। সে পেশাগতভাবে নয় মনন-মাধুর্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে চিত্রশিল্পী। প্রকৃত শিল্পী মনের অধিকারী। তাকে নির্দিষ্ট কোনো ছকে মাপবার সুযোগ নেই। উদাস ও ছন্নছাড়া স্বভাবের কারণে কোনো বাধাই তাকে আটকে রাখতে পারে না। কথক, রক্ষিত, তরলা ও অধরদাস এ চারজনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে গল্প। তরলা অধরধাসের স্ত্রী। উষাপতি রক্ষিত অবিষ্কার করে অধরদাসকে। উষাপতি রক্ষিত ছবির মাল-মশলা সেখানে খুঁজছে কিনা গল্পকারের এমন এক প্রশ্নের জবাবে সে জানায়—

> "খুঁজছি না ভাই, পেয়েছি। একেবারে সোনার খানি।" (২খ, ১৫৪পৃ)

এই সোনার খনি আর কেউ নয় আমাদের আলোচিত চিত্রশিল্পী অধরদাস। অথনৈতিক সংকটে সে মানুষ হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে তাকে বাপ-পিতামর প্রতিমার চালচিত্র আঁকার পেশা ছেড়ে দিয়ে কাজ নিতে হয়েছে কারখানায়। একদিন প্রতিমার চালচিত্র দেখে উষাপতি রক্ষিত তাকে নিয়ে যায়। শুরু হয় তার ছবি আঁকা। গল্পকার অধরদাসকে দেখেছে এভাবে—

> "চেহারা আজীবন হাড়-ভাঙা খাটুনি-খাটা পেট-ভরে-খেতে-না-পাওয়া সাধারণ মজুর মিস্ত্রীর, চোখের দৃষ্টি স্রষ্টা কোনো দেবতার। হয়তো আমার মনের ভুল। হয়তো হাতের কাজের কিছু নমুনা দেখবার পর আমার শ্রদ্ধা বিস্ময়ের মোহঘোর আমায় অমন করে তাকে দেখিয়েছে।"(২খ, ১৫৬পৃ)

তরলা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "ময়লা রঙ, দোহারা গড়ন, মুখ, চোখ এমন কিছু নিখুঁত নয়, কিন্তু সব-কিছু ছাড়িয়ে যেন কালো আগুনের শিখা, পুরুষের পতঙ্গ-প্রাণের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

> দুর্নিবার যার আকর্ষণ। গরিব দিন-মজুরের স্ত্রী, পোশাক-প্রসাধন তারই অনুযায়ী। কিন্তু তরলার মতো মেয়ের সম্পর্কে সেসব যেন অবাস্তব, এমনকি তার অশিক্ষিত গ্রাম্য কথার টান পর্যন্ত। "(২খ,পৃ:১৫৬)

অর্থনৈতিক সঙ্কট থাকলেও অধরদাসের রক্তে জড়িয়ে আছে ছবি আঁকার ইতিহ্য। পারিবারিক সূত্রে সে এই ঐতিহ্যের অধিকারী। স্বাভাবিকভাবে এই অধরদাসের হাতে বেরিয়ে আসে বেশ কিছু মূল্যবান ছবি। তার স্ত্রীর সৌন্দর্য সম্পর্কে গল্পকথকের মূল্যায়ন—

তরলার স্বাভাবিক জীবনবোধ বিদ্যমান ছিল। সৌন্দর্যের পাশাপাশি সহজাত গুণেরও অধিকারী। এ সম্পর্কে গল্পকথকের অভিমত—

> "হয়তো তরলা নিজের মহিমা জানে। নয়তো আদিম প্রকৃতির স্বাভাবিকতা তার সহজাত। যে হাসি দিয়ে আমাদের সে অভ্যর্থনা করল নিজের মন দিয়ে যেকোনো ব্যাখ্যা তার করা যায়।"(২খ,১৫৬পৃ)

এমন পরিস্থিতিতে অধরদাসের সন্তুষ্ট থাকবারই কথা। কিন্তু অধরদাস সে স্বভাবের নয়। তাই সে একদিন রক্ষিতকে জানিয়ে দেয় তার দ্বারা কিছু হবে না। কারখানাই তার ভালো। এ অবস্থায় রক্ষিত তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। সে তার ছবির প্রদর্শনী আয়োজন করার প্রস্তাব দেয়। উষাপতি তাকে আরো জানায় তার কাজ দেখলে দেশ-বিদেশের গুণীদের তাক লেগে যাবে। রক্ষিতের এ কথা সে অবিশ্বাস করে নি। তবে সে জানিয়েছে তাদের চোখকে ফাঁকি দিলেও যে নিজের চোখকে ফাঁকি দিতে পারছে না। নিজের আঁকা শিল্পকর্ম সম্পর্কে তার মূল্যায়ন—

> "ফাঁকি, রক্ষিতবাবু সব ফাঁকি। তুমি আমার তুলির টান দেখ, দেখ আমার রঙের ছোপ। ও তো আমায় শিখতে হয় না, ও আছে আমার বাপ-পিতাম'র থেকে পাওয়া রক্তে। কিন্তু চোখ আমার কই ? যা তারা দেখে গিয়েছিল তাই আমি দেখছি তাদের চোখে। তাদের দুনিয়া আর আমার দুনিয়া তো এক নয়। আমার নিজের দুনিয়াকে দেখতে শিখলাম কই ?"(২খ,১৫৭পৃ)

অধরদাসের এ মন্তব্য তাকে শুধু শিল্পী হিসেবে সীমাবদ্ধ করে রাখে না। সে প্রকৃতপক্ষে একজন দার্শনিক। চিন্তার পরিধি তাকে এ মর্যাদা দেয়। শুধু আত্ম মূল্যায়নে সে পারদর্শিতার পরিচয় দেয় না তরলা সম্পর্কেও সে নিখুঁত মূল্যায়ন করেছে। তরলার ঐশ্বর্যের প্রতি যে মোহ আছে এটা সে বুঝতে পারে। তরলা সম্পর্কে অধর রক্ষিত বলেছে—

> "তুমি বরং তরলাকে নিয়ে যাও রক্ষিতবাবু। ওর প্রাণে অনেক শখ। কিছুই তার মেটেনি।"(২খ,১৫৭পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

চটকল ছেড়ে যাবার আগে তার আঁকা সব ছবি রক্ষিতবাবুকে দেয়ার জন্য তরলাকে দিয়ে গেছে। এ সময় সে রক্ষিতকে জানাতে বলেছে—

> "-----বলিস এসব তারই আঁকা ছবি, আমি নিমিত্ত মাত্র। তারই ঝড়,
> আমার ডালপালা শুধু তাতে দুলছে।"(২খ,১৫৭পৃ)

অধর সুদৃঢ় মানসিকতার অধিকারী। সে একবার যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সে আর পাল্টায় নি। তরলা স্বামীকে বুঝতে পেরে তাকে ছাড়তে না চাইলেও অধর তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এ সময় শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে তরলাকে বলেছে—

> "কোথায় যাব জানি না, কিন্তু ছাড়তে আমার হবেই— তোকে, সকলকে,
> তবে যদি আমার নিজের দুনিয়াকে দেখবার চোখ ফোটে।"(২খ,১৫৭পৃ)

এখানে অধরদাসের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাতে তাকে বিত্তহীন শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যদিও মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশের তার ক্ষমতা ছিল। কেননা তার আঁকা ছবি দিয়ে রক্ষিত অর্থ ও পরিচিতি দুই-ই পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত রক্ষিতের অবস্থান ছিল উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে। নিম্ন বর্গের একজন মানুষ যে প্রতিভাবলে উচ্চবিত্ত সমাজে প্রবেশ করতে পারে না এমন নয়। সমসাময়িককালে আমাদের সামজে এমন উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে। অধরের এমন সুযোগ ছিল। কিন্তু সুযোগ সে গ্রহণ করে নি। নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে এমন অনেক মেধাবী মানুষ রয়েছে যারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার জন্য লালায়িত নয়। অধরদাস তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ অতি সচেতনতার কারণে কখনো আত্মবিনাসী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সে কারণে স্বভাবগত বিবেচনায় অধরকে নিম্নবর্গের ব্যতিক্রমি মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা য়ায়।

শরতের প্রথম কুয়াশা গল্পের নায়ক নিরঞ্জন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান উডকাঠের কাজ করে। চিত্রশিল্পী হলেও তার অর্থের তেমন প্রাচুর্য নেই। এই নিরঞ্জন একদিন নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে গিয়েছিল পরিতোষ লাহিড়ীর ছবির একজিবিশনে।

পরিতোষ লাহিড়ী সেখানে অনেকের মাঝে নিরঞ্জনকে পরিচয় করিয়ে দেন অতসী ঘোষের কাছে। অতসী ঘোষ ফ্যাশন সচেতন নারী। সে ফ্যাশন সম্পর্কে ভালো লেখে। তার ফ্যাশন সম্পর্কিত ইংরেজি লেখাগুলো সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে অভিজাত ইংরেজি সাপ্তাহিকে পড়ার জন্য কলেজের মেয়েরা উদগ্রীব হয়ে থাকে। প্রতিদিন যার সম্বন্ধে নতুন গুজব ও কুৎসা রটে। বড় ঘরের ছেলেরা নানান আলোচনায় মাতে। তারা অতসী ঘোষ বলতেই পাগল; দু' একজন তাকে দেখে হতাশও হয়। সেই অতসী ঘোষ তাকে সেই সময় চিনে বলে জানিয়েছে। উচ্ছ্বসিতভাবে তার ,সঙ্গে হেসেছে, কথা বলেছে। শুধু তাই নয় নিরঞ্জনের সঙ্গকে পছন্দও করেছে। অতসী ঘোষের সঙ্গে সেদিন নিরঞ্জন মেতে উঠে আলাপচারিতায়।

Dhaka University Institutional Repository

এসময় অতসী ফ্রয়েডের সেক্সলজির প্রসঙ্গ তুলে ফ্যাশন নিয়ে আলোচনা করেছে। অতসী ঘোষ যখন কাউকে লিফট দেয়ার কথা বলেছে তখন মনের অজান্তে নিরঞ্জনই লিফট দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। অতসী ঘোষও তাতে রাজি হয়েছে। এ সময় নিরঞ্জন অনেকটা দ্বিধায় পড়ে যায়। তা টের পাওয়া যায় তার এ মনোভাব থেকে—

> "সবাই তাকে কী ভাবছে, তার পেছনে সবাই কী বলবে, পরিতোষ লাহিড়ীর ঈষৎ বাঁকানো ঠোঁট দেখেই সে বুঝতে পেরেছে। এর ওপর অতসীই যদি না যেতে চায় ?"(২খ, ৯৪পৃ)

লিফট দেয়ার কথা বলেও সে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। কেননা অতসীর মত কাউকে লিফট দিতে হলে ট্যাক্সির প্রয়োজন। কিন্তু তার তো গাড়ি নেই। ট্যাক্সি খুঁজতে গিয়ে কেলেঙ্কারি বাধে। অনেকক্ষণ পরে সে ট্যাক্সি খুঁজে পায়। দেরি হওয়াতে সে ভয় পায় অতসী যদি চলে যায়। কিন্তু অতসী ঘোষ তখনো অপেক্ষা করে। বিরক্ত না হয়ে উল্টো জানায় যে, সে নিরঞ্জনকে কষ্ট দিয়েছে।

ট্যাক্সিতে যাওয়ার সময় তারা শরতের প্রথম কুয়াশা দেখতে পায়। আজকের এই দিনটা যে নিরঞ্জনের কাছে অনেক রহস্যময় তা জানাতেও ভুল করে না। সে অতসীর সাহচর্যকে উপভোগ করে, মুগ্ধ হয় তার আচরণে। তাই নিরঞ্জন পথটাকে দীর্ঘতর করার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেছে। সে এই সন্ধ্যাকে হিসাব করে খরচ করতে চায় নি। অবশ্য অতসী এই তারণ্য ও আগ্রহকে পজিটিভভাবে গ্রহণ করে। অতসীর হাসি ও দৃষ্টিতে নিরঞ্জন সাহস পায়। তাই ট্যাক্সি ঘুরাতে বলে। নিরঞ্জন অর্ধেক রাত কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারত। কিন্তু সে সামর্থ্য না থাকায় তাকে হোটেলে ঢুকতে হয়, অনেকক্ষণ এক সঙ্গে থাকার বাসনা পূরণ করতে। এই উদ্দাম ভালোবাসায় নিরঞ্জন জয় করে অতসীর মন। বিছানায় শুয়ে সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে গভীর আনন্দে পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় বাধা পায়। এই স্বাভাবিক ঘটনাগুলোকে সে স্বাভাবিক ভাবতে পারে না। অতসী এসব কিছুকে তামাসা হিসেবে নিয়েছে বলেই সে এখন বিশ্বাস করতে চায়। এরপর অতসীর কাছে আর তামাসার খোরাক হতে চায় না। নিরঞ্জনের এই আচরণের মধ্যে মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও হতাশাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তার আকাঙ্ক্ষা আছে রঙ্গিন স্বপ্নকে ধরার কিন্তু সাহস নেই। নিরঞ্জনের এ আচরণ মধ্যবিত্তের সাহসহীনতার প্রমাণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মন জয়ের সামর্থ্য আছে কিন্তু সাহস নেই। অনেক বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাকে তারা সত্য হিসেবে গ্রহণ করার সাহস পায় না। তা পারে না বলে হারাতে হয় কাঙ্ক্ষিত জনকে। যেমন অতসী উত্তাল ভালোবাসার কাছে ধরা দিয়েছে কিন্তু নিরঞ্জন সাহসহীনতার কারণে অগ্রসর হতে চায় নি। এখানেই নিরঞ্জনের ট্র্যাজেডি। নিরঞ্জন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাহসহীন মানুষের সুযোগ্য প্রতিনিধি।

জনৈক কাপুরুষের কাহিনী গল্পে আছে দুর্বল চিত্ত পুরুষের কাহিনী। এ গল্পের নায়কের সঙ্গে কলকাতায় পড়াকালে সম্পর্ক গড়ে উঠে করুণা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে। কলেজে পড়াকালে করুণা তাদের সম্পর্ক রক্ষার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। কেননা তাদের সম্পর্কের

Dhaka University Institutional Repository

কথা জেনে যাওয়ায় করুণাকে পাটনায় মামার বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু দুর্বল চিত্ত নায়ক করুণার এ আহ্বানে সারা দিতে ব্যর্থ হয়। করুণার এ আহ্বানে কেনো সে সারা দিতে পারে না তা নিজে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে—

> "তার ঠাণ্ডা একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। হ্যাঁ, বেদনা সেদিন আমার হৃদয়েও ছিল, কিন্তু করুণার উদ্‌বেল আবেগের তুলনায় সে বুঝি কিছু নয় ! আমার ভালোবাসার মধ্যে সে-উদ্দামতা ছিল না যা ভাগ্যের বাধার বিরুদ্ধে উদ্ধৃত বিদ্রোহ করতে পারে।"(২খ, ২২২ পৃ)

সত্যিই প্রেমের জন্য বিদ্রোহী সে হতে পারে না। পারে না করুণার মন জয় করেও তাকে ধরে রাখতে। তার এ ব্যর্থতায় করুণাকে পাটনায় যেতে হয় এবং তার বিয়েও হয়ে যায়। এ বিয়ের সংবাদ পাওয়ার পর নায়কের মনে বেদনা জেগেছিল । তাও সৃষ্টি হয়েছিল করুণার জন্য এবং নিজেকে সেজন্য গর্বিত মনে করেছিল।

এরপর আবার তাদের দুজনের সুযোগ হয়েছিল প্রেমকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার। এ ক্ষেত্রে পথ তৈরী করেছিল করুণা। করুণা ঘর ছেড়েছিল এজন্য। স্টেশনে এসেই করুণা জানায়—

> "দলিল পুড়িয়ে দিয়ে এলাম।"(২খ, ২২৭ পৃ)

যে দলিল ছিঁড়ে ফেলার কথা নায়ক বলেছিল কথার ছলে। এ ছলের সুযোগ হয়েছিল একদিন বাঙলা ভাষাভাষি অঞ্চল থেকে দূরে টাঙ্গায়। সেখানে গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় করুণার স্বামী বিমলবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বাঙালি জেনে তিনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়িতে যাওয়ার পর বিমল জানতে পারে তারা একে অপরের পরিচিত। করুণাই এ পরিচয় দিতে দ্বিধা করে নি। এরপরে সেখানে করুণার মনের অর্গল দ্বিতীয় বার ভেঙেছিল। কিন্তু তা সফল পরিণতি পায় না। নায়কের চরম ভীরুতায় ছল করে করুণাকে বাড়িতে ফিরতে হয়। এখানে নায়ক তার ভীরুতা প্রকাশ করেছে এভাবে—

> "করুণা কাতরভাবে মুখের দিকে চেয়ে আছে। কী বলব ? কী এখন বলতে পারি ! নির্বোধের মতো আমিই তার রুদ্ধ বন্যার বাঁধ খুলে দিয়েছি, এখন তাকে কেমন করে ফিরিয়ে দেব ? কিন্তু সব কথা তুমি বোধ হয় ভালো করে ভেবে দেখনি করুণা। যে-ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবে সইতে ? তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে শুরু করব।"(২খ, ২২৭ পৃ)

সব বাঁধন ছিন্ন করে আসার পর এ ধরনের উপদেশ করুণাকে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়। সত্যিইতো এমন দুর্বল চিত্ত মানুষের তরীর সহযাত্রী কী হওয়া যায় ? যায় না। শুধু ঝড়ে পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

চোখ ভরা অশ্রু ও বুক ভরা কান্না। কিন্তু শিক্ষিত মেয়ে করুণার তাও প্রকাশ করার উপায় থাকে না।

এ গল্পের নায়কের কারণে দু দুবার ব্যর্থ হয় নায়িকার প্রেমকে সফল করার প্রয়াস। এ ক্ষেত্রে সর্বোতভাবে ফুটে উঠে নায়ক হিসেবে এক দুর্বল চিত্ত মানুষের। এই দুর্বলতা নিয়ে এমন উত্তাল প্রেমের সফল পরিণতি টানা যায় না। নায়কও পারে নি। তবে নায়কের এই ব্যর্থতার কারণে করুণার জন্য পাঠক মনে বয়ে যায় করুণার অশ্রু ধারা।

মল্লিকা গল্পের মূল নারী চরিত্র মল্লিকা। অসাধারণ শুধু রূপে নয় মানসিক দিক দিয়েও বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম জটিল চরিত্র। বৈপরীত্যময় পরিবেশে তার অবস্থান। তার মানসিক গতিবিধি নির্ণয় করা খুব সহজে সম্ভব নয়। তার কথা ও কাজে চরম বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। প্রথম থেকে মল্লিকাকে দেখা যায় একটি রহস্যের জালে জড়িয়ে থাকতে। এই প্রয়াস সচেতন ও অচেতন দুভাবে ঘটেছে। সুবিকাশ অনেকদিন বুঝতেই পারে নি যে মল্লিকা শ্রীপতির স্ত্রী। এ সত্য উদ্‌ঘাটনে গল্পের এ অংশটুকু উল্লেখযোগ্য—

> "মল্লিকা মাথায় ঘোমটা দেয় না, সিঁদুরও পরে না। শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে তার বয়সের তফাতও এমন যে, সত্যকার সম্পর্কটা অনুমান না করতে পারাটা অস্বাভাবিক নয়।
>
> আর যাই ভাবুক, মল্লিকা শ্রীপতির স্ত্রী হতে পারে, সে কল্পনাও করেনি।"(২খ,২৩৪পৃ)

মল্লিকা দেখতে সুন্দরী। তার রূপ সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন। গল্পের নায়ক সুবিকাশ প্রথম দর্শনেই তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল তাকে সূক্ষ্মতম কবিতার ভাষা দিলেও বুঝি অপমান করা হয়।
মল্লিকা পরিশীলিত মনের অধিকারী। ভাঙাচোরা সংসারকে সে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। তবে মল্লিকা এখানে যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছে তা বর্তমান অবস্থার সাথে মানানসই নয়। এটা হয়তো এমন পরিবেশেও সম্ভব। তবে তা এত নিখুঁত হতে পারে না। এ অবস্থার সাথে তা হয়তো কখনো কখনো বেমানান হতে পারতো। কিন্তু মল্লিকার ক্ষেত্রে তা হয় নি। এটা না হওয়ার কারণ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা। কেননা পরে জানা যায় যে মল্লিকা উচ্চবিত্ত শ্রেণি থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীপতিকে বিয়ে করেছে।

মল্লিকার মধ্যে কোনো জড়তা ছিল না। শ্রীপতি একদিন মাত্র মল্লিকার সঙ্গে সুবিকাশের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এ কারণে শ্রীপতির অনুপস্থিতিতে সুবিকাশের সঙ্গে মল্লিকা স্বাভাবিক আচরণ করেছে। বাইরে বের হওয়ার সময় সুবিকাশের সঙ্গে তার দেখা হলে বাসায় নিয়ে এসেছে স্বাভাবিক ভদ্রতা প্রকাশে।

Dhaka University Institutional Repository

মল্লিকা সহজ আচরণ করলেও তার অবস্থান ও সংস্কৃতিগত কারণে সরল প্রকৃতির নারী ছিল না। মানসিকভাবে সে বেশ জটিল প্রকৃতির। সে জটিলতা স্পর্শ করেছিল সুবিকাশকেও। মল্লিকা সম্পর্কে সুবিকাশের মানসিক প্রতিক্রিয়া ছিল এমন—

> "কতক্ষণ শ্রীপতির জন্যে অপেক্ষা করবে বসে ? অপেক্ষা করবেই বা কেন ? বসে থাকাটাই অসহ্য, বিশেষ এই ঘরে, পাশের ঘরেই মল্লিকা আছে জেনে। পাশের ঘরে এবং অসীম সমুদ্রের ওপারে।"(২খ,২৩৫পৃ)

মানসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, অসীম সমুদ্রের ওপারে যেমন সব কছু মানুষের কাছে রহস্যময় তেমনি মল্লিকা সুবিকাশের কাছে রহস্যময়ী ।

শরতের প্রথম কুয়াশা গল্পের অতসী নিঃসঙ্গ এক নারী চরিত্র। খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করলেও ভালোবাসাহীনতা তাকে অসহায় করে তোলে। হতাশা মধ্যবিত্ত এই নারীর অন্যতম সংকট। এই হতাশা কাটিয়ে উঠার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে সে ব্যর্থ হয়। অথচ তার মানসিক অগ্রগতির যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে তার এমন সংকট পাঠকমনে সন্দেহের পাশাপাশি তার দূরদৃষ্টির অভাবকে প্রকট করে তোলে। এমন বক্তব্যের যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান। কেননা লেখক তাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন অতি সচেতন ও স্মার্ট নারী হিসেবে। লেখক জানিয়েছেন অতসী অতি আধুনিক ও ফ্যাশন সচেতন। শুধু তাই নয়, সে ফ্যাশন সম্পর্কে সে সময়ের সবচেয়ে দামি অভিজাত ইংরেজি সাপ্তাহিকে লেখে। যে পত্রিকার জন্যে ঐ সময়ের কলেজপুড়ুয়া মেয়েরা উদগ্রীব হয়ে থাকে। তিন বেলা তিন খানা মোটর যারা ব্যবহার করে তাদের মহলেই অতসী ঘোষকে ঘিরে তৈরী হয় নতুন গুজব ও কুৎসা। এমনি সাড়া জাগানো অতসী হঠাৎ উপস্থিত হয় রিক্ত ও হাহাকার মথিত এক নারী হিসেবে। টের পাওয়া যায় তার হাড়ির খবর। দেখা যায় তার হৃদয়ের ঘর-দুয়ার একেবারে শূন্য। তার হৃদয়ে সে জমিয়ে রাখতে পারে নি কারো ভালোবাসা। তার জন্য কারো মনেও নেই ভালোবাসা। এমন পরিস্থিতি সত্যিই একজন নারীর জন্য বেশ কষ্টকর। আর সেই নারী যদি তার এই সংকট পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারে তাহলে তা হয়ে উঠে বিভীষিকার মতো। যেমনটি হয়েছে অতসীর ক্ষেত্রে। কেননা অতসী মানবমনের গোপন রহস্যের কথা জানে। সে জানে কিসে অপূর্ণ থাকে নারীর জীবন।

অতসীর এই সমস্যার কথা জানা যায় অখ্যাত এক তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে। সে তরুণ গভীর উন্মাদনার সঙ্গে ভালোবাসে অতসীকে। প্রাণবান এই তরুণের ভালোবাসার জালে আটকা পড়ে অতসী। এক সন্ধ্যায় পরিতোষ লাহিড়ীর প্রাইভেট ছবির এক্সিবিশনে পরিচয় হয় অতসীর সঙ্গে শিল্পী নিরঞ্জনের। পরিতোষ লাহিড়ীই পরিচয় করিয়ে দেন অতসী ও নিরঞ্জনকে। সেদিন অতসী ও নিরঞ্জন দুজনে অনেকক্ষণ এক সঙ্গে কথা বলে। বলা যায়, অখ্যাত নিরঞ্জনকে ইচ্ছে করেই অতসী সময় দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি নিরঞ্জনের সঙ্গে ছবি নিয়েও আলোচনা করে। এসময় আর্ট ও শিল্পী সম্পর্কে এই ফ্যাশন সচেতন নারী তার মন্তব্য তুলে ধরে। একটি ছবি সম্পর্কে তার তীর্যক সমালোচনা ছিল এমন—

> "আচ্ছা ফ্র্যাঙ্কলি, এই নকল বর্বরতা নতুন রকম ন্যাকামি বলে মনে হয় না আপনার? বেশ একটু আন্‌হেল্‌দি? যেমন ধরুন কাফ্রী মেয়েটা সমস্ত কাফ্রীজাতের অপমান নয় কি? ও তো ফ্রয়েড-পড়া সেক্সলজি-ঘাটা আর্টিস্টের মনের একটা প্যাথলজিক বিকার!" (২খ, ৯৪পৃ)

এরপর এই অতসী আলোচনার এক পর্যায়ে সবার সামনে লিফট চাইলে নিরঞ্জনই রাজি হয়। তারপর নিরঞ্জন মনের অজ্ঞাতে হোটেলে বসার কথা বললে অতসী তাও রক্ষা করে। হোটেলে যাওয়ার প্রস্তাব ওঠার আগে তাদের মধ্যে বেশ কঠিন আলাপও হয়। তবে তা আকারে ইঙ্গিতে। অতসীর এই আচরণকে নিরঞ্জন স্বাভাবিক মুহূর্তে ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে দেখতে সাহস করে নি। তার কাছে মনে হয়েছে এ অতসীর একদিনের খামখেয়ালি আচরণ। এই আচরণ খাম-খেয়ালির প্রকাশ ছিল না অতসীর কাছে। অতসীও বাসায় গিয়ে সেই সন্ধ্যার কথা ভেবেছে। এ সময় তাকে হতাশা গ্রাস করে। হতাশা গ্রাস করে একারণে যে এর আগেও সে অনেকবার অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা প্রথমবারের মতো। অনুভূতিকে স্থায়ী করার তার সাহস নেই। এখানে সে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। অতসী শেষ ভালোবাসাকে অক্ষত অম্লান রাখতে চায়। সেই সন্ধ্যা অতসীর কাছে যেভাবে দাগ কেটেছে তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এভাবে—

> "সেও ভাবছে বই কি সমস্ত সন্ধ্যাটার কথা। এমন সন্ধ্যা তার জীবনে বিরল হয়ে এসেছে। হয়তো আর আসবে না। নগরের ওপর শরতের প্রথম কুয়াশা আবার নামবে কিন্তু এমন উদ্দাম যৌবনের সান্নিধ্য, যৌবনের এমন উচ্ছ্বসিত স্তুতি সে পাবে না।" (২খ, ৯৬পৃ)

মানুষের চোখ ধাঁধাতে গিয়ে অতসী কাউকে স্থায়ীভাবে ভালোবাসতে পারে নি। কামনা-বাসনা প্রেমকে সে ব্যবহার্য উপকরণে পরিণত করে। যেকারণে ভালোবাসাকে গভীর ও স্থায়ী করার তার কোনো উদ্যোগ নেই। এক্ষেত্রে সে মানসিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে। তাই আজ ভালোবাসার স্বপ্ন দেখতেও ভয় পায়। তাই তরুণ ভালোবাসাকে জীবন্ত করে রাখতে চায় তার কাছে অধরা থেকে। অতসীর এ সিদ্ধান্ত আধুনিক ও জীবনমুখি বলে প্রতীয়মান হয় না। বরং অতসীর মতো আধুনিক মেয়েকে ভিন্নভাবে দেখার প্রত্যাশা জাগা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তার হার মানাটা ঠিক হয় নি। ভালো হতো যদি তার দুর্বল দিকগুলো অপসারণ করে নিজেকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতো।

অমীমাংশিত গল্পের অপর্ণাকে আর্থিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় না। স্বল্পভাষী সুন্দরী অপর্ণা স্বামী সংসার নিয়ে সুখী । তবে তার সংসারেও যে জটিলতা স্পর্শ করে না এমনটি

Dhaka University Institutional Repository

নয়। এই জটিলতা আসে স্বামীর দিক থেকে। স্বামী পূর্ব প্রণয়ের কিছু চিঠি নিয়ে জটিলতার মুখোমুখি হয়। এটি ঘটে এভাবে— একদিন অপর্ণার স্বামী প্রকাশ অফিসে যাওয়ার আগে খেতে বসে ড্রয়ার থেকে একটি নীল মলাটের নোট বই বের করে ফোলিও ব্যাগে দিতে বলে। যেটি গোটা দুই ফাইলের নিচেই ছিল। সে রোজ এটি নিতে ভুলে যায় বলে অপর্ণাকে সেদিন দিতে বলেছিল।

খাওয়ার পর ঘরে ঢুকে প্রকাশ বিস্মিত হয়। সে দেখে সুতা দিয়ে বাঁধা চিঠিগুলো খামহীন খোলা পড়ে আছে। লেখাগুলো অস্পষ্টও নয়। দূর হতে চিঠিগুলোর যতটুকু পড়া যায় তাই কৌতূহল জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট। যা লক্ষ না করে উপায় নেই। তাই সে দ্রুত চিঠিগলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখে । চিঠিগুলো অপর্ণার মুখোমুখি হতে প্রকাশকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়। সে সারাদিন অফিসে এই ভেবে শংকিত হয় যে, তার সুখের সংসারে বুঝি আগুনের হল্কা লাগল। চিঠিগুলো অপর্ণা পড়েছে কি না তার কোন সঠিক বক্তব্য নেই। সেদিন অনেক দুশ্চিন্তার পর রাতে প্রকাশ বাসায় ফিরলে অপর্ণা বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নি। তার আচরণ একেবারে স্বাভাবিক যেনো কোনো কিছুই ঘটে নি। প্রকাশ নিশ্চিত যে অপর্ণা চিঠিগুলো দেখেছে এবং তার মনে কোনো আঘাত না পাওয়ায় প্রকাশের জীবন বিষাক্ত হয়ে যায়। প্রকাশ মনে করেছে যে, অপর্ণার জীবনে তার স্থান অতি নগণ্য বলে এ বিষয়টি তার মনে কোনো রেখাপাত করে নি। এ ক্ষেত্রে প্রকাশের মনে এমন প্রশ্ন জাগে—

> "এ নিদারুণ সন্দেহের কেমন করিয়া মীমাংসা হইবে ? মীমাংসার কোনো উপায়ই যে নাই! চিরদিন মৌন থাকিয়া এ সন্দেহের অবিরাম দাহনে তিলেতিলে দগ্ধ হইতে হইবে।" (২খ, ১১১ পৃ)

তবে অপর্ণা চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ তুলে ধরেছে তাতে চিঠিগুলো যদি অপর্ণা দেখে থাকে তাহলে প্রতিক্রিয়া না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা অপর্ণা কোনো কিছু বুঝে না এমন নারী নয়। প্রকাশ এক বছরেও অপর্ণার স্বরূপ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে নি। প্রতিবার তাকে সে নতুনভাবে দেখেছে। প্রকাশ অপর্ণাকে দেখেছে এভাবে—

> "সত্যিই, সে দৃষ্টি তাহার কাছে এখনও দুর্জ্ঞেয়; বুঝি দৃষ্টির সেই অস্ফুট বিষণ্নতার সহিত পাতলা ঠোঁট দুটির ইষৎ ব্যাঙ্গের আভাস জড়িত ভঙ্গিমার অপরূপ অসামঞ্জস্যের দরুন। অপর্ণার মুখ কোমল কিন্তু নিছক সারল্যের বর্ণহীন কোমলতা সেখানে নাই ; অপর্ণার দৃষ্টি শান্ত কিন্তু অতল হৃদয়ের মতো, তাহার গভীরতায় যেন বহু যুগের বহু জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া আছে। অপর্ণা কাছে বসিয়াও কোথায় যেন সুদূর।"(২খ, ১০৮ পৃ)

প্রকাশ এও জানায় যে অপর্ণা নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখতে ভালোবাসে। অপর্ণা নিজেকে গুটিয়ে রাখলেও সংসারে নিস্তরঙ্গ নয়। স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় অপর্ণা অত্যন্ত সপ্রতিভ ।

Dhaka University Institutional Repository

নানা আলোচনায় সে এর প্রমাণ রেখেছে। অপর্ণার সঙ্গে প্রকাশের বিয়ে না হলে কি হতো এমন প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে সে চাতুর্যের সঙ্গে। সে এর জবাবে বলেছে অন্যত্র হতো। নিচের গল্পাংশে তার মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়—

> "না ঠাট্টা নয়, তোমার সঙ্গে বিয়ে যদি না হত, অথচ হঠাৎ একদিন কোথাও যদি তোমায় দেখতে পেতাম !'
> 'অভদ্রের মতো চেয়ে থাকতে তাহলে?'
> প্রকাশ হাসিয়া বলিয়াছে, 'তাতো থাকতামই, আরো কিছু করতাম বোধ হয়।'
> ' উহু, তাতে সুবিধে হতো না, আইন-কানুন বড্ড কড়া !'
> দুজনেই এবার হাসিয়াছে। প্রকাশ বলিয়াছে, 'আমায় বোধ হয় তুমি লক্ষ্যই করতে না, কেমন ?'
> 'না করারই তো কথা ! সেইটেই শোভন হত না কি ?" (২খ, ১০৮ পৃ)

এই যে সুন্দর যাপিত জীবন তা নেশার মতো লেগেছে প্রকাশের কাছে। এমন পরিবেশের প্রতি তার মোহের কারণে সে এভাবে চিরদিন কাটাতে চায়। অপর্ণার অন্তর্মুখিভাবের ফলে তৈরী হওয়া গ্যাপ পূরণ হয়েছে প্রকাশের উৎসাহের আতিশয্যে। প্রকাশ অপর্ণার সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তকে একটি স্বপ্ন এবং প্রত্যেক সাক্ষাতকে একটা বিজয় হিসেবে দেখেছে।

চিঠিগুলো খোলা অবস্থায় রেখেও অপর্ণার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়ায় তার মানসিকতা নতুনভাবে বিচার করায় সুযোগ তৈরী হয়। তারপর অপর্ণার মৌনতা প্রকাশের কাছে অতি নেতিবাচক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রকাশের সে মনোভাবকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "প্রকাশের মনের ভিতর দিয়া অপর্ণার সহিত বিবাহিত জীবনের ইতিহাস নূতন আলোকে দ্রুতগতিতে ভাসিয়া যায়। অপর্ণার সমস্ত আচরণ–সমস্ত কথারই নূতন অর্থ যেন তাহাতে ফুটিয়া উঠিতেছে !
> অপর্ণা কি চিরদিনই সুদূর নয়। প্রকাশ তাহার নিজের আবেগ ব্যাকুলতার আতিশয্যেই কি চিরদিন সে দূরত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল না ?" (২খ, ১০৮ পৃ)

অপর্ণা সম্পর্কে জেগে ওঠা প্রকাশের এই সন্দেহপ্রবণতা আধুনিক নাগরিক জীবনে অযৌক্তিক নয়। অপর্ণা বুদ্ধিদীপ্ত হলেও বরাবরই অন্তর্মুখি। তবে তার মনে কোনো জটিলতার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না। লেখকও এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা তুলে ধরতে সক্ষম হন নি। আমাদের সমাজে এমন অন্তর্মুখি নারীর অস্তিত্বও রয়েছে যারা বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু নিজের থেকে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না। অপর্ণাও এই শ্রেণিভুক্ত । আর এটি যদি হয় তাহলে অপর্ণার প্রতি নেতিবাচক ধারণা করা প্রকাশের যৌক্তিক আচরণ হবে না। অর্থনৈতিক বিবেচনায় অপর্ণা উচ্চ

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি । অর্থনৈতিক বিষয়ে কোনো মন্তব্য না থাকায় ধরে নেয়া যায় অপর্ণা তার অবস্থানে সুখী।

স্টোভ গল্পের মল্লিকা ভাগ্য বিড়ম্বিত এক নারী। জটিল আত্মদ্বন্দ্ব তার চরিত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তবে মল্লিকার সমস্যা জটিলতর। মল্লিকা চরম আত্মজটিলতার শিকার। যেখানে বাইরের মানুষ নয় নিজেও নিজের জন্য ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। এই জটিলতায় জীবনে নেমে আসতে পারে চরম বিপর্যয়। যেমনটি নেমে এসেছিল মল্লিকার জীবনে। তার বিপর্যয় এসেছে অর্থনৈতিক নয় মানসিকভাবে। অর্থনৈতিক প্রাচুর্য না থাকলেও সংকটও তার নেই। সে গোকুলপুরের মেয়েদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। তার চাকরির আয়েই মধ্যবিত্তের জীবন চালিয়ে নেয়া সম্ভব। শিক্ষা ও রুচিবোধেও সে অগ্রসরমান নারী। শশিভূষেণের বাড়িতে যাওয়ার পাঁচ বছর আগে মল্লিকার সংকট তৈরী হয়। তখন মল্লিকা কলেজে পড়তো। তারই সহপাঠী শশিভূষণের সঙ্গে কলেজেই সম্পর্ক গড়ে উঠে। তৎকালে এটিই নারীর জীবনে অবশ্যই বড় রকমের প্রাপ্তি।

কলেজে কথা বলা সমীচীন নয় জেনে তারা একটি পাথুরে নমুনার মিউজিয়ামে মিলিত হতো। জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেবার জন্যও তারা এই মিউজিয়ামকে বেছে নেয়। মল্লিকাই সেদিন প্রথমে আসে। অনেক দেরিতে আসে শশিভূষণ। মল্লিকাকে সেদিন শশিভূষণ বিয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। এমনকি মার সঙ্গে এ বিষয়ে শশিভূষণ কথাও বলতে পারে নি। মার অনুমতি ছাড়া সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেও অপারগ। শশিভূষণ সেদিন কেনো তার মাকে কিছু বলতে পারেনি তার কারণ হিসেবে সে জানিয়েছে—

> "শরীর খারাপের ওপর মা হয়তো বড়ো বেশি বিচলিত হয় উঠবেন, এই ভয়েই এখনো কিছু বলিনি। আমি জানি মাকে আমি শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারব।"(২খ, ১৬১ পৃ)

শশিভূষণের এই ভিরু উচ্চারণ ও অপরাধীভাব মল্লিকাকে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত করে । তাই সে শশিভূষণকে বলে—

> "শুধু তোমার মাকে বোঝানোটাই কি এত বড়ো ! আমার কি বাড়ি-ঘর আত্মীয়-সমাজ কিছু নেই ? তোমার মার অনুগ্রহের ভিক্ষার ওপরই কি আমার জীবন নির্ভর করছে?"(২খ, ১৬১ পৃ)

মল্লিকার এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্ববোধই মল্লিকার জীবনে সংকট ডেকে আনে। নিজেকে সংযত করাই তার জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল। শশিভূষণ নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না এটা মল্লিকা জানতো। তাই সে যদি আবার উদ্যোগী হয়ে শশিভূষণকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতো তাহলে পরিণতি ভিন্ন হতো। লেখকও এরকমই অভিমত দিয়েছেন। লেখকের ভাষায়—

Dhaka University Institutional Repository

> "শশিভূষণ সেই জাতের মানুষ, নিজের মনকে নিজেই যারা সাহস করে চিনতে চায় না। তাদের পেতে হলে জোর করে আঘাত দিয়ে টেনে নিতে হয়। কী ক্ষতি ছিল সেদিন আর একটু নির্লজ্জ হয়ে শশিভূষণের এই জড়তা ভেঙে চুরমার করে দিলে ? সে জানে, সেদিন চেষ্টা করলে শশিভূষণকে সে আর ফিরে না যেতে দিতে পারত। শশিভূষণের নিজের মধ্যে কোনো প্রেরণা নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলে সমস্ত বাধা, সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মল্লিকাই তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারত। দেয়নি শুধু নারীসুলভ সংকোচ আর লজ্জায়। আর বুঝি একটু আহত অভিমানে। কি ভুলই সেদিন করেছে !"(২খ,১৬১পৃ)

এরপর শশিভূষণ বিয়ে করে বাসন্তী নামের একটি মেয়েকে। এই বিয়েটাও হয়তো তার পরিবারই দিয়ে দিয়েছে। যেখানে শশিভূষণ ছিল বিয়ের পাত্র মাত্র। সেদিনের পর দীর্ঘ ৫ বছর বাদে মল্লিকা শশিভূষণের বাসায় যায়। যেখান দিয়ে ট্রেন বদল করে মল্লিকাকে যেতে হয় গোকুলপুর স্কুলে। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও মল্লিকা ভুলতে পারে না শশিভূষণকে, এমনকি অন্যত্র বিয়েও করে না। না ভুলতে পারা থেকে মনের অজান্তে সেদিন মল্লিকা চলে আসে বাসন্তী ও শশিভূষণের সংসারে। অবশ্য শশিভূষণ যে এখানে থাকে তা মল্লিকা আগেই জানতো। এ লাইন দিয়ে সে আরো দু'তিনবার গেছে। গাড়ি বদলানোর জন্য চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরিও করেছে। কিন্তু সেদিন সে চলে এসেছে অবচেতন মনে। শশিভূষণের বাড়িতে তার এই চলে আসা তার অবচেতন মনে লালিত ভালোবাসারই প্রকাশ। তবে এখানে এসেও মল্লিকা যে সাফল্য আশা করেছিল তা পুরণ হয় না। আর কিছু না হোক হয়তো শশিভূষণের মন থেকে সে আগুনের ফুল্‌কি এখনো নিভে যায় নি। না তেমনভাবে শশিভূষণকে পায় না মল্লিকা। শশিভূষণ এখনো বড়ো ভীত ও শংকিত। মল্লিকা প্রকাশ করতে না পারলেও শশিভূষণের আচরণে এমনটি ভাবতে বাধ্য হয়—

> "তোমার ভয় নেই, ভয় নেই। পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে আগুন ধরাব বলে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেক দিন নিভে গেলেও একটা-দুটো স্ফুলিঙ্গ হয়তো এখনো আছে, নির্লজ্জের মতো এই আশাই করেছিলাম।"(২খ,১৬০পৃ)

মল্লিকা এমন প্রত্যাশা কেনো করেছে শশিভূষণের কাছে তা বেশ দুর্বোধ্য। শশিভূষণের প্রতি অতিরিক্ত দুর্বলতা থেকে এটি হয়েছে। তার প্রতি চরম দুর্বলতা ছাড়া মল্লিকারও সংসার গড়ে তুলতে কোনো বাধা ছিল না। অন্তত তার পরিবেশ প্রতিবেশ তাই বলে। এ আচরণ মল্লিকাকে একমুখি নারী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে। আর এমন আচরণই মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় শত্রু। একমুখি মনোভাব মানুষকে জীবনমুখি হতে প্রবলভাবে বাধা দেয়। যা মানুষের জীবনে প্রবল আত্মদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। যা হয়েছেও মল্লিকার জীবনে। *স্টোভ* গল্পে ভাঙা স্টোভ ও মল্লিকা যেনো সমার্থক হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙা স্টোভ যেমন কারো জীবন কেড়ে নিতে পারে বাসন্তীর জীবনে মল্লিকাও হয়ে উঠেছিল তাই। তবে মল্লিকার এখানে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ বা ভূমিকা ছিল না। এজন্য দায়ী ছিল শশিভূষণের আপাত নির্লিপ্ততা। যা বাসন্তীকে জ্বালিয়েছে। মনের জ্বালায় বাসন্তী স্টোভ দুর্ঘটনায় মরতেও চেয়েছিল। মল্লিকাকে দেখার পর বাসন্তীর জ্বালা দূর হয়েছে। বাসন্তী আর মরতে চায় না। কিন্তু ভাঙা স্টোভও আর নিভতে চায় না। হিংস্র উন্মাদের মতো গর্জন করছে। এ আগুন আর কিছু নয় মল্লিকার মনে পলে পলে জমে থাকা আগুনের হিংস্ররূপ। এই আগুন মল্লিকাকে বেশি করে জ্বেলেছে তার কারণ মল্লিকার আত্মদ্বন্দ্ব। মল্লিকা মনে করে সে উদ্যোগী হলে এই পরিস্থিতি ভিন্ন হতো। অর্থাৎ শশিভূষণ নয়, আজ সে এজন্য নিজেকেই দায়ী করেছে। ভীরু স্বভাবের কারণে সমস্ত দায় থেকে মুক্তি পায় শশিভূষণ। মল্লিকা স্বপ্ন রূপায়ণ ও জীবন চলার পথে ব্যর্থ হলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঠকের কোমল হৃদয় তার জন্য বেদনার্ত হয়ে ওঠে। মল্লিকার জন্য পাঠকের একটু বেশি কষ্ট হয় এজন্য যে মল্লিকার এ পরিস্থিতিতেও শশিভূষণের কোনো ভাবান্তর নেই। থাকলেও তার প্রকাশ নেই।

স্টোভ গল্পের বাসন্তী আগাগোড়া মধ্যবিত্ত মানসিকতার অধিকারী। শশিভূষণের সঙ্গে এমন স্বভাবের বাসন্তীর বিয়ে হয়। বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত তার কোনো জটিলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। জটিলতা ছিল এমন কোনো আভাসও নেই। সে স্বামীর সংসারে এসে সুখীই ছিল।

বাসন্তী সেই মধ্যবিত্ত যে তার অবস্থানেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশে তার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

বাসন্তীর সুখ নিরবিচ্ছিন্ন থাকে নি। মাঝখানে অদৃশ্য এক দেয়াল তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার জন্য ফণা তুলেছিল। এ পরিস্থিতি তৈরী হতে অবশ্য সময় লেগেছে। প্রথম দিকে মল্লিকা বেশ সহজ-সরল ছিল। কেননা দূরসম্পর্কের আত্মীয়রা স্বামীর চরিত্র নিয়ে যখন সাবধান করেছিল তখন সে সহজ-সরল দৃষ্টিকোণ থেকে তা গ্রহণ করেছে। এ নিয়ে গভীর জটিলতায় প্রবেশে যে বোধ ও বুদ্ধি প্রয়োজন কোনোটি তার ছিল না। কিন্তু বুঝানোই যাদের কাজ তারা তাকে না বুঝিয়ে ছাড়বে কেনো ? অবশেষে তারা তাকে এই জটিলতায় প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়। স্বামীর প্রেমই তার জীবনে সংকট হয়ে দেখা দেয়। বিশেষত এ বিষয়ে যখন স্বামী নীরব। এ বিষয়টি স্বামীর কাছে জানতে পারলে হয়তো তার মনে এমন জ্বালা সৃষ্টি করতে পারতো না। বোধ ও বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ না হলেও নারীর স্বাভাবিক জ্ঞান তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। মল্লিকার বিক্ষুব্ধ মনোভাব চরমে ওঠে স্বামীকে যখন বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে। স্বামীর এই নীরবতা, ঔদাসীন্য ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাসন্তীর মূল্যায়ন এমন—

> "ব্যস্, আর কিছু বলবার দরকার হয়নি। হঠাৎ বারান্দায় যাবার কোনো কারণই স্বামী জানতে চান না। তাঁর কোনো কৌতূহলই নেই। বাসন্তীর মনে হয়েছে যে, সে যদি বলত, গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি, তা হলেও স্বামী বোধ হয় শুধু একটু 'ও' বলে নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে থাকতেন।

Dhaka University Institutional Repository

> অসহ্য, অসহ্য এই নির্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে সুস্পষ্ট অপমানও ঢের ভালো ছিল।" (২খ,১৬২পৃ)

তখন তার মনে হয়েছে স্বামী বুঝি এখনো মল্লিকার কথাই ভাবছে। এতে সে আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ও নিজের জীবনকে মূল্যহীন মনে করে। বাসন্তী সাধারণ বাঙালি নারীর যে চিরন্তন ধারা তার বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় না। তাই সে নিজের জীবনের বিপর্যয় বার বার কামনা করেছে। অপমান থেকে বাঁচার জন্য ভাঙা স্টোভ জ্বলবার সময় দুর্ঘটনা ঘটুক এমন কামনা বারবার করেছে। কোনোদিন অবশ্য এমন দুর্ঘটনা ঘটে নি। শাশুড়ির নিষেধ সত্ত্বেও সে তা অনেকবার জ্বালিয়েছে।

ধীরে ধীরে বাসন্তীর মনোভাবে কখন যেনো পরিবর্তন ঘটে। তার প্রতি স্বামীর অসীম নির্ভরতায় এক পর্যায়ে মনে হয়েছে কোনোদিন যদি শশিভূষণের মনে কোনো রঙ লেগেও থাকে তাহলেও তা অনেক আগেই ধুয়ে মুছে গেছে।

মল্লিকা গোকুলপুর স্কুলে যোগদানের পর সে-ই স্বামীকে জানিয়েছে একবার তাকে আসতে বলার জন্য। শশিভূষণ এর উত্তরে শুধু বলেছে—

> "কী জন্যে ?" (২খ, ১৬৩ পৃ)

তারপর অবশ্য মল্লিকা নিজে একবার এসে হাজির হয় শশিভূষণের বাসায়। মল্লিকাকে প্রথম দেখে বাসন্তী একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। শশিভূষণ আপ্যায়নের জন্য তাড়া করলে সে স্পষ্টভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে। তবে তা সীমিত পর্যায়ে এবং অতিথির সামনে নয়। এ সময় শুধু আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না থাকার অভিযোগ করে বাসন্তী। আগে যেমন তার ক্ষোভ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে মল্লিকার উপস্থিতিতেও তেমন হয়েছে। মল্লিকার উপস্থিতি তার মনের সব আশঙ্কা দূর করেছে। এ সময় মল্লিকা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া ছিল এমন—

> "মল্লিকাকে সে কী ভাবেই না কল্পনা করেছে ! সে কল্পনার সঙ্গে আজকে এই চাক্ষুষ পরিচয়ের এত তফাত হবে সে ভাবতেও পারেনি। মল্লিকাকে কুশ্রী বলা চলে না। কিন্তু সে রূপও তার নেই যাতে পুরুষের মনে অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে বলে সাজসজ্জার একটা পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু সেইসঙ্গে বয়সের ছাপটাও একেবারে আর লুকনো নেই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ত, সুতরাং বয়স নেহাত কম তো হল না।"(২খ, ১৬২ পৃ)

মল্লিকা শুধু তার শঙ্কাই দূর করে নি, স্বামীর সঙ্গে মল্লিকার আলাপকেও সে আর খারাপ চোখে দেখছে না। স্বামীর সঙ্গে মল্লিকার আলাপচারিতার সময় বাসন্তীর মনোভাব ছিল এমন—

Dhaka University Institutional Repository

> "ওঘরে বসে এখনো ওরা গল্প করছে। কী গল্প করছে কে জানে ? যা-ই করুক, কিছু আসে যায় না। বাসন্তী জানে, তার কোনো ভয় আর নেই।" (২খ, ১৬৩ পৃ)

স্বামীর প্রেমের সূত্রে বাসন্তীর মনে যে অশান্তির আগুন জ্বলেছে তাই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতা দান করেছে। তবে বাসন্তীকে কোমল ও সহজ সরল নারী হিসেবে দেখাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা মল্লিকা প্রসঙ্গ তার মনে যেমন প্রবল জ্বালা সৃষ্টি করেছিল তেমনি তা খুব সহজে ধুয়ে মুছে যায়। এটি সরলতার প্রমাণ। জটিল মানসিকতার অধিকারী হলে মল্লিকার আগমনে নতুন প্রশ্নের বীজ গজিয়ে উঠতে পারতো। তার যথেষ্ট উপকরণও ছিল। কিন্তু তা হয় নি। মানসিক জটিলতা সৃষ্টি না হওয়ায় বাসন্তীর প্রতি পাঠকের আগ্রহ আর থাকে না। সে সময় স্টোভটি যেনো না ফাটে তার এই কামনা তাকে জীবনমুখি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এখানে সে আরো ভেবেছে একটা কেলেঙ্কারি ঘটে গিয়ে মল্লিকা গৌরব লাভ করুক তা যেনো না হয়। বাসন্তী অর্থনৈতিক ও সংসার জীবনেও সুখী। এ বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় গল্পের এ অংশ থেকে—

> "মল্লিকা আজ এতদিন বাদে নিজে থেকেই এসেছে। না, সত্যিই কোনো জ্বালা, কোনো সংশয় বাসন্তীর মনে আর নেই। সে বরং খুশি হয়েছে মনে মনে। তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনই মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেয়েছিল। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে, এ যেন তারই ঋণ শোধ।"(২খ, ১৬৩ পৃ)

বাসন্তীর মনে যে ক্ষোভ ছিল তার কোনো চিহ্নই নেই। আজ সে পরিপূর্ণ সুখী। বাসন্তীর এই অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিপূর্ণ সুখী নারীর উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আমাদের সমাজে এমন অনেক নারীর অস্তিত্ব রয়েছে যারা খুব সহজে সমাজ প্রতিবেশে নিজেদের প্রতিস্থাপন করতে পারে।

থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র মায়া উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি। বৈবাহিক সূত্রে ও পারিবারিকভাবে সে একই পর্যায়ে দিন যাপন করেছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি হওয়ায় অর্থনৈতিক সংকট তাকে মোকাবিলা করতে হয় না। কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা তার সহজ স্বাভাবিক জীবনকে বিষিয়ে তোলে। তিলে তিলে নিঃশব্দে তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছাতে হয়, অথচ তার মনে বিয়ের পর কোনো জটিলতা ছিল না।

বিবাহিত জীবনে অর্থনৈতিক সংকট থাকলেও হয়তো মায়া মোকাবেলা করতে পারতো। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মায়া মানসিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে না ।

অর্থকড়ির বিষয়েও মায়া অধিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। লক্ষ্ণৌ শহরের রেল স্টেশনে প্রশান্ত এক টাকা বেশি দিয়ে একটি থার্মোফ্লাস্ক কিনেছিল। এই এক টাকা লোকসান দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসায় মায়া তাকে অনেকক্ষণ ভর্ৎসনা করে। অবশ্য এর আগেও মায়া অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতন ছিল। প্রশান্তের মন্তব্য থেকে এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়—

> "এখানেও মায়া দুর্বোধ। তুচ্ছ লাভ-লোকসানের হিসাব সম্বন্ধে তার এই ব্যাকুলতায় প্রশান্ত আগেও অবাক হয়ে গেছে। জীবনের গভীরতম ব্যাপারে যে নিরাসক্ত. প্রশান্তর সমস্ত আকুলতা যার কঠিন নির্বিকার ঔদাসীন্যে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে, সংসারের সামান্য এই লাভ-লোকসানের হিসাব তার কাছে এত মূল্যবান কী করে হতে পারে!" (২খ, ১২১ পৃ)

সংসার জীবনে প্রবেশের পর মায়া তার আগের স্মৃতিকে গুরুত্ব দেয় নি। সে স্বামী সংসারকেই বড় করে দেখেছে। সংসারের সামান্য একটি টাকাও সে এ কারণে অযথা জলে ফেলতে রাজি নয়। এই দ্বৈত রূপই প্রশান্তের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাছাড়া আগে থেকেই প্রশান্ত গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছে অরুণবাবু সম্পর্কে মায়ার কাছে কিছু জানার জন্য। অদ্ভুত সংযমে মায়া তা এড়িয়ে গেছে। মায়া এ বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও প্রশান্ত তা বার বার সামনে নিয়ে এসেছে। প্রশান্তের কারণে অনেক সময় মায়া এ জটিলতা এড়াতে চাইলেও পারে নি। লক্ষ্ণৌ শহরে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে অরুণবাবুর নাম। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হলে মায়া বলেছিল তাকে নামিয়ে দেয়ার জন্য। এ সময় প্রশান্ত পরিহাস করে বলে এলাহাবাদে তাকে নামিয়ে দেবে কি না। মায়া প্রশান্তের এ পরিহাসে যোগ দিতে পারে না। সে সিরিয়াসভাবে জানিয়েছিল তারা তো এলাহাবাদ হয়ে যাচ্ছে না। মায়া এটাকে পরিহাস হিসেবে নিতে না পারায় এ বিষয়ে প্রশান্তের অশান্তি আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

তারপর কলকাতা থেকে কিছু দূরে রেলওয়ের কাটিংসের জলাশয়ে অরুণবাবুকে নিয়ে প্রশান্তে-র মাছ ধরতে যাওয়াটাকে মায়া স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে নি। মায়াকে তা পীড়িত করেছে। কেননা সে জানে প্রশান্ত জানতে চায় মায়া ও অরুণবাবুর সম্পর্কের বিষয়ে। প্রশান্তে-র এ মনোভাব চরমভাবে আহত করে মায়াকে। যে কারণে অরুণবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে প্রশান্ত। এ সম্পর্কে প্রশান্তের কাছে মায়ার প্রশ্ন ছিল এমন—

> "তোমারই কি শুধু মাছ ধরার শখ।" (২খ, ১২১ পৃ)

মায়ার এ আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিফলিত হয় নি। প্রশান্ত মাছ ধরার সময় কৌশলে অরুণবাবুর কাছে মায়ার প্রসঙ্গ তুলেছে। তারপর বাড়ি ফিরে মায়ার কাছে বলেছে যে অরুণবাবু তার চায়ের প্রশংসা করেছে। এ প্রশংসা শুনে মায়াও জানায় যে, অরুণবাবু তো চা পান করে না। অরুণবাবুর চা পান না করার বিষয়টি পর্যন্ত মায়া মনে রাখায় প্রশান্ত সেদিন মনের জ্বালা লুকিয়ে রাখতে পারে নি।

মৃত্যুর গাঢ় ছায়া যখন মায়াকে স্পর্শ করছে তখনো প্রশান্ত তার আগ্রহকে লুকাতে পারে নি। তখনো সে অরুণবাবুর প্রসঙ্গ তুলেছে। অরুণবাবুর কথা বলায় মায়া শেষ সময়ে প্রশান্তকে

Dhaka University Institutional Repository

বলছে যে সে তাকে কষ্ট দিতে চায় নি। কিন্তু এই বলাতেও একটু অস্পষ্টতা ছিল। এই অস্পষ্টতায় প্রশান্ত ব্যাকুল হয়ে জানতে চেয়েছে এ কথাটি মায়া কাকে বলেছে। কিন্তু ততক্ষণে মায়া ইহকালের সব প্রশ্নের উর্ধ্বে উঠে গেছে। কিন্তু প্রশান্তের প্রশ্নের উত্তর মেলে না। এই একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিপর্যস্ত হয় একটি সম্ভাবনাময় জীবন। কেননা স্বামীর এই আচরণে মায়া নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এখানেই সূচিত হয় মায়ার সর্বনাশ। মনের মৃত্যু যেখানে হয় সেখানে অনেকেই হয়তো যান্ত্রিক জীবন টেনে নিতে পারে। মায়ার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। মায়ার এ আত্মবিসর্জন খুব স্বাভাবিকও নয়। স্বামীর অন্ধ আক্রোশ ছাড়া মায়ার মানসিক জটিলতা তীব্র ছিল তা কিন্তু নয়। থাকলে সে প্রশান্তকে এত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারতো না। অরুণবাবু নয় মায়ার মৃত্যুর জন্য প্রশান্তই দায়ী। কেননা মায়া যা মেনে নিতে পারে নি তা হল স্বামীর সন্দেহপ্রবণ মানসিকতা।

জ্বর গল্পের শর্মিষ্ঠা তৎকালীন পরিবেশ প্রতিবেশে একজন ভাগ্যবতী নারী। সাধারণ মানুষের যে অর্থনৈতিক জটিলতা তা তাকে স্পর্শ করে নি। তবে তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা যে পূরণ হয়েছে এমনটি নয়। এ কারণে সে ভেঙে পড়ে নি আর দশজন নারীর মতো। প্রতিক্রিয়া হিসেবে বেছে নেয় নি নেতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত। এখানেই শর্মিষ্ঠা ব্যতিক্রম। কলেজে পড়াকালে তার মনের দিগন্তে রঙ লেগেছিল। সে ভালোবাসতো গল্পের নায়ককে- যে পরবর্তীকালে স্কুলমাস্টার হয়ে কায়ক্লেশে দিন চালায়। সে প্রমিকের সঙ্গে আলাপ-চরিতার মধ্য দিয়ে শর্মিষ্ঠা বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যর পরিচয় পাওয়া যায়। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বিয়ে না হওয়া ছাড়া তার জীবনে আর কোনো ঘাটতি নেই। তবে এখনো তার প্রতি শর্মিষ্ঠার দুর্বলতা আছে। সে কারণে স্টিমার ঘাটে সেই উদ্যোগ নিয়ে দারিদ্র্যে মলিন চেহারার স্কুলমাস্টারকে সেকেন্ড ক্লাসে ডেকে নিয়ে এসেছে। শর্মিষ্ঠা ভাগ্যবতী নারীই শুধু নয়, স্পষ্টভাষীও। প্রাক্তণ প্রেমিকের সঙ্গে আলোচনাকালে তার এ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাক্তন প্রেমিক মল্লিকাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, এটা যে অন্যায় তা সে দ্বিধাহীনভাবে জানিয়ে দেয়।

শর্মিষ্ঠার আন্তরিকতা ও আকাঙ্ক্ষা প্রাক্তণ প্রেমিক বুঝতে না চাওয়ায় সে সুগভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করে।

বিয়ের পর শর্মিষ্ঠার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে স্কুলশিক্ষকের মূল্যায়ন এমন—

> "শুধু এইটুকু জেনেছি যে, শর্মিষ্ঠার স্বামী বেশ বড়োদরের সরকারি কর্মচারী; সম্প্রতি বদলি হয়ে যেখানে গিয়েছেন, শর্মিষ্ঠা পিত্রালয় থেকে শিশু-কন্যাকে নিয়ে সেখানেই রওনা হয়েছে।"(২খ, ২৬৬ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

শর্মিষ্ঠা অবশ্য ছোট বেলা থেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষি। নিজের সামর্থ্যের চেয়েও সে বেশি চেয়েছে। অবশ্য তার চাওয়া থেকেও সে অনেক বেশি পেয়েছে। প্রাক্তণ প্রেমিক শর্মিষ্ঠার মানসিকতা ও প্রাপ্তিকে এভাবে দেখেছে—

> "মনে পড়ল শর্মিষ্ঠা চিরদিনই একটু বেশি বড়ো কথা ভাবত। তার মাপের চেয়েও বড়ো। ভাগ্য তাকে বড়ো কথা যদি ভাবিয়ে থাকে, তার মাপের চেয়ে বড়ো জায়গায় টেনেও তুলেছে।"(২খ, ১৬৬ পৃ)

শর্মিষ্ঠা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। যা তার সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে গেছে।

শর্মিষ্ঠা গতানুগতিক জীবনবোধের বাইরে ভিন্ন চেতনা লালন করে। শর্মিষ্ঠার বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রাক্তন প্রেমিক তার প্রতি অনুরাগকে বিলাস হিসেবে খোঁচা দিলে তা টের পাওয়া যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় শর্মিষ্ঠা অবিচলিতভাবে জানিয়েছে—

> "যা হারাই তা মনে করে রাখার অনির্বাণ বেদনা হল বাইয়ের গল্পের, জীবনে তার পরেও কিছু থাকে।" (২খ, ১৬৬ পৃ)

তার পরে যা থাকে শর্মিষ্ঠা তাকে দেখেছে প্রশান্তি হিসেবে।

শর্মিষ্ঠা স্বাচ্ছন্দ্যপিয়াসী। ট্রেনে ভ্রমণকালে সে এর প্রমাণ রেখেছে। কেবিনে জায়গা পাওয়ার পর অল্প সময়ের জন্য হলেও সে কায়েমিভাবে সংসার পাতার মতো সব আয়োজন করে। এ সম্পর্কে প্রাক্তণ প্রেমিকের প্রশ্নে শর্মিষ্ঠার জবাব ছিল এমন—

> "এক ঘণ্টার সংসারই কি তুচ্ছ— ঘণ্টা ধরে তো সবকিছুর দাম কষা যায় না।"(২খ, ১৬৭ পৃ)

শুধু আয়েসের সঙ্গে আসন পাতা নয়। সে আন্তরিকতার সঙ্গে খাওয়ায় দরিদ্র স্কুলশিক্ষককে।

ঐ স্কুলশিক্ষকের প্রতি এখনো শর্মিষ্ঠার দুর্বলতা আছে। সে কারণে তার সংস্পর্শে শর্মিষ্ঠাকে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাণবন্ত মনে হয়েছে। শর্মিষ্ঠার এ মানসিকতা প্রমাণ করেছে যে সে সর্বোতভাবে আজ উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। কেননা মধ্যবিত্ত গৃহবধূ হলে যে এমন আচরণ করতে সাহসী হতো না। তার মনে থাকতো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও ভয়। যা মধ্যবিত্ত সমাজের নারীর মৌল প্রবণতা। মধ্যবিত্তসুলভ কোনো জড়তাই মল্লিকাকে স্পর্শ করে না। সে খোলাখুলিভাবে যা মনে করেছে তাই প্রকাশ করেছে। রাখ ঢাক গুরগুর করার কোনো বালাই তার নেই। যা উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের লক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এহেন শর্মিষ্ঠার প্রেম কেনো ব্যর্থ হয়েছে সে সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তাতে শেষ পর্যন্ত শর্মিষ্ঠার কী ভূমিকা ছিল তারও উল্লেখ নেই। শর্মিষ্ঠার আগ্রহ ও মানসিকতা থেকে অনুমান করে এটি বলা যায় যে, এ সম্পর্কে একটি পজিটিভ পরিণতি দেয়ার চেষ্টা করেছিল শর্মিষ্ঠা ।

কিন্তু ভীরু প্রেমিকের কারণে তা যৌক্তিক পরিণতি লাভ করে নি। শর্মিষ্ঠার যে জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাও বেশ অভিনব। সে তার ভালোবাসাকে যৌক্তিক পরিণতি দিতে না পারলেও বেদনাবোধ লালন করতে আগ্রহী নয়। তার বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে বেদনা লালন করার প্রয়াস বইয়ের গল্পের। জীবনে তার প্রভাব ভিন্নরূপ। জীবনে না পাওয়ার পরেও মানুষের জীবনে কিছু থাকে যা নিয়ে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে। শর্মিষ্ঠা তার জীবনে এমনটিই করেছে। শর্মিষ্ঠার এই চেতনা ও আচরণ সব জীবনমুখি মানুষের বৈশিষ্ট্য। এখানেই শর্মিষ্ঠা জয়ী। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নত পরিবেশে সে ভালো থাকতে চেয়েছে। তার মানসিকতায় ক্রমোন্নতির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। আর এই প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষার কারণে সে জীবনে সফলতাও পেয়েছে। স্বামী-সন্তান ও সংসারকে যে পজিটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। সংসারের প্রতিও সে যথার্থ আন্তরিকতা দেখিয়েছে। এসব বিবেচনায় বলা যায় শর্মিষ্ঠা তার পূর্ব শ্রেণি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। সে বর্তমানে উচ্চবিত্ত শ্রেণিরই প্রতিনিধি। আমাদের সমাজে নারীর এ উত্তরণ অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। এটি জীবনকে এগিয়ে নেয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা ও তজ্জনিত লড়াই। এখানে শর্মিষ্ঠা সফল-জয়ী।

দিবাস্বপ্ন গল্পের নায়িকা প্রিসিলা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি চরিত্র। মানসিক পরিবর্তন প্রিসিলা চরিত্রে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। পিতার পরিবারের সে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি। উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রিসিলার বাবা রামসদয়বাবুর। প্রিসিলার মানসিক অবস্থা সার্বিকভাবে অনুধাবনে রামসদয় বাবুর স্বপ্ন তুলে ধরা প্রয়োজন। রমেশের দৃষ্টিতে তা ছিল এমন–

> "পিতা তাহার রিটায়ার্ড মুন্সেফ। মনে যতখানি সাধ তাহার উপযুক্ত সংগতি নাই। হাইকোর্টের তক্তে বসিবার বাসনা লইয়াও তিনি কোনোদিন মুন্সেফির বেড়া পার হইতে পারেন নাই । বালিগঞ্জের বিরাট ভিলার কল্পনা লইয়া ভবানীপুরের গলিতে ভাড়াটে বাড়িতে দিন কাটাইয়াছেন। রোল্‌সের স্বপ্ন দেখিয়া সামান্য গাড়ি-ঘোড়া রাখাও তাঁহার সাধ্যে কুলায় নাই !"(২খ, ১৪ পৃ)

রামসদয়বাবুর আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেও তিনি মেয়েকে বিলাত ও কালিগঞ্জের ছাঁচে গড়ে তোলেন। চারুতা নাম পরিহার করে সে হয়ে যায় প্রিসিলা। তবে এ সময় পিতার মানসিকতার বিপরীত প্রান্তেই ছিল তার অবস্থান। রমেশকে কেন্দ্র করে প্রিসিলা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীও হয়ে উঠে। কিন্তু তার সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় রমেশ সুদৃঢ় অবস্থান নিতে না পারায় অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রিসিলা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে অটল থাকতো কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা এ পরিস্থিতির মুখোমুখি তাকে শেষ পর্যন্ত হতে হয় নি। তবে প্রিসিলার এই বিদ্রোহীভাব আমরা সাময়িক হিসেবেই বিবেচনা করতে চাই। কেননা প্রিসিলা যে ছাঁচে বড় হয়েছে এ সিদ্ধান্ত তার বিপরীতমুখি পরিচয় বহন করে। পরবর্তী সময়ে তার আচরণ আমাদের এ মতামত দিতে সহায়তা করে। একদিন স্বামীর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে ঝগড়া করে প্রিসিলা বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে । সৌভাগ্যক্রমে সেদিন রমেশের সঙ্গে দেখা হয়। সেদিন প্রিসিলা সারাদিন রমেশের কথাই ভেবেছিল। এ প্রসঙ্গে প্রিসিলার উচ্চারণ—

> "একটা আশ্চর্য কথা শুনবে ! আজ সারাদিন তোমার কথাই ভাবছিলাম। তাইতো তোমায় দেখে নিজের চোখকেই প্রথমত বিশ্বাস করতে পারিনি— দৈবে আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল না।"(২খ, ১৬ পৃ)

রমেশের কথা সেদিন ভাবা ছাড়াও সে সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ প্রকাশ করে। গাড়ি ছাড়ার পর রমেশের মতো সেদিন তাদের গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ুক প্রিসিলাও তা চেয়েছিল । সেই সূত্রে সে কল্পনা করেছে গ্রামীণ পরিবেশে তাদের দাম্পত্য জীবন। প্রিসিলার স্বপ্ন ছিল এমন—

> "আমিও বলি হোক। মোটরটা ধরো যদি পাশের খানার মধ্যে গড়িয়ে ডিগবাজি খেয়ে আমাদের মাঠের উপর আছড়ে ফেলে, মন্দ কী হয় ! খানিকক্ষণের জন্যে চোখ বুজব, তারপরেই হয়তো চোখ খুলে দেখব পাহাড়ের দেশে এসে জন্মেছি— চারধারে কালো পাহাড় আর সাদা বরফ আর তার মাঝে ছোট্ট পাথুরে গাঁ। গাঁয়ের পাশে উপত্যকায় জনার ক্ষেত, সেখানে তুমি বর্শা নিয়ে পাহারা দাও আর আমি ছোটো একটি ঘরে বুনো কাঠের আগুনে তোমার খাবার তৈরী করি।"(২খ,১৭পৃ)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলো রমেশের যাপিত জীবনের পরিবেশের সঙ্গে প্রিসিলার কল্পনার মিল রয়েছে। এ মিলের কারণে রমেশ আকর্ষণ হারায় প্রিসিলার প্রতি। কেননা সে প্রিসিলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এর বিপরীতমুখি অবস্থানের কারণে। রমেশ যা পায় নি তার প্রতি তার লোভ ছিল। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার পর প্রিসিলার মানসিক সংকট জটিল হয়ে উঠে। এসময় তার ভাবনা ছিল এমন—

> " এই ঝগড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রিসিলা হঠাৎ দুই বৎসরের বিবাহিত জীবনের পরে উপলব্ধি করিয়া ফেলিয়াছে যে পিতার মুখ চাহিয়া সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ ব্যারিস্টার স্বামীর গলায় মাল্য দিয়া সে নিজের জীবন ব্যর্থ করিয়াছে। তাহার পিতার সারাজীবনের সাধ শেষ পর্যন্ত কন্যার মধ্য দিয়া বালিগঞ্জের ভিলা, দামী মোটর ও বিলাত ফেরত ব্যারিস্টারে চরিতার্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়, এ সমস্ত নকল জৌলুস জয় করিতে

Dhaka University Institutional Repository

> পারে নাই। বিলাতি সোনার মতো এ জীবনে যত পালিশ ততবেশি খাদ— এ জীবন সে ঘৃণা করে। অন্তত আজ সকালে সেই রকমই তাহার মনে হইয়াছে।"(২খ, ১৭ পৃ)

প্রিসিলার উত্তেজনা প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে রমেশের প্রতি তার আকর্ষণ কমতে থাকে এবং রমেশের সাধারণ জীবন প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি ঘৃণাও জাগে। রমেশের আলু পটল গাড়িতে পড়ে যাওয়া ও তা কুড়ানোর ব্যগ্রতা প্রিসিলার পছন্দ হয় নি। এসময় সে রমেশকে নতুন করে আবিষ্কার করে। সে দেখে রমেশ এই কয়েক বৎসরে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তার প্রমাণ তার চারধারে।

রমেশ গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সময় প্রিসিলার বিরক্তি আরো বেড়ে যায়। লেখক তা প্রকাশ করেছেন এভাবে—

> "রমেশ নামিয়া যাইবার সময় তাহার আলু পটল বেগুন কুড়াইতে গিয়া যে হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল তাহাতে তাহার বিরক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই।"(২খ, ২০ পৃ)

এর আগেই অবশ্য প্রিসিলা তুলনা করে ফেলে রমেশ ও তার স্বামী সুবিকাশের মধ্যে। এসময় তার মনে সাময়িক উত্তেজনার আর কোনো ছায়া থাকে না। সে ফিরে আসে তার বাস্তব জগতে। এজগৎ বুদ্ধির ও বিবেচনার। সেখানে কল্পনার আশ্রয় নেই। নেই ভাবাবেগ। অন্তত এক শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে এ কথা পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। প্রিসিলা সেই শ্রেণির মানুষ। যারা সাধারণ মানুষের জীবনকে কল্পনায় পছন্দ করে বাস্তবে তাকে ভয় পায়। প্রিসিলা যেমনটি করেছে। সে বেছে নিয়েছে উচ্চবিত্তের জীবনকে। সেখানে নৈতিক অবক্ষয় কোনো ঘটনাই নয়। যেকারণে সুবিকাশের নৈতিক স্খলনকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করতে হয়। এমনকি অন্তরে গ্লানিও লালন করার প্রয়োজন পড়ে না। যেমন পড়ে নি প্রিসিলার। এই পরিবর্তনে তার সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়।

এমন সময় রমেশ ও সুবিকাশ ধরা পড়েছে প্রিসিলার মনে এভাবে—

> "-- —রমেশ awkward নয়, অত্যন্ত dull ! তাহার স্বামীকে আর যাহাই হোক dull বলা যায় না। চারদিকে সারাক্ষণ তাহার জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। বুদ্ধিতে প্রাণের প্রাচুর্যে তাহার তুলনা কোথায় ? হ্যাঁ, অন্যায় সে করিয়াছে বটে কিন্তু ক্ষমা চাহে নাই এমন কথাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? তাহার ক্ষমা চাহিবার ধরনই ওই রকম।"(২খ, ২০ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

প্রিসিলা আস্থা প্রকাশ করেছে সুবিকাশের প্রতি এবং গ্রহণ করেছে তার জীবনবোধকে। সে জীবন উচ্চবিত্তের যাপিত জীবন। এখানেই চূড়ান্তভাবে পরিবর্তন সূচিত হয় প্রিসিলার দৃষ্টিভঙ্গির। সেকারণে বলা যায় কখনো কখনো সুস্থ জীবনবোধের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেও প্রিসিলা প্রবেশ করেছে বিকৃত উচ্চবিত্ত সমাজে। সেটা মানসিকভাবেও। এটা তার যেমন জীবনমুখি আচরণ তেমনি তার চারিত্রিক দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে।

যাত্রাপথ গল্পের মলিনা মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী। অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয় অন্তর্গত জটিলতা তার জীবনকে বিষময় করে তোলে। এ সংকট অত্যন্ত জটিল। স্বামী ও পিতার পরিবারের ভিন্ন পরিবেশ সংকটের মূল কারণ। মলিনার স্বামী অজয় এই বৈপরীত্য তুলে ধরে।

দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন নয় মাত্র ছয় মাসের মাথায় মলিনা স্বামীর কপটতা আবিষ্কার করে। বিয়ের ছয় মাস পর স্বামীর চাকরিস্থল পাটনা যাওয়ার পথে ট্রেনে সে স্বামীর স্বভাব সম্পর্কে সম্যকভাবে জানতে পারে। তৈরী হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান। এই ব্যবধান মলিনা ইচ্ছে করে তৈরী করে না। তা স্বভাবতঃই এসে যায়। কেননা আমরা দেখি মলিনা তার স্বামীর অপরাধকে ভুলতে চেয়েছে, চায়নি পাত্তা দিতে। এই বিপরীত পরিবেশই তা তাকে ভাবতে বাধ্য করে। এই বৈপরীত্য অনুধাবনে দুই পরিবারের চিত্র তুলে ধরা আবশ্যক। মলিনার পারিবারিক আবহ লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "সে নিজে অন্য রকম আবহাওয়ায় মানুষ। তাহার বাবা এক জীবনের মধ্যে বহু পুরুষের অর্জিত বিশাল সম্পত্তি সদ্ব্যয়ে ও অপব্যয়ে উড়াইয়া দিয়া ফতুর হইয়া আসিয়াছেন। তাহাদের বাড়িতে অর্থের মূল্য সে অন্যভাবে বুঝিতেই শিখিয়াছে।"(২খ, ৮৪ পৃ)

অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিষয়ে অজয় অনুদার ও কপট। এই কপটতা মলিনা টের পায় বিয়ের ছয় মাস পর। প্রথমে কুলিকে প্রতিশ্রুত পয়সা কম দিয়ে ঝগড়া করা, পানওয়ালার কাছে অচল দোয়ানি চালিয়ে অদম্য উল্লাস ও মলিনা চার আনার মিহিদানা সীতাভোগ ফেলে দেয়ার রাগ করা ও ফেরিওয়ালাকে বকাবকি করা। মলিনা এসব ক্ষেত্রে স্বামীর আচরণকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নি। বিশেষত কুলির সাথে তার মুখ যেভাবে বিকৃত করেছিল তা মলিনা ভুলতে পারে না। সে ভাবতে পারে না মানুষের সুন্দর মুখ কিভাবে এমন কুৎসিত দেখাতে পারে।

এরপর ট্রেনের একটি মেয়ে সম্পর্কে অজয়ের বলা গল্পও মলিনা বিশ্বাস করতে পারে না। স্বামীর সাথে এই ভ্রমণকালেই মলিনার মন শূন্যতায় ভরে যায়। এর সুস্পষ্ট কারণ মলিনা অনুধাবন করতে পারে না। কোনো একক কারণে নয় অজয়ের সমস্টিগত আচরণ মলিনার মনে এই সঙ্কট তৈরী করে। অজয়ের কপটতা ছাড়া মলিনার জীবনে সংকটের অন্য কোনো কারণ নেই। মলিনা সহজ স্বাভাবিকভাবে স্বামীকে গ্রহণ করেছিল। মেয়ে হিসেবেও সে অনেক

Dhaka University Institutional Repository

ভালো। তার মন অত্যন্ত কোমল। প্রকৃতির প্রতিও তার রয়েছে অনাবিল আগ্রহ। তাই ট্রেনে ছোট্ট পাড়া গাঁ দেখিয়ে অজয়কে বলেছিল—

> "কেন, কী সুন্দর বন জঙ্গল, মাঠ, চাষীদের বাড়ি ! আমার কিন্তু ওই রকম বাড়িতে থাকতে বড় ইচ্ছে করে।"(২খ,৮৪পৃ)

ট্রেনে উঠেও মলিনা স্বামীর প্রথম আচরণকে ভুলতে চেয়েছে। এটি তার সহনশীলতাকে তুলে ধরে। তাই সে ঘটনার পর স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করে। উদ্দীপ্ত হয়ে সাড়া দেয় অজয়ের ডাকে। মলিনার এসব মনোভাবের কারণে তাকে একমুখি চরিত্র হিসেবে দেখা যায় না। মলিনা মধ্যবিত্ত টানাপড়েনের সংসার থেকে আসলেও তার মন ছিল উদার ও কোমল। সেকারণে অজয়ের আচরণ তার মনে গভীর বেদনা জাগিয়ে তোলে। মলিনা ভ্রান্ত হয়ে পড়ে স্বামীর স্বভাবে। মলিনার এ অবস্থাকে লেখক দেখেছেন এভাবে—

> "না, কোনো ঈর্ষার বেদনায় নয়। গল্প যে বানানো তাহা সে আরম্ভ হইতে-না-হইতেই বুঝিয়াছে। কোথায় সে নিদারুণভাবে যে আঘাত পাইয়াছে তাহা সে নিজেও বুঝাইতে পারিবে না, কিন্তু হঠাৎ তাহার সমস্ত জীবন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। ট্রেনের কামরা যেন বদ্ধ কারাগার। নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে মুখটা বাহিরে না বাহির করিলে চলিতেছে না। "(২খ,৮৭পৃ)

মলিনার এই মর্মপীড়া এখানেই শেষ হবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মলিনাকে এ অবস্থায় দেখে অজয়ের মনে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল—

> "অজয়ের মনে তখনো বুঝি তাহার গল্পের নেশা লাগিয়া আছে। সহসা মলিনার দিকে চাহিয়া তাহার মনটা খারাপ হইয়া গেল। মনে হইল, এই নিতান্ত সাধারণ মেয়েটিকে চিরজীবনের বোঝারূপে বহন করার কোনো উন্মাদনা নাই।"(২খ,৮৭পৃ)

অজয়ের এই মনোভাব জানানোর মধ্য দিয়ে লেখক গল্প শেষ করেছেন। তাই মলিনার জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি জানা যায় না। তবে গল্পের শেষ পরিসরে ট্রেনের কামরাটি মলিনার বদ্ধ কারাগার মনে হওয়া ও অজয়ের শেষ মনোভাব মলিনার সম্পর্ককে দীর্ঘায়িত করবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী হওয়ার কারণে এই কারাগার থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই। কেননা আমরা জানি মধ্যবিত্ত নারী জীবনকে নতুনভাবে সাজানোর সিদ্ধান্ত তার পরিবেশ ও মানসিকতার কারণে নিতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণেই মধ্যবিত্ত নারীকে নিষ্পেষিত জীবন যাপন করতে হয়। এটাই তার নিয়তি। আর নিয়তিকে চোখ বুঝে বন্ধ করে মেনে নেয়াই মধ্যবিত্তের স্বভাব। আর তা মেনে নিতে না পারলে জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে জীবন সাজানোর চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সমাজের খুব বেশি নারী করতে পারে না। তা পারলে সমাজ অনেক জটিলতা হতে মুক্ত থাকতে পারতো ।

একটি রাত্রি গল্পের মীরা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। মীরার বাবা সরকারি ডাক্তার। অর্থনৈতিক ও পারিবারিক সংস্কৃতি বেশ পরিপক্ব। এমন পরিবেশে বড় হয় মীরা। কৈশোরে পরিবারের সাথে ট্রাভা ফল্‌সে পিকনিকে যায়। এখানে বাবার সাথে পরিচয়ের সূত্র ধরে বাকপটু তরুণ সুব্রতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠে।

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে মীরার এই সম্পর্কই তার জীবনে সংকট ডেকে আনে। এসময় মীরা ভালোবেসে ফেলে সুব্রতকে। আর এখানে সে সবচেয়ে বড় ভুল করে। এসময় সে সুব্রতকে বুঝবার কোনো চেষ্টাই করে নি। সুব্রতের বাগ্মিতার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু সে সুব্রতের কাছ থেকে তার প্রতিদান পায় নি। না পাওয়ার কারণও অবশ্য আছে। কেননা সুব্রত তখন শুধু যুবতী মীরার সাহচর্যকে উপভোগ করছে। এই সম্পর্ককে সফল পরিণতি দেয়ার সামান্যতম চিহ্নও লক্ষ করা যায় না সুব্রতের কাছে। একাধিক বার সুব্রত তা প্রমাণ করেছে। সুব্রত যেভাবে মীরাকে দেখেছে একটি মন্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে—

> "মীরার পরিবর্তন সে লক্ষ করেছে একান্ত নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাবে। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ পার হয়ে মীরা নারীত্বের পরিপূর্ণতার একটি মহিমা লাভ করেছে। তবু সুব্রতের কাছে তা ছিল নিরর্থক। মীরা সেদিন বুঝি সমস্ত সংকোচ ত্যাগ করে একটু ধরা দিয়েছিল। আভাস দিয়েছিল তার হৃদয়ের উদ্বেলতার। কিন্তু সুব্রত সচেতন হবার প্রয়োজন বোধ করেনি। সে বিশ্বাসই করেনি। অনুরাগ আকর্ষণের সাধারণ দৈনন্দিন অভিনয় হিসাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছে, মিথ্যা একটু দুর্বলতার ভান করতেও তার বাধেনি।
>
> এই ভানই তার জীবনের মূল পর্যন্ত শুকিয়ে দিয়েছে সে জানে, তবু উপায় তো নেই। ভান করাই এসব ক্ষেত্রে রীতি। তুমিও অভিনয়ে যোগ দেবে এইটুকুই সবাই আশা করে। সুবিধা তার অনেক। সময় কাটে বেশ। বিদায়ের বেলা কিছু দাগ থাকে না মনে; দেনা-পাওনা বোঝাপড়ার কোনো হিসাব-নিকাশও নয়। মন যাদের মরে গেছে তাদের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধার আর কী হতে পারে। এ অভিনয়ে অভ্যস্ত বলেই তার ক্লান্ত মন মীরার সংস্পর্শে কোন সাড়া দেয়নি।"(২খ, ৭৫-৭৬ পৃ)

তবে মীরার এই ভুল অস্বাভাবিক নয়। এই বয়সে সুব্রতের মতো জটিল মনকে বুঝে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে মনের সরলতা দিয়েই দেখেছে সুব্রতকে। তাই তার এই ভুলকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরা যায়। কিন্তু এই ভালোবাসা লালন করা মীরার জন্য ঠিক হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা প্রথম পরিচয় পর্বের পর সুব্রত যোগাযোগ রাখে নি। তারপর মীরার পরিবারের সঙ্গে সুব্রতর একবার দেখা হয়েছিল মাত্র। এখানেও মীরার জন্য ভালো কোনো সংবাদ ছিল না। এজন্যেই মীরার ভালোবাসা টিকিয়ে রাখা কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। বাস্তবতা বর্জিত হলেও মীরা তা করেছে। মীরার এই মনোভাবকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্রুত গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দোদুল্যমানতায় অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়। যা মীরার জীবনেও ঘটেছে। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সরল অংশে প্রথম পর্যায়ে বাস করেছে মীরা। শেষবার সুব্রতের সঙ্গে যখন তার কথা হয় তখন অবশ্য সে বেশ পরিণত। কিন্তু মধ্যবিত্তের যে বৃত্ত তা থেকে সে তখনো বের হয়ে আসতে পারে নি।

উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের দ্রুত গ্রহণ বর্জন করার যে ক্ষমতা তা মীরার মধ্যে লক্ষ করা যায় না। কেননা শেষবারও মীরা সুব্রতের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করে। সে যে সুব্রতের প্রতি ভালোবাসা এখনো জিইয়ে রেখেছে তা প্রকাশ করে। মাসিদের সঙ্গে বায়স্কোপ দেখতে গিয়ে ভালো লাগে না বলে রাতে মাঝখানে বের হয়ে আসা তার মনের অশান্তি ও টানাপড়েনকে তুলে ধরে। কেননা তার এ আচরণ কোনোক্রমেই বুদ্ধিগ্রাহ্য কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এটা তার পীড়িত মনের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে মীরা সুব্রতকে ভালোবাসলেও বিয়ের আগে দৈহিক সুখ লাভের ধারণাকে সমর্থন করে নি। শেষবার ট্রামে তারা যখন ময়দানে যাচ্ছিল তখন সুব্রত একবার হাত মীরার পীঠ ঘেঁষে পিছন দিকে রাখলে মীরা এতে উষ্ণতা বোধ করে। তারপর সুব্রতের হাতকে সরিয়ে দিয়ে নিজেও একটু সরে বসে। এ আচরণ মীরার মনের সুচিতাকে প্রকাশ করে। এমন সুন্দর একটি মনকে লালন করা সত্ত্বেও মীরার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে প্রেমিকের ভীরুতায়। এ অবস্থায় মীরা পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। মীরার এ অবস্থায় পাঠক অন্তরে লালন করে সুগভীর বেদনাবোধ। মীরা ভাগ্য বিড়ম্বিত উজ্জ্বল ব্যতিক্রমি নারী চরিত্র। সেকারণে সুব্রতের অনুরোধ সে রক্ষা করে। এ সময়েও সুব্রতের প্রতি তার ক্ষোভ লক্ষ করা যায়। তবে এ ক্ষোভ তার পূর্ব মানসিকতারই অংশ। কেননা পরিচয়কালে সুব্রতের সঙ্গে সে দ্বন্দ্বমূলক আচরণ গড়ে তোলে। সে সুব্রতকে ঘা দিয়েই আনন্দবোধ করতো। তাই শেষোক্ত ক্ষোভ তার পূর্ব দ্বন্দ্বমূলক আচরণেরই পরিণত নির্যাস। এই আলোচনা থেকে বলা যায় শেষবার মীরা তার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আচরণ বদলায় নি। তবে এবার মীরা কিছুটা পরিণত। তাই সুব্রতের মনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা সে সহজে বিশ্বাস করতে চায় নি। অবিশ্বাস থেকে মীরা সুব্রতকে প্রশ্ন করে—

"এসব সেই নির্জন রাস্তা আর হঠাৎ সাক্ষাতের জাদু নয় তো !"(২খ, ৭৩ পৃ)

মনে এই প্রশ্ন জাগা সত্ত্বেও মীরা সম্পূর্ণভাবে আবার সুব্রতের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মীরার এই আত্মসমর্পণ মধ্যবিত্তের আকড়ে থাকার যে প্রবণতা তা উৎকটভাবে প্রকাশ করে। এবারও

Dhaka University Institutional Repository

মীরা ঠকে দুর্বল ও ক্লান্ত চিত্তের সুব্রতকে বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে মীরাকে *শরতের প্রথম কুয়াশা* গল্পের নায়ক নিরঞ্জনের মতো পরিণতি বরণ করে নিতে হয়। ক্লান্ত ও আত্মপ্রত্যয়হীন অতসী যেমন নিরঞ্জনকে গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারে না। হারাবার ভয় করে। আর সেই ভয় থেকে অতসী সিদ্ধান্ত নেয় ঐ রাতের ভালোবাসাকে স্মৃতিতে উজ্জ্বল করে ধরে রাখবে। সুব্রতও তাই করেছে। ফলে ব্যর্থ হয়ে যায় মীরার শেষ প্রয়াসও। সুব্রতের এ কথায় তার প্রমাণ মিলে—

> "রাত্রির এই রহস্য-পরিচয় সে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে টেনে এনে ধুলিমলিন করবে না।"(২খ, ৭৬ পৃ)

রোদ গল্পের শুভা সাধারণ চাকরিজীবী। অর্থনৈতিক সংকট তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয় সংসারের দায়িত্বও তাকে কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। সে একই অফিসে কর্মরত যুবক বিজয়কে ভালোবাসে। বিজয়ও শুভার মতোই নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। শুভার মতো তাকেও সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। শুভা ও বিজয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পারিবারিক দায় সম্পর্কে তাই লেখকের মন্তব্য—

> "দুজনেই নিজের নিজের সংসারের দায়িত্বে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে অদূর ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্তি পাবার কোনো আশা নেই যদি না নিজেরাই জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে পারে। কিন্তু সে সাহস বা স্বার্থপরতা তাদের কারুরই নেই।"(৩খ, ১২৩ পৃ)

শুভা সংসারের প্রতি বেশ একনিষ্ঠ। নিজের স্বার্থের জন্য মানবিক অনুভূতিহীন হতে পারে না। সংসারকে না ছাড়তে পাড়ার এই মনোভাব শুভা চরিত্রে আলো ছড়ায় মানবিকতার। পরিবারের সংকটময় মুহূর্তে সবাই নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়াতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে অনেকেই স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নয়। কিন্তু কোমলপ্রাণ মানুষ এর ব্যতিক্রম যাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে অসীম মায়া-মমতা ও নিষ্ঠা। শুভা এই শ্রেণিরই প্রতিনিধি।

নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতা পুরোমাত্রায় শুভার মধ্যে রয়েছে। সে নিজের অর্থনৈতিক টানাপড়েন লুকাবার সচেতন প্রয়াস চালায়। সেজন্য সে রোদে পুড়ে গেলেও জীর্ণ ছাতাটা খুঁজে পেলেও সে তা সঙ্গে নেয় নি। চাকরিজীবী শ্রেণির মানানসই পোশাক সে সংগ্রহ করে। এ সম্পর্কে লেখক তার অবস্থাকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "ছাতিটা খুঁজে পেয়েও কিন্তু নিতে পারে নি। হাতলটা চিড় খেয়ে কাপড়ের রঙ জ্বলে গিয়ে যা চেহারা হয়েছে, ওটা নিয়ে অন্তত সিনেমা হলে ঢোকা যায় না। সাজপোশাক এমন কিছু বাহারে তার নয়, কিন্তু ছাতাটা যেন দৈন্যদশার মূর্তিমান প্রতীক হিসাবে সে-সাধারণ বেশভূষার সঙ্গেও বেমানান।" (৩খ, ১২৩ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

বিজয়ের সঙ্গে যদি দেখা না হয় শুভা এই ভয়ে কাছের দোকানে গিয়ে কিছু খেতে পর্যন্ত যাওয়ার সাহস করে নি। কারণ সে শঙ্কায় যে বিজয়ের এমনি দেরি হয়ে গেছে। শুভা আসে নি মনে করে যদি বিজয় চলে যায়।

শুভা কিছুটা আত্মসচেতন মহিলা। অফিসের কেউ যেনো তাদের সম্পর্ক আঁচ করতে না পারে সেজন্যে বিজয়ের মতো সেও কৌশলী আচরণ করে। অফিসে তার অবস্থান ছিল এমন সচেতনতামূলক—

> "বিজয়ের সঙ্গে অফিসেই পরিচয় হবার পর এইটুকু ঘনিষ্ঠতাতেই তারা পৌঁছেছে। অফিসে সামান্য দু-চারটে কথা, অন্য সকলের কৌতূহল বা কৌতুক জাগাবার কোনো সুযোগ না দিয়ে, কখনো একটু চোখাচোখি আর ফাইল চালাচালির মধ্যে, কখনো একটা চিরকুটে বিজয়ের সংক্ষিপ্ত একটু চিঠি— সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকব।"(২খ, ১২৩ পৃ)

তারা নিজের সম্পর্ক গোপন রাখার চেষ্টা চালালেও তাদের অফিসের সুপার মিঃ ঘোষ তাদের সম্পর্কের বিষয়টি টের পেয়ে যান। বিজয় ও শুভাকে এই নিয়ে তিনি ঠাট্টাও করেন। শুভা ছোট ভাইকে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য ছুটি চাইতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। কর্মদিনে তার সামনের প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলার সুযোগ পায় না। তার আগেই মিঃ ঘোষ তার পরিচয় নিয়ে আঘাত করে। এ সময় তার বক্তব্য ছিল এমন—

> "ওঃ, ছুটির দিনগুলোয় তো আপনার আবার অন্যসব কাজ ! বেশ দেরি করেই আসবেন কাল। ভরতি করা তো বছরের একবারের বেশি নয়। না, কি আরো ভাইবোন আছে ক্রমশ প্রকাশ্য ? " (৩খ, ১২৪ পৃ)

মিঃ ঘোষের এ মন্তব্য যে কোনো সচেতন মানুষের ব্যক্তিত্ববোধে আঘাত হানতে বাধ্য। শুভা তেমনি আহত হয়। শুধু তাই নয়, তার পরপরই তাকে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। মিঃ ঘোষ শুভাকে কম কাজ আছে এমন জায়গায় পোস্টিং করে দেয়ার কথা বলেন। মিঃ ঘোষের কথায় সে বুঝে যায় এ পরিস্থিতিতে তার চাকরির উপর টান পড়তে পারে। তই সে নিম্ন মধ্যবিত্তের যে চরম সংকট তার মুখোমুখি হয়। সে চাকরি রক্ষায় বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবতে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে তার ভাবনা ছিল এমন—

> "রাগে-ক্ষোভে তখন শুভার চোখে জল এসেছে। 'না।' বলে কোনোরকমে নিজেকে সামলে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে ঘোষের কামরা থেকে। আর সেই মুহূর্তেই সঙ্কল্প করেছে বিজয়ের সঙ্গে এই ক্ষীণ হৃদয়ের সম্পর্কটুকুও ঘুচিয়ে দেবার। বিজয়কে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেবে যে নিষ্ফল একটা স্বপ্নবিলাসের জন্যে জীবিকাকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

> সাহস তার নেই। হপ্তার আর ছটা দিনের মত জীবনের রবিবারগুলোও ধূসর বিস্বাদ হয়ে যাওয়া তার সইবে, কিন্তু জেনেশুনে নিজের চাকরির ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবে না।"(৩খ, ১২৫ পৃ)

এখানে অলৌকিক প্রণয় নয় শুভা প্রাধান্য দিয়েছে জীবিকাকে। তার অবস্থান থেকে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া অস্বাভাবিক নয়। এটি নিম্ন মধ্যবিত্তের সনাতন বৈশিষ্ট্য। শুভাও এই বেড়াজাল ভাঙবার সাহস অর্জন করতে পারে নি। অবশ্য শুভাকে এই জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় না। বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানানোর যে উদ্যোগ নেয়, তার আর প্রয়োজনই পড়ে না। কেননা তার আগেই বিজয় পিছুটান দিয়েছে। সেদিন নির্দিষ্ট ঐ পেট্রোল পাম্পের কাছে রোদে পুড়ে শুভা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও বিজয়ের দেখা পায় নি। দেখতে দেখতে সিনেমা দেখার সময়ও গড়িয়ে যায়। কিন্তু ধৈর্য ধরে সে অপেক্ষা করে বিজয়ের জন্য।

পঞ্চশর'র প্রথম গল্পের নায়িকা চিত্রা। শত সঙ্কটেও নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখার প্রয়াস চালায়। অল্প বয়সেও মনের অজান্তে সে সমাজের রূঢ় বাস্তবতাকে অনুধাবন করে। তাই অল্প বয়সে একদিন সে বড় লোকের বাড়ির বধূ সাজতে অস্বীকার করে। মাত্র সাত বছর বয়সে অনন্তের মা ও তাদের বাড়িওয়ালা ছোট বেলায় তাকে বধূ বানানোর স্বপ্ন দেখাতো। অনন্তের মায়ের কথায় সে বধূ সাজতো। এসময় সে অনেক কথাও বলতো।

সে সময়ে সে অনন্তের মায়ের কথায় জবাব দেয় এভাবে—

> "তোমরা বড়োলোক, আমরা গরিব, তোমাদের কত টাকা, আমরা তো তোমাদের ভাড়াটে। তোমাদের বৌ হব না।"(২খ, ২৮২ পৃ)

এ সময়ে অনন্ত একটু বিস্মিত হয় চিত্রার কথায়। সেই ছোট বেলার অতি পরিচিত চিত্রা তার কাছে হয়ে উঠে দুর্জ্ঞেয় নবযৌবনা। ছোট বেলায় প্রগলভা চিত্রা যৌবনে এসে মৌন হয়ে যায়। এসময় চিত্রার প্রতি চরম কৌতূহল প্রকাশ করে অনন্ত। চিত্রার মাও চেয়েছিল অনন্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠুক। এমনকি অনন্ত চিত্রাদের বাড়িতে অবসর সময় কাটানোর অংশিদার হয়ে উঠে। চিত্রার মা তাস খেলারও আসর বসান। এ সময় চিত্রার মা অনন্তের কাছ থেকে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধাও গ্রহণ করেন। এটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে নি চিত্রা। চিত্রা তাই অনন্তের কাছে একদিন টাকা চেয়ে বিদ্রূপ করে। কেননা চিত্রা বুঝতে পারে অনন্তের টাকার কারণেই তার মা দুর্বল। এ কারণে চিত্রার মা জ্ঞাতি ভাই জিতেনকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছেন। চিত্রা বুঝতে পারে তার মা এটা করেছেন অনন্তকে খুশি করার জন্য। মায়ের এই আচরণ চিত্রা সমর্থন করতে পারে না। চিত্রা একদিন অনন্তকে জব্দ করতে কিছু টাকা ধার চায়। এখনই এত বেশি টাকা দিয়ে কি করবে অনন্ত জানতে চাইলে চিত্রা জবাব দিয়েছে এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "ও, তুমি তো আরো অনেক ঘুষ দিয়েছ বটে ! বাবাকে ঘোড়দৌড়ের জন্যে ধার দিয়েছ, দু মাসের ভাড়া নিজের পকেট থেকে বাড়িতে দিয়েছ ....."(২খ, ২৮৪ পৃ)

অনন্তের প্রতি চিত্রার যে বিরূপ ধারণা তা হয়তো ভিন্নভাবে আসতে পারতো। সে সুযোগও ছিল। এক্ষেত্রে দুজনের সম্পর্ককে যখন প্রেমমুখি করার সুযোগ এসেছিল তা ব্যর্থ হয়েছে অনন্তের উচ্চবিত্ত সুলভ অহমিকায়। যা কোমল নারীর মানসলোকে কঠিন পাথরের ফসল বুনেছে। সে প্রস্তর খণ্ডে পরবর্তীতে কোমল জমিন পায় নি অনন্তের ভালোবাসা।

একসময় অনন্ত মনে মনে যা ভেবেছিল তা যদি চিত্রার কাছে উপস্থাপন করতো তাহলে হয়তো নারী হৃদয়ে প্রেমের উন্মোচন হতো। তেমন আশাবাদী উচ্চারণ অনন্তকেও করতে দেখা যায়। অনন্ত বলেছি—

> "হয়তো সেদিন নিজের অন্তরের বিপুল আকুলতার পরিচয় দিয়ে এই অপরূপ চিরমৌন মেয়েটির দুর্ভেদ্য অন্তরের কয়েক মুহূর্তের এই উত্তেজিত অসাবধানতার অবসরেই প্রবেশাধিকার পেতে পারতাম।"(২খ, ২৮৪ পৃ)

তবে সুযোগ ছিল চিত্রার মনের দ্বার খুলার। কিন্তু সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক ব্যবধান। যদি চিত্রার অবস্থান অনন্তের সমপর্যায়ের হতো তাহলে এই ব্যবধান ও সংকট তৈরী হতো না। এই সংকট সমাজেরই অংশ। এই সংকটে পড়ে ভুগতে হয় না উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিকে। ভুগতে হয় নিম্নবর্গের প্রতিনিধিকে। যেমন ভুগতে হয় চিত্রা ও তার পরিবারকে।

এমন মানসিক দৃঢ়তা দেখাবার পর দশ বছর বাদে চিত্রা অনন্তকে একটি চিঠি লেখে। তাতে সে অনন্তকে জানিয়েছে—

> "এতদিন নিজেকে ভুল সান্ত্বনা দিয়েছ, তোমার সান্ত্বনা অসার মিথ্যা; হৃদয়ের কোনোখানে একটি আঁচড়ও তুমি রেখে যেতে পারনি— তোমার অসহ্য দর্প এখনো হয়তো ওই সান্ত্বনা আশ্রয় করে খাড়া হয়ে আছে ভেবেই এতদিন বাদে এইটুকু লিখলুম।"(২খ, ২৮১ পৃ)

তবে এই চিঠির মধ্যে দিয়ে চিত্রার মনের দুর্বলতা প্রতিফলিত হয়েছে। এটি মধ্যবিত্তের একটি স্বভাব। কেননা মধ্যবিত্তের মনে কোনো বিষয় খুঁত খুঁত করতেই থাকে তাই দশ বছরেও অনন্তের আত্মবিশ্বাসের কথা চিত্রা ভুলতে পারে নি। অনন্তের ধারণা ভাঙানোর এই প্রয়াসও মধ্যবিত্তেরই প্রবণতা। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ তার মনোভাব প্রকাশ করার লোভ

Dhaka University Institutional Repository

সামলাতে পারে না। ভুল যেনো তার ভাঙাতেই হবে। উচ্চবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষ হলে এমনটি করতো না। কারণ এই দুই শ্রেণির বিশ্বাস মোটামুটিভাবে একই রকম। তারা ভাবে তাকে নিয়ে কে কি ধারণা করল তাতে তার কিছু আসে যায় না। তারা এই চিঠি পাঠানোর জন্য যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় তাকে অপচয় হিসেবেই দেখতো। যেমনিভাবে দশ বছর পর চিত্রার চিঠি পেয়ে তা পড়ে ছিড়ে ফেলেছে অনন্ত। ঠিকানাটা রাখবারও প্রয়োজন মনে করেনি। সচেতনভাবে সে এড়িয়ে যায় চিত্রাকে আবার যেনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে এই ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরের ভুল ভাঙায় প্রথমে চিত্রা অর্থ ব্যয় ও আত্ম সম্পাদন করেছে। তবে জিতেন ও চিত্রার মধ্যে দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠেছিল কিনা তা জানা যায় না।

ভূমিকম্প গল্পের মালতীর জীবনের উচ্ছলতা কেড়ে নেয় মানসিক সংকট। মালতীর মানসিকসংকট স্বামীর প্রথম স্ত্রীকে ঘিরে দেখা দেয়। শশাঙ্ক তার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মালতীকে বিয়ে করে। বিয়ের পর সংসারে মালতী স্বাভাবিক ছিল। এসময় তার মানসিক বৈকল্য লক্ষ করা যায় না, এতে ধরে নেয়া যায় মালতী স্বামীর আগের বিয়েকে মেনেই নিয়েছিল। কিন্তু বিপত্তি বাধে স্বামীর মানসলোকে প্রথম স্ত্রী সব আসন দখল করে থাকায় । একটু পরিষ্কার করে এভাবে বলা যায় যে, প্রথম স্ত্রী এখনো পরিপূর্ণ সত্তা নিয়ে স্বামীর মনে বিরাজ করে। সেখানে আর কারো পক্ষে সে আসন দখল করা বেশ কেঠিন। মালতীর প্রতি দেয়া নিচের এই আদেশ শশাঙ্কের মানসিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে—

> "এ ঘরে ওর অপমান যেন কখনো না হয় মালতী। কোনো দিন যেন আমরা মনে না করি ও শুধু একটা ছবি !"(২খ, ৬৬ পৃ)

স্বামীর এই মন্তব্যে মালতীর মনে চরম অভিঘাত সৃষ্টি হয়। এ শুধু যেনো একটি আদেশ নয় প্রাণ প্রাচুর্য হরণকারী বিষ। যা নিমিষে মানুষের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দেয়। তবে মালতীর সংশয় সৃষ্টির জন্য শশাঙ্কের অজ্ঞতাই দায়ী। শশাঙ্ক মালতীর মনের পরিবর্তনের কারণ অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। শশাঙ্ক ও মালতীর মনোভাব বুঝতে সহায়তা করে লেখকের এ মন্তব্য—

> "কেন যে কেটে গেছে শশাঙ্ক ভালো বুঝতে পারে না। ঠিক যে ঝগড়া তারা করে তা নয়, বাইরে থেকে তাদের জীবনে পরস্পরের প্রতি বিরূপ হবার কোনো কারণ আছে বলেও শশাঙ্কর মনে হয় না। তবু কেমন যেন তারা মিলতে পারছে না সম্পূর্ণ ভাবে। কোথায় তাদের অবচেতন মনে রয়েছে একটা আশঙ্কা, এমনকি একটা আক্রোশও বলা যেতে পারে পরস্পরের বিরুদ্ধে। শশাঙ্কর না থাক মালতীর আছে নিশ্চয়।"(২খ, ৬৪ পৃ)

মনের বাতাবরণ স্বামীর কাছে আর মালতী খুলতে পারে না। অথচ মালতীর হৃদয় জয় করতে শশাঙ্ক উন্মুখ হয়েছিল । সেকারণে অর্ধনমিত হিসেবেই মালতী থেকে যায়। শশাঙ্কের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

মালতী তার মনের জানালা না খুললেও সে সংসার ধর্ম ঠিকই পালন করে যায়। বরং এ ক্ষেত্রে সে অন্য নারীদের থেকে বেশ এগিয়ে রয়েছে। স্বামী না চাইতেই সব প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছে। এমনকি স্বামীর মোজা ছিঁড়ে গেলেও তা তার দৃষ্টিতে এড়ায় নি। সে নিজ উদ্যোগে মোজাগুলোকে সেলাই করে পড়ার উপযোগী করে তুলেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলেও বলা যায় মালতী সংসারকে নিচে নামিয়ে আনে নি। সংসারের অন্যান্য দায়িত্ব সে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। মালতির এ অবস্থানকে লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> "বাইরে থেকে দেখলে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনো চিড় চোখে পড়বে না বোধ হয়। বেশ মসৃণভাবেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। মালতীর কোনো দোষ কোনো ত্রুটি নেই। গৃহলক্ষ্মী হিসাব সে আদর্শ। সংসারের তত্ত্বাবধান সে এমন নিখুঁতভাবে করে যে শশাঙ্ককে কোনো দায়ই পোহাতে হয় না। নিঃশব্দে ঘুরে চলে দিনের চাকা।" (২খ, ৬৫ পৃ)

তবে মালতীর এই আয়োজন সেবা বা আনন্দের জন্যে নয় তা নিরস কর্তব্যবোধের।

মালতী অবশ্য আঘাত দিয়ে শশাঙ্কর অগ্রসর হবার চেষ্টাকে প্রতিহত করে নি কিন্তু তুষার শীতল ধৈর্যের কাছে এসে শশাঙ্কর সমস্ত আবেগের উত্তাপ গিয়েছে সংকোচে জড়িয়ে। শশাঙ্ক আদর করলে মালতী রাগ করে না, বাধা দেয় না কিন্তু কী এক অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে অদৃশ্য এক খোলসের মধ্যে গোপন করে ফেলে। শশাঙ্ক বুঝতে পারে তার কোনো আবেদন সে খোলস ভেদ করে ভেতরে পৌঁছাচ্ছে না। হতাশ হয়ে সে তাই নিজেকে সংযত করে। কিন্তু মালতী আঘাত না দিলেও এ আত্মদমনের ক্ষতিকর একটা দিক অবশ্যই আছে। শশাঙ্কের আত্মা পর্যন্ত সে আঘাতে যেন জর্জর হয়ে উঠেছে।

মালতী আঘাত পেয়ে মনকে তালাবদ্ধ করেছে। তা এখন চরমভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে শশাঙ্কের মনকে। শশাঙ্ক অবশ্য চেয়েছে তার সে ভুল সংশোধন হয়ে যাক।

মালতী যে সবসময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে তা নয়। কখনো কখনো তার আবেগ প্রকাশ পেয়ে যায়। পরক্ষণেই সে তা গোপন করে নেয়। শশাঙ্ক তার প্রথম স্ত্রীর ছবি নামানো হয়েছে কেনো এ প্রশ্ন করলে মালতী উত্তেজিত হয়ে উঠে। যদিও তা তার স্বভাব বিরোধী। লেখক মালতীর এ রূপ তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "এমন ভাবে বাহুল্য-প্রশ্ন করে কথা বাড়ানো মালতীর স্বভাব নয়। তার গলার স্বরেও বুঝি অস্বাভাবিক একটু উত্তেজনার রেশ ছিল।"(২খ, ৬৬পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

শশাঙ্ক ভালো না লাগার প্রশ্ন তুলে বাপের বাড়িতে দিয়ে আসার প্রশ্ন তুললে মালতী অসাধারণ আত্মসংযমের পরিচয় দেয়। আশংকা ছিল এবার বুঝি মালতী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। তা কিন্তু হয় নি। মালতী এবারও বিজয়ী হয়েছে। তার এ সংযমকে লেখক দেখেছেন এভাবে—

> "মালতী মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। তার সমস্ত মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে। মনে হল তার স্বাভাবিক ধৈর্য বুঝি আর থাকবে না ! তার অবিচলতার মুখোশ বুঝি ভেঙে পড়ে আবেগের ভারে। কিন্তু মালতী এবারেও জয়ী হল।" (২খ, ৬৭ পৃ)

মালতীর হৃদয় অতি কোমল। মানসিক আঘাতে তা অনেক বেশি শক্ত হয়ে গেছে। পরে অবশ্য মালতী আর আগের মতো কোমল স্বভাবে ফিরে আসে নি। সে যে মানসিকভাবে অতি কোমল তা বুঝা যায় ঘুমের মাঝে শশাঙ্ক যখন এভাবে আবিষ্কার করে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে—

> "চুপ করে খানিক শুয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে অন্ধকারে পাশে হাত বাড়ালে। হাতে ঠেকল মালতীর চুল। এইবার তার নিদ্রার ঘোর ও স্বপ্নের বিভীষিকা কেটে যাচ্ছে অনেকটা। মালতীর মৃদু নিশ্বাসের শব্দ নিস্তব্দ অন্ধকারে সে শুনতে পেল। সে শব্দেও যেন একটু আশ্বাস আছে। সেই নিশ্বাসের মৃদু শব্দটিতে যেন মালতীরও আর একটি পরিচয় আছে। হাতটা আরেকটু নামিয়ে শশাঙ্ক মালতীর গালের ওপর এবার রাখলে। অপরূপ স্নিগ্ধ কোমলতা। সমস্ত মন জুড়িয়ে যায়। সমস্ত দেহ প্রথম মেঘের ছোঁয়ালাগা গ্রীস্মের আকাশের মতো নরম হয়ে আসে। এই কোমলতা এ স্নিগ্ধতা সে মালতীর সমস্ত সত্তার কাছেই তো প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয়েছে কি ? নিদ্রিত মালতীর এই রূপের সঙ্গে জাগ্রত মালতীর যে অনেক তফাত।"(২খ, ৬৪ পৃ)

এ অংশ থেকে এ সত্য প্রতিফলিত হয় যে মালতী স্বভাবগতভাবে অন্তত কোমল। সে তার চরিত্রে কঠিনতা দান করেছে স্বামীর মানসিকতার প্রতিক্রিয়ায়। যে কঠিন আবরণ এখন সে সচেতনভাবে সরিয়ে নিতে পারে না।

অদ্ভূত এক শক্তিবলে শশাঙ্ককে সে প্রতিহত করে। যেখানে তাকে আশ্রয় নিতে হয় না নীচ ও অস্বাভাবিক আচরণের। ষোলো-সতেরো বছরের এই নারী অত্যন্ত আত্মসংযমী। লেখক মালতীর এই দৃঢ় মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "মালতী সব অবস্থাতেই এমনই সুন্দর এমনই অনধিগম্য চিরকাল। দরিদ্র শ্বশুরকে নিজের মহানুভবতায় কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে যে দিন সে মালতীকে ঘরে এনেছিল তখন কত-বা তার বয়স হবে— বড় জোর

Dhaka University Institutional Repository

> ষোল কি সতেরো। কিন্তু মালতীর চারিধারে তখন থেকেই এই তুষার প্রাচীর ছিল দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে।" (২খ, ৬৫পৃ)

তাদের দূরত্ব ভূমিকম্প একবার দূর করেছিল। শশাঙ্কের মনে আশা বাসা বেঁধেছিল এইবার বুঝি মালতী স্বাভাবিক হয়ে ধরা দিয়েছে। ভূমিকম্পের সময় তার আত্মসংঘমের খোলস খুলে ফেলায় অত্যন্ত আবেগঘন আচরণ করেছিল শশাঙ্কের সঙ্গে। শশাঙ্ক এ সময় ভুল করে নি। সে তার প্রথম স্ত্রীর ছবি অক্ষত রাখা নয় প্রাধান্য দিয়েছে মালতীর জীবনকে। তাই মালতীকে বাইরে আসার আহ্বান জানিয়েছে। এসময় মালতীর মনেও জেগে উঠে ভালোবাসা। লেখক এ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> "দুজনের একবার দৃষ্টিবিনিময় হল। সে দৃষ্টির ভাষা জটিল, গভীর, শব্দের অতীত। দুজনে এবার দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে পরস্পরকে জড়িয়ে— "(২খ, ৬৮ পৃ)

মালতীর এই পরিবর্তন স্থায়ী রূপ পায় নি। ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার পর সে আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। কেটে যায় তার আচ্ছন্ন ভাব। সে হয়ে উঠে আগের আত্মস্থ অবিচলিত মালতী। মালতীর এই কঠিন রূপ শশাঙ্ককে বিপর্যস্ত করে। শশাঙ্কের চেয়ে মালতী অনেক বেশি জটিল চরিত্র। কেননা মালতী একবার যা গ্রহণ করেছে তা সহজে সে পরিহার করতে পারে নি।

স্বামীর দৃষ্টি তার প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার পর সে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারতো। মালতী স্বাভাবিক হয়ে উঠলে জটিল হতো না তাদের সংসার । বলা যায় মালতী অত্যন্ত জটিল চরিত্র।

প্রত্যাগত গল্পের নায়িকা সরসী মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তার জন্য মা-বাবার গঠনমূলক ভাবনা ছিল এমনটি লক্ষ করা যায় না। মা-বাবা ভেবেছেন সে চিরন্তন বাঙালি মেয়ের মতো স্বামীর ঘর সামলাবে। সেজন্য তারা ছেলেও পছন্দ করে রেখেছেন। ছেলেটি গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা মেধাবী ছাত্র। যার জলপানি পেয়ে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা এক রকম নিশ্চিত। বাবা-মার এই পছন্দের ছেলেকে সরসী ভালোবেসে ফেলে। তার মানসমূলে আছে সংসার ধর্ম পালনের আকাঙ্ক্ষা। নিজের পায়ে দাঁড়াবার কোনো প্রয়াস তার নেই। তার লক্ষ্য অগ্রসর হয় সরোজকে ঘিরে। সরোজের সঙ্গে তার ভালোবাসায় উগ্রতা ছিল না। তাই দেখা যায় সরোজকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিয়েছে। তখনকার মেয়ে বলে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়াতে অন্যরকম এক সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়ায়। যার মধ্যে থাকে অনন্য মাধুর্য। এই মাধুর্য সরসী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরোজের প্রতি তার ভালোবাসায় খাদ নেই। সরোজ যখন জলপানি পেয়ে বিলাত যেতে ব্যর্থ হয় তখন সরসী নিঃস্বার্থভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। সরোজ জল পানি না পাওয়ায় সে ব্যথিত হয়। সে আরো ব্যথিত হয় যখন দেখে সরোজের বাসনা কোনোভাবেই পূর্ণ হচ্ছে না। এই সহজ সরল প্রণয়নী

Dhaka University Institutional Repository

সরোজের মানসিকতা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারে না। লেখক তার এ না পারাকে এভাবে তুলে ধরেছেন—

> "সরসী সরোজের এ অদম্য উচ্চাশা বুঝিতে পারে না, জীবনের সুখের ও আনন্দের ধারণা তাহার আলাদা। তবু সে কাতর ভাবে বলিয়াছিল, 'কিন্তু আর উপায় কি নেই!"(২খ, ২৪ পৃ)

সরোজের উত্তেজনা ও আক্রোশ দুই-ই সরসীর দুর্বোধ্য মনে হয়। এ কথা ঠিক যে সরোজের মনোভাব তার কাছে দুর্বোধ্য হলেও তার হতাশা ও বেদনাকাতর মুখ সে সহ্য করতে পারে না।

তাই সরসী সরোজের হাতে তার গয়নার বাক্স নির্দ্বিধায় তুলে দেয়। যে গয়না সরসীর মা অনেক যত্নে রেখেছিলেন মেয়ের বিয়েতে দিবেন বলে। এই বাক্স নেয়ার পর কথাচ্ছলে সরোজ যে প্রশ্ন করেছিল তার উত্তর দিয়েছিল সরসী এভাবে—

> "এ তো তোমারই।"(২খ, ২৫ পৃ)

সরসী এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছে যে তার প্রেমে কোনো দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই। এই দুঃসময়ে চরম ও নির্লজ্জভাবে তা আত্মপ্রকাশ করে। এই চরম আত্মত্যাগের পর তার জীবনে প্রশান্তি নয় এসেছে দুঃখময় সময়। কেননা নতুন জীবনে প্রবেশ করে সরোজ এক প্রকার ভুলেই যায় সরসীকে। এরমধ্যে সরোজ একবার শুধু অপরাধ স্বীকার করে উমেষবাবুকে সুদীর্ঘ এক চিঠি লেখে। তা লিখেছিল সরসীকে সমস্ত গ্লানি থেকে উদ্ধার করার জন্য। সেই চিঠির উত্তরে সরোজ পেয়েছিল শুধু উমেষবাবুর মৃত্যু সংবাদ।

তারপর সংবাদপত্রের এক খবরে সরোজ জানতে পারে সরসীর মাকে বাড়িওয়ালা তুলে দেয়ার চেষ্টা চালায়। প্রতিবেশিরা বাড়িওয়ালার এ নিষ্ঠুরতায় বাধা দেয়ায় এ নিয়ে মামলাও হয়। তবে সরসীর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। লীলাদের বাড়িতে সরোজের কল্পনায় ভেসে আসে সরসীর মুখ। লেখক সে পরিবেশকে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> "খানিক বাদে সে ঘর হইতে উঠিয়া বাড়ির আর-একদিকের দোতলার খোলা বারান্দায় তাহাকে বসিতে হইয়াছে। সেখানে আরো অনেকে আসিয়াছে। সরোজ তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, গল্প করিয়াছে, হাসিয়াছেও বই কি। বারান্দা হইতে সামনের একটি টিনের চালের বাড়ি দেখা যায় বুঝি। কান পাতিয়া থাকিলে মুমূর্ষু কোনো বিধবার শ্রান্ত নিশ্বাসও শোনা যায় নাকি ! আর একটি ম্লানমুখী মেয়ের নিঃশব্দ সঞ্চরণ ?" (২খ, ২৬ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

গল্প শেষে এ কথাই বলা যায় সরসীর শেষ পরিণতি না দেখতে পেলেও পাঠক মনে তার জন্য বিশেষ সহানুভূতি জন্ম নেয়। এই সহানুভূতি পাঠক মনে জাগে সরসীর আত্মত্যাগ ও দ্বিধাহীনতার কারণে। সমাজে সরসীর মতো নারী চরিত্র বিরল নয়।

শুরু ও শেষ গল্পে আছে নারীর জীবনে চরম জটিলতা সৃষ্টির রহস্য। এই রহস্যের জালে জড়িয়ে যায় গল্পের মূল নারী চরিত্র নলিনীর জীবন। নলিনী কলকাতার চাকরিজীবী অজয়ের স্ত্রী। নলিনী স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করে। স্বামীর আত্মীয় ইন্দুকে ঘিরে সৃষ্টি হয় তার জীবনের জটিলতা। একটি চিঠির আগুনের হলকায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নলিনীর সংসার। স্বামীর সঙ্গে সৃষ্টি হয় তার চিরকালীন অবিশ্বাস। এই চিঠি পাওয়ার আগে নলিনীর সংসার সুন্দরভাবে চলছিল। স্বামীর প্রতি তার তৈরী হয়েছিল গভীর বিশ্বাস।

এই চিঠি নিয়ে শুরু হয় নলিনীর মনে অন্তঃক্ষরণ। তা থেকে চরম মান-অভিমানের সৃষ্টি হয়। কেননা এই চিঠি পাওয়ার পর অজয় শত চেষ্টা করেও নলিনীর মান ভাঙাতে পারে নি। এই চিঠিকে ঘিরে তার মনে যে অবিশ্বাস জেগেছে তা নলিনী স্বামীর কাছে প্রকাশ করেছে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময়। ইন্দুকে ইর্ষা করে নলিনী অজয়ের এই অভিযোগ অসত্য নয়। ইন্দুকে ঘিরে নলিনীর মনে ঈর্ষা জাগে। এ সম্পর্কে নলিনী উচ্চারণ—

> "আর স্বামী তো নেহাৎ মিথ্যা বলেন নাই। ইন্দুকে সত্যিই অকারণে সে একটু ঈর্ষা করে বই কি? ইন্দুর গান স্বামীর ভালো লাগিয়াছে শুনিয়া মন যে তাহার খারাপ হইয়াছিল এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না। অথচ মন খারাপ করিবার কোন হেতুই বলিতে গেলে তাহার নাই। ইন্দুর সহিত তাহার স্বামীর পরিচয় তো আজ নতুন নয়। অনেক দিনই তাহার গান তিনি শুনিয়াছেন। তাহার সহিত এ বাড়ির মেশামেশি অনেক কাল হইতে আছে। আর ইন্দু মেয়েটিও নেহাৎ সাদাসিধা। একটু চঞ্চল হয়ত, কিন্তু মনের মধ্যে ঘোর প্যাঁচ তাহার নাই ! সকলের সহিত অত্যন্ত সহজে সে আলাপ করে—দেখিলে মনে হয়, সে যে আসন্নযৌবনা নারী এ খবর সে যেন পায় নাই।"(১খ, ২৫৮ পৃ)

নলিনী আত্মবিশ্লেষণ ও ইন্দুর মনোভাব যেভাবে বিচার করেছে তাতে তাকে একজন প্রাজ্ঞ নারী হিসেবেই মেনে নিতে হয়। তবে মনে রাখতে হবে ইন্দু সম্পর্কে নলিনীর এ বিশ্লেষণ স্বাভাবিক সময়ের জন্য প্রযোজ্য। মানসিক টানাপড়েনের সময় স্বাভাবিক জ্ঞান নলিনী ধরে রাখতে পারে নি। সকালের মতো রাতেও সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। দু বেলাতেই বলা যায় নলিনী ইন্দু প্রসঙ্গে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। এটি নলিনী চরিত্রের একটি ব্যতিক্রমি দিক। আর একটা জায়গায় সে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, তা হল ইন্দুর চিঠি খুলে

Dhaka University Institutional Repository

না দেখে তা নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া। কেননা এই চিঠিটি সে আগেই পড়ে দেখতে পারতো। রাতে তো সে তা পড়তেই চেয়েছে। এবার অজয়ের অসহিষ্ণুতায় তা পড়া হয় নি।

অজয় ও নলিনীর মনের দুর্বলতার সুযোগে ইন্দু তাদের জীবনের সংকট হয়ে উঠে। অথচ সংকটকালে ইন্দুর উপস্থিতিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে। বেড়ে যাওয়া রাতের সঙ্গে নেমে আসা বৃষ্টি তার মনে আঘাত করে। সে আঘাতে অজয়ের জন্য তৈরী হওয়া ভালোবাসা বিলীন হতে থাকে। শিক্ষিত রমণীর মনে যে বেদনা জাগে তা প্রশমনের সহজ উপায় বিরল। তা থেকে মুক্তি পেতে ঘরের দরজা বন্ধ করলেও মনের দরজা খুলে প্রবেশ করে সন্দেহের পুতিগন্ধময় বিষ। নলিনীর মনের এ অবস্থাকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "স্বামীর ভালবাসা সম্বন্ধে যেটুকু বিশ্বাস বিকাল হইতে তাহার মনে জাগিয়াছিল তাহা তখন একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে। যে যুক্তিগুলি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাহার কাছে অকাট্য ছিল তাহারই বড় বড় ফাঁকগুলি এইবার তাহার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। স্বামী তাহাকে ভালবাসে না— হয়ত কোনদিন বাসে নাই। তাহাদের বিবাহিত জীবনটা গোড়া হইতেই একটা করুণ প্রহসন— শুধু সেই নির্বোধের মত সর্বান্তকরণে এই প্রহসনে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিয়াছে।" (১খ, ২৫৯ পৃ)

সন্দেহের রথে উঠেই নলিনীর কল্পনা থামে নি। সে প্রশ্ন করেছে ভালো যদি নাই বাসে তাহলে বিয়ে করে প্রতারণা করবার কি দরকার ছিল। অজয় দ্রুত ফিরে এসে মান না ভাঙানোতে তা জোরদার হয়েছে।

এই সন্দেহের পরও স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঝি অজয়ের বিপদের আশঙ্কা ব্যক্ত করলে। নলিনী বিপদের আশঙ্কায় চরম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে। তারপর অজয় বৃষ্টিতে ভিজে ব'সায় ফিরে । আবার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় অজয়ের স্বাভাবিক আচরণে। কেননা এ সময় নলিনী অজয়ের কাছ থেকে কোমল ব্যবহার আশা করেছিল। তবে এ পর্যায়ে নলিনী সংকট মোচনের উদ্যোগ নিয়েছিল সেই চিঠি দেখতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে। অজয়ের অনমনীয় আচরণে তা ব্যর্থ হয়। বিমূঢ় হয়ে যায় এ ঘটনায় নলিনী। তবে তা আর বেশি দূর এগোয় না। এরপর অতিবাহিত হয় স্বাভাবিকভাবে তাদের দাম্পত্য জীবন। তবে তাদের মাঝে একটি বিভেদ রেখা অঙ্কিত হয়। তা আর কোনোদিন দূর হয় নি।

নিজের অর্থনৈতিক সংকট ঢাকার প্রয়াস শুভা চালালেও তার অবস্থান সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন। সে নিজের অবস্থান ভুলে যায় নি। সে বুঝে টাকা বাঁচাতে যারা সভ্য সমাজের বাইরে বাস করতে বাধ্য হয় তাদের লুকাবার মানসিকতা থাকা ঠিক নয়। এটা পরবর্তীতে বুঝতে পারলেও সে নিম্ন মধ্যবিত্তের লোকে কি বলবে এই মানসিকতা এড়াতে পারে নি। যা

Dhaka University Institutional Repository

তাকে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করায়। তবে তার এই যে পরিণত ভাবনা তার মূল্যও কিন্তু কম নয়। শুভার এ মনোভাবকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে–

> "কিন্তু খানিক বাদেই মনে হয়েছে সস্তার খাতিরে সুদূর শহরতলিতে যাদের এমন বাসা নিতে হয় যে ক্রোশখানেক না হাঁটলে সভ্যভব্য পাড়ার নাগাল পাওয়া যায় না, ছাতার চেহারা বিচার করে ব্যবহার করার শৌখিনতা তাদের সাজে না। "(৩খ, ১২৩ পৃ)

অনাবশ্যক গল্পের স্বর্ণময়ী মধ্যবিত্ত পরিবারের সফল গৃহিণী। তার সার্বিক ও একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে সংসার সফলতার উচ্চ শিখরে পৌছে যায়। এজন্য স্বর্ণময়ীকে পালন করতে হয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। অবশ্য তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয় স্বামীর আত্মভোলা স্বভাবের কারণে। স্বর্ণময়ীর স্বামী আত্মভোলা মানুষ হলেও দায়িত্বহীন নয়। কেননা চাকরি জীবন তিনি সফলভাবে শেষ করেন। স্বামী শুধু স্বর্ণময়ীর ওপর সংসার পরিচালনার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য স্ত্রীর ওপর এই ভার তুলে দিয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। স্বামী সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ায় স্বর্ণময়ী বাইরে বিরক্তি প্রকাশ করলেও মনে মনে আনন্দিত হয়েছে। স্বর্ণময়ীর সংসার সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য–

> "আর গত চার বছরই বা কেন ? সারাজীবনই তো তাঁকে সজাগ থাকতে হয়েছে। সমস্ত সংসারের ওপর সজাগ। স্বামী ছিলেন আপনভোলা লোক। পয়সা রোজাগার করে এনে দিয়েই খালাস। তারপর আর তার দায় নেই। দায় নেবার ক্ষমতাও ছিল না। চাকরির বাইরে তিনি একেবারে অসহায় শিশু।"(১খ, ১১৩পৃ)

এমন অবস্থায় স্বর্ণময়ী তিন ছেলে ও দুই মেয়েকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সংসার সম্পর্কে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> "সংসার তার সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। ছেলেরা মানুষ হয়েছে। বিয়ে থা করে সংসারীও হয়েছে সবাই। পয়সার অনটনও নেই। আর সবচেয়ে যা আনন্দের কথা এ সংসারে নেই অশান্তি। এমনি ভরা সুখের সংসার রেখেই নাকি লোকে অবসর গ্রহণ করতে চায়।"(১খ, ১১৫পৃ)

স্বর্ণময়ী একটি আদর্শ সংসার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এটি স্বর্ণময়ী চরিত্রের উজ্জ্বলতম দিক।

সংসার গড়ে তোলার সময় কখনো স্বামীর প্রতি স্বাভাবিক বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। স্বামী সংসারে উপার্জন ছাড়া অন্য দায়িত্ব না নেয়ায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। একারণে স্বামীকে এক পর্যায়ে স্বর্ণময়ী বলে বসেন–

Dhaka University Institutional Repository

> "পুরুষমানুষ হয়েছিলে কি করতে বলো তো? ঘরে বাইরে অত আমি তদারক করতে পারব না ! দোতলার ঘর তোলবার কি দরকার ছিল, যদি চুন সুরকিটা পর্যন্ত আনবার ব্যবস্থা না করতে পারো? কোথায় জানালা ফোটানো হবে, কোথায় দরজা বসবে তাও কি আমি বলে দেব রাজ মজুরকে ?"(১খ, ১১৪পৃ)

স্বর্ণময়ীর এই বিরক্তি শুধু সাময়িকই নয় তা তার মনের গভীর থেকে উঠে আসে নি তা বাহ্যিক রূপেই শুধু প্রকাশিত হয়েছে। অন্তরে তিনি সংসারের গুরু দায়িত্ব পালনের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছেন।

স্বর্ণময়ীর অন্তরে ভালোভাসা প্রিয়জন হারানোর বেদনা ও সংসারের প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুতে শোকাতুর স্বর্ণময়ীর অবস্থাকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে –

> "স্বামী পরিণত বয়সে মারা গেলেন। স্বর্ণময়ী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছেন পাকা মাথায় সিঁদুর মুছেছেন শিরে করাঘাত করতে করতে। তারপর আবার উঠেছেন বিনয়ের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে। বড়ো বউকে ধমকে বলেছেন, 'ছেলেটাকে বাঁচাতে দেবে না তুমি বউমা। বাছার পেট একেবারে ভুঁয়ে পড়ে গেছে ! কোন যুগে খাইয়েছিলে বলো তো ?"(১খ, ১১৪পৃ)

শুধু স্বামীই নয় সন্তান হারানোর বেদনাও তাকে সহ্য করতে হয়। ছোট মেয়ে একটি ছেলে রেখে স্বর্ণময়ীকে কাঁদিয়ে বিদায় নেয়।

স্বর্ণময়ী স্বামী, সন্তানের প্রতিই দায়িত্ব পালন করেন নি- ছেলে, বউ ও তাদের সন্তানদের ভালো থাকার প্রতিও তীব্র নজরদারি করেছেন।

সংসারের প্রতি চরম দায়িত্বশীলতার কারণে তিনি কিছু ভুল করে বসেন। অতি দায়িত্বশীলতার কারণে তিনি শুধু স্বামীর ওপরই নন পরিবারের কারো উপরই সংসার পরিচালনায় আস্থা রাখতে পারেন নি। সেজন্যে মেয়ের মৃত্যুর পর তীর্থে যেতে চেয়েও পারেন নি। স্বর্ণময়ীর অন্যদের ওপর যে আস্থার অভাব ছিল লেখক তা তুলে ধরেছেন এভাবে–

> "তীর্থে যাওয়া আর হয়ে উঠেনি। কেমন করে আর হবে? পাঁচ বছরের মা মরা ছেলে বেণুকে তা হলে মানুষ করে কে ? ছেলেটা বাঁচলে তবু মায়ের নাম থাকবে। বেণুর বিছানা সেই থেকে তাঁর খাটের ওপর হয়েছে। শুধু বেণুর জন্যেই তাঁর সংসারে থাকা নয়। তিনি না দেখলে এতবড়ো সংসার সামলাবেই বা কে ? কারুর ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই। নিজে না

Dhaka University Institutional Repository

> দেখলে কোনো বিষয়েই তাঁর স্বস্তি নেই। এ সংসারে সমস্ত দায় ঘাড়ে করে কারো সাধ্য নয়।"(১খ, ১১৪পৃ)

একসময় ছেলেদের বিশ্বাসও ছিল স্বর্ণময়ীর মতো। তাই তো স্বর্ণময়ী তীর্থে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় বিনয়কে বলতে শুনা যায়—

> "বেশ যাও! কিন্তু এখানে কিছু গোলমাল হলে আমি জানিনে।"(১খ,১১৪পৃ)

স্বর্ণময়ীর এ বিশ্বাসে ফাঁটল ধরে বেণুর আলাদা ঘরে শোয়ার মধ্য দিয়ে। স্বর্ণময়ী ভেবেছিলেন এ মনোভাব হয়তো সাময়িক। তাই বেণুকে আবার নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বেণু তাতে আরো বেশি করে চটে যায়। সে এখন থেকে একলা শুবে। সে কথামতো কাজও করে। বেণুর এ সিদ্ধান্তে স্বর্ণময়ী প্রথম আঘাত পান। স্বর্ণময়ীর মনে যে ভাবনার উদয় হয় লেখক তাকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "স্বর্ণময়ী বেণুর শূন্য বিছানায় হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে থাকেন। নিজেকে তাঁর সহসা অত্যন্ত অনাবশ্যক বলে মনে হয়। মনে হয় তিনি যেন অকারণে পথ জুড়ে বসে আছেন, নিজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে। বেণুর আর তাকে দরকার নেই। সে বড়ো হয়েছে। তাঁর স্নেহের আতিশয্যই তাকে পীড়িত করে। সে এখন স্বাধীন হতে চায়, আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। এই তো স্বাভাবিক, এই তো ভালো। হয়তো এই সংসারেরও আর তাঁকে এমনি দরকার নেই। এ সংসারও স্বাধীন হতে চায়। তিনি জোর করে তার ওপর নিজের শাসন ও শৃঙ্খলার ভার চাপিয়ে রেখেছেন মাত্র।"(১খ, ১১৬পৃ)

স্বর্ণময়ীর মনে যে ভাবনার উদয় হয়েছিল তা তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে নিজের মনে যে কষ্ট জমে ওঠে পরবর্তীতে তা থেকে অবশ্যই রেহাই পেতেন। সময়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারলে তা হতো অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বর্ণময়ী এমনটি ভাবলেও বাস্তবে সংসারের প্রতি কর্তৃত্ব খাটানোর বাসনা পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

সে কারণে বিনয়ের কাছে বাড়ির প্ল্যান দেখতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে তাকে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। কেননা তাকে প্ল্যান দেখিয়ে দরখাস্ত করার প্রয়োজন আর বিনয় অনুভব করে নি। এই যে পরিবর্তিত স্বাভাবিক পরিস্থিতি এটাই অস্বাভাবিক ঠেকেছে স্বর্ণময়ীর কাছে। স্বর্ণময়ীর জীবনের বেদনাকাতর দিক এটি। অবশ্য অনেক মানুষ আছেন স্বর্ণময়ীর মতো এমন ভুল করে বসেন আর কষ্ট পান। তাঁর কষ্টের পর্যায় চরমে পৌঁছায় যখন ছেলে ও ছেলে বউরা তার স্বার্থের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে ও তার সেবার জন্যে লেগে যায়। স্বর্ণময়ী নিজের

Dhaka University Institutional Repository

এমন পরিস্থিতি মেনে নেবার মানসিকতা অর্জন করতে সক্ষম হন নি। এটি স্বর্ণময়ীর জীবনের একটি ব্যর্থতা। এ মানসিকতা তাকে দ্রুত নিঃশেষ করে দেয়ার পথ তৈরী করে দেয়। আর হয়েছেও তাই। এ অবস্থায় স্বর্ণময়ী মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

পূনর্মিলন গল্পের বিত্তবান পরিবারেব গৃহিণী হিরন্ময়ী। স্বামী ব্যবসায়ী। তার পাঁচ মেয়ে কোনো ছেলে নাই। এতে কোনো দুঃখ নেই। কেননা মেয়েগুলিই তার প্রাণ। এখানে হিরন্ময়ী আর দশ জন বাঙালি নারীর চেয়ে প্রগতিশীল। পুত্র সন্তানের জন্য তিনি হাহাকার করেছেন এমন কথা গল্পে কোথাও উল্লেখ নেই। মেয়েদের তিনি সুখী দেখতে চেয়েছেন। স্বামীর ব্যবসায় এক পর্যায়ে ধসও নামে। কোনভাবে তা ঠেকিয়ে রাখা যায় নি।

বড় মেয়ের বিয়ে দেয়া পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো ছিল। বড় মেয়ে অমলাকে ঘটা করেই বিয়ে দেন। এ সময়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন–

> "তখন স্বামীর কারবারের অবস্থা ভাল, আঁচলা আঁচলা টাকা রোজ আসিতেছে বলিলেই হয়" (১খ, ১৭৬পৃ)

তারপর দ্বিতীয় মেয়ের বিয়েতে অতটা ঘটা করা সম্ভব হয় না। ভাঁটার টান এ সময়েই শুরু হয়। তারপর অবশ্য দু মেয়ের ভালো বিয়ে হয়। মেঝ মেয়ে কমলার বিয়ে হয় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। বার্মামুলুকে তার চাকরি। আর সেজ মেয়ে বিমলার বিয়ে হয় বিত্তবান পরিবারে। যা তারা কল্পনা করতে পারে নি। বিখ্যাত দত্ত পরিবারের ছোট ছেলে বর। যেমনি সুপুরুষ তেমনি ধনবান। এই মেয়েটি সুন্দর বলে হিরন্ময়ী চেয়েছিলেন জামাই যেনো সুন্দর হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এই মেয়েকে দোজবরে পাত্রের হাতে তুলে দেয়ার বিষয়টি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ধনবান হলেও পাত্র সুপুরুষ ছিল না।

হিরন্ময়ী অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক চাহিদাকে নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। তার কুৎসিত চতুর্থ মেয়ে নির্মলাকে বয়স্ক সাধারণ চাকরিজীবীর হাতে বিয়ে দেন। এতে তিনি দুঃখিত হন নি। অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

> "দেখাইবার মত জামাই নয় তবু হিরন্ময়ী বিশেষ দুঃখিত হইলেন না বোধ হয়। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আশা তাঁহার সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।" (১খ, ১৭৮পৃ)

তবে পঞ্চম মেয়ের বেলায় তাকে চরম পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। কোলের মেয়ে ক্ষ্যান্তর বিয়ে সম্পর্কে লেখককে তাই স্পষ্ট করে বলতে হয়—

Dhaka University Institutional Repository

> "ক্ষ্যান্ত কোলের মেয়ে তবু জানিয়া শুনিয়া তাহাকে এক রকম জলেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্মলার স্বামী তবু সামান্য চাকরী করিত। ক্ষ্যান্তর ভাগ্যে যে স্বামী জুটিল তাহার নিজের খাইবার সংস্থান নাই। নেহাৎই মেয়ের বিবাহের বয়স পার হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে মান রাখিবার জন্য ধরিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। মার্কা মারা বকাটে ছেলে, নেশাভাঙও সম্ভবতঃ করিয়া থাকে। আপাততঃ সে এক রকম ঘর-জামাই হইয়াই আছে।
>
> ক্ষ্যান্তর বিবাহের সময়েও হিরন্ময়ী সব মেয়েদের আনাইতে পারেন নাই। পয়সার অভাব, তাছাড়া মনে মনে বুঝি একটু লজ্জাও ছিল।"(১খ,১৭৮পৃ)

হিরন্ময়ী পরিবর্তিত এই চরম অবস্থাকে গ্রহণ করেছেন। যদিও সামান্য দ্বিধা তার মধ্যে ছিল। এই দ্বিধা জন্ম নেয়াটা অতি স্বাভাবিক। বলা যায় হিরন্ময়ী এখানে অসাধারণ জীবনমুখিতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ সব পরিস্থিতিকে মেনে নেয়ার সাহস তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ছোট মেয়ের বিয়ের পর স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা আবার কিছুটা ভালো হয়। যদিও পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে নি।

ছোট মেয়ের বিয়ের পাঁচ বছর পর তিনি তার আগের করা ব্রত পালন করতে চান। ব্রত উপলক্ষ মাত্র। এ উপলক্ষকে ঘিরে তিনি মেয়েদের একত্রিত করতে চান। ব্রত অনুষ্ঠানে নির্মলা ছাড়া আর সবাই আসে। নির্মলার স্বামী ছুটি না পাওয়ার আসতে পারে নি। বাকি চার মেয়েকে একত্রে পেয়ে হিরন্ময়ী নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হন। তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে সন্তানদের দেখতে পান না। তার একেক মেয়ে একেক রকম হয়েছে। বড় মেয়ে কর্তৃত্ব পরায়ণ। কমলা হয়ে উঠেছে অতি আধুনিক। সেজ মেয়ের পরিবর্তন হয়েছে আরো অস্বাভাবিক। তার বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার প্রাণের প্রাচুর্য আর অবশিষ্ট নেই। *অনাবশ্যক* গল্পে স্বর্ণময়ী সন্তানদের যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে পেয়েছেন। কিন্তু হিরন্ময়ী তা পান নি। হিরন্ময়ীর সঙ্কট মেয়েদের সামাজিক অবস্থান ও মানসিক পরিবর্তন নিয়ে। যদিও মেয়েরা যার যার অবস্থানে সুখী। একমাত্র ক্ষ্যান্ত কিছুটা ব্যতিক্রম। বিমলা অবস্য তার অবস্থান নিয়ে সুখী নয়। অন্য তিন জন এর বিপরীত অবস্থানে। এ পর্যায়ে হিরন্ময়ীর আত্মমূল্যায়ন—

> কিন্তু তাঁহার নিজের চোখে ঘুম নাই, অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার গভীর সুখ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, অনেক সাধ করিয়া তিনি মেয়েদের আনাইয়াছেন, একটি বাদে তাঁহার সমস্ত মেয়েই আজ একত্র হইয়াছে, তাঁহার ত অত্যন্ত সুখী হইবার কথা, কিন্তু সত্যই কি তিনি সুখী হইয়াছেন ? মেয়েদের ঠিক যেমনটি তিনি দেখিতে

Dhaka University Institutional Repository

চাহিয়াছিলেন, তেমনি কি তাহারা আর আছে ? ইহারা তাহার কন্যা, অথচ ঠিক যেন তেমনটি আর নাই।" (১খ, ১৮৩পৃ)

জীবনের বিচিত্রসংকট : ব্যক্তিজীবনের সংগ্রাম

মানুষকে সামাজিক রাজনৈতিক সংকটের বাইরেও ব্যক্তি জীবনের নানা সংকট মোকাবেলা করতে হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র অসাধারণ দক্ষতায় ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন। যা আমাদের সমাজে আজও প্রবহমান। তারই কিছু অংশ এখানে আলোচনা করা হল।

পঞ্চশরের তৃতীয় গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আল্লু। শ্রমিক থেকে সে ঠিকাদারে পরিণত হয়েছে। তবে তার এই পরিবর্তন সহজে আসে নি। এজন্যে তাকে অনেক সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। তার অর্থনৈতিক পরিবর্তন গল্পের নায়ক দীনেশের কাছেও ছিল অবিশ্বাস্য। তাই ট্যান্ডেলকে সবিস্ময়ে দীনেশ বলেছে—

"আল্লুর আবার বাড়ি হল কবে ? লোকের গদি-ঘরের রকের ওপর শুয়ে তো চিরকাল কাটালো !"(২খ, ২৯৬ পৃ)

শুধু অর্থসংগ্রহ নয় জীবন সঙ্গিনী নির্বাচনেও সে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। সে বিয়ে করেছে কর্মঠ ও সুন্দরী নারীকে। স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করেছে দায়িত্বশীল স্বামীর মতো। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ট্যান্ডেল যখন টাকার বিনিময়ে কসৌলিয়াকে অধিকার করতে চায় তখন তার যথার্থ জবাব সে দিয়েছে। আল্লু টাকা রেখে ট্যান্ডেলের হাত হ্যাচকা টানে কাবু করে ফেলেছে। ট্যান্ডেল কোনো মতে রক্ষা পায় দীনেশ কসৌলিয়াকে অধিকার করতে চায় এই কথা বলে। এসময় সে ট্যান্ডেলকে এই বলে শাসায়—

"নোকর কা হাত তোড়া, আউর মনিবকো শির বাকি হ্যায়। "(২খ, ৩০২ পৃ)

আল্লুকে শুধু ট্যান্ডেল নয় সবাই যে সমীহ করে তার পরিচয় পাওয়া যায় খয়রার কথা থেকেও। আল্লুর বিরুদ্ধে কৌশলে খয়রাকে লাগাতে চাইলে তাতে কাজ হয় নি। এ সময় দীনেশ ক্রোধ জাগিয়ে তোলার জন্য খয়রাকে টিপ্পনী কেটে বলে—

" কিরে ? আল্লুর নাম শুনে ভয় পেলি নাকি ?"(২খ, ৩০৩ পৃ)

তাতে খয়রাকে কিন্তু আল্লুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারে না। বলা যায়, খয়রা আল্লুকে শত্রু ভাবতে রাজি হয় নি। এ থেকে বোঝা যায় আল্লু মানুষ হিসেবেও খারাপ ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লু সাহসী তার প্রমাণ গল্পের নায়ক দীনেশও পেয়েছে। ট্যাক্সেলের সে কাজের পর দিন আল্লু ডেকে কথা বলতে চেয়েছে দীনেশের সঙ্গে। এ সময় সে সীমা অতিক্রম না করেও কৌশলে দীনেশকে চরমভাবে অপদস্থ করে। আল্লু সেদিন দীনেশকে বলেছে—

> "ভাড়াটা তবু মাফ করলেন না, বাবু ? তা নিয়ে যান কসৌলিয়াকে। আমীরের ঘরে তবু সুখে থাকবে, তবে বাবু নোকর পাঠিয়ে ভালো করেননি, ও তো, বাবু, পহেলা নিজের জন্যেই লিতে চেয়েছিল। আপনি আমীর লোক চান সে আলাদ্‌হা কথা। আর ও নোকর তাই বলে চাইব ! ওর হাতটা বাবু একটু মুচড়ে দিয়েছি। মোচড় খেয়েই তো বলে দিল যে আপনি পাঠিয়েছেন, ওর কোনো দোষ নেই।"(২খ, ৩০৩ পৃ)

এ বক্তব্য থেকে আল্লুর আত্মমর্যাদাবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। দীনেশের টাকা ফেরৎ দিয়েও সে আত্মসচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। এ বিষয়ে তার উচ্চারণ—

> "সে কি বাবু চলে গেলেন যে, তাহলে টাকাগুলো লিয়ে যান। মাল নেবেন না তবু টাকা দিয়ে যাবেন, সে কি হয় ?"(২খ, ৩০৪ পৃ)

আল্লুর এ মনোভাব পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ চেতনা তার চরিত্রকে উজ্জ্বলতর করেছে। শুধু আত্ম-মর্যাদা নয় নারীর সৌন্দর্য সম্পর্কেও সে সচেতন। কসৌলিয়ার সৌন্দর্য সম্পর্কে সে গল্পের নায়ক দীনেশকে বলেছে—

> " বাবুর নজর খুব ভালো আছে, কসৌলিয়া তো বড়ী খুপসুরত আছে ! "(২খ, ৩০৪ পৃ)

এসব বিবেচনায় আল্লুকে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশকারী হিসেবে ধরা যায়। আল্লু বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিশালী ও ব্যতিক্রমি চরিত্র।

আয়না গল্পের বিধুবাবু একটি নাট্যগোষ্ঠীর প্রবীণ অভিনেতা। বর্তমানে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করতে বাধ্য হচ্ছেন। তার দলের এখন অনেকেই ছেলে-ছোকরা। দলের ম্যানেজার অত্যন্ত কড়া। ঠিক সময়ে বিধুবাবু বিড়ি না কিনেই দ্রুত চলে আসেন। দলের অনেকেই যেমন মানিয়ে চলে তেমনটি বিধুবাবু পারেন না। এক্ষেত্রে নগেন ওস্তাদ। এর ওর কাছে টাকা ধার নিতে তার কোনো দ্বিধা নেই। অপমানিত হওয়ার ভয়ে নগেনের কাছে বিড়ি চাইতে পারেন না। তবে সময়ের সঙ্গে প্রতিবেশের যে পরিবর্তন হয়েছে তা বিধুবাবুর দৃষ্টিতে এড়ায় না। থিয়েটারে পয়সাওয়ালাদের আনাগোনা বাড়ছে। যেমন এসেছে হরিশের মতো পয়সাওয়ালা ছেলেরা। তবে এই পয়সা যে যুদ্ধের বাজারে কামাই করা বিধুবাবুর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অবশ্য হরিশ সম্পর্কে বিধুবাবুর এ ধারণায় পরিবর্তন আসে। আর তাদের আলোচনা ও মানসিকতার সঙ্গে কোনোভাবে নিজেকে মানাতে পারেন না। আর মানাবেনই বা কি করে

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের প্রতি যার মন একনিষ্ঠ। সে মন কখনো সাত আকাশ বিচরণ করতে চাইবে না। বিধুবাবুর মানসিকতা লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "থিয়েটারে আজকাল একমাত্র আলোচনার বস্তু তো সিনেমা। থিয়েটারে ছোটোবড়ো যে পার্টই যে করুক-না কেন, সকলের মন সিনেমার রাজ্যেই পড়ে আছে। কানু ছাড়া গীত নাই-এর মতো সবাই মুখে শুধু ফিল্মে কে কী পার্ট পেয়েছে বা পাবে তারই কথা। বিধুবাবুর সত্যিই ফিল্ম নিয়ে এই মাতামাতি ভালো লাগে না। ফিল্মের কাজে পয়সা অনেক বেশি, লোভও তাঁর আছে সেদিকে। মাঝে মাঝে দু-একটা পার্ট পেলে খুশিই হন, কিন্তু মন তাঁর এদের মতো নিষ্ঠাহীন দ্বিচারিণী নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে ফিল্মে তিনি কোনো মজাই পান না। সে কথা বলতে গিয়ে দু-চারবার একেবারে কোণঠাসা হওয়ার দরুন এখন তিনি এসব আলোচনায় বড়ো একটা যোগ দেন না।"(২খ, ২৪৮ পৃ)

তারপর থিয়েটার অন্তপ্রাণ এই মানুষটি যখন নিজের জগতের মানুষদের কাছে সিনেমার পক্ষে কথা বলতে দেখেন তখন ব্যথিত হন। ব্যথিত হন আরো এজন্য যে অর্বাচীনরাও এতে কম যান না। হরিশ তাকে সিগারেট নেয়ার অফার দিলে মনের অজান্তে না করে ফেলেন। এই নিয়ে নগেন উপহাস করার সুযোগও ছাড়ে না। এ পর্যায়ে বিড়ির নেশা তাকে পেয়ে বসে। বেরিয়ে যান বিড়ি কেনার জন্য বড় রাস্তায়। তার কাছে মনে হচ্ছিল বিড়িতে দুটো টান না দিলে হয়তো পার্ট-ই ভুলে যাবেন। এমন সময় দরজার কাছেই সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সুরেশ্বর বর্তমানে তাদের থিয়েটারের ছোটবাবু। একই সঙ্গে দলের গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা। তার নাম না থাকলে বুকিং অফিসের কেরানীদের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। অডিটোরিয়াম খাঁ খাঁ করে। এই সুরেশ্বরকে দেখে বিধুবাবু স্মৃতিকাতরতায় ভুগেন। তিনি ফিরে যান যৌবনে। তারও তো এমন সম্ভাবনা ছিল। থিয়েটার জগতের কিংবদন্তী রাজীব চৌধুরীও তার প্রশংসা করেছিলেন। সুধা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করার কারণে তার সে সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটে। মালিকের সঙ্গে বিরোধে দল ছাড়েন । অবশ্য সে দল আর টেকেও নি। এই অবস্থায় তুঙ্গে উঠা বৃহস্পতির স্থান দখল করে নেয় শনি। তার সূর্যও হেলে যায় পশ্চিম দিকে। এরপর যখন তিনি লজ্জার মাথা খেয়ে দলে নামলেন তখন বাজারে অনেক নতুন অভিনেতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেক দিন বাদে পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য হন। একথা যখন তিনি ভাবছিলেন তখন সময় বেশ গড়িয়ে গেছে। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে। সময়মত আসতে না পারায় বিধুবাবু ভাবেন কোনো কৈফিয়ত দিয়ে তিনি নিজেকে ছোট করবেন না। চাকরিটা যখন তার খুব দরকার তখনও না। তার চেয়ে বড় কথা এই জগৎ ছাড়া তিনি সময় অতিবাহিত করবেন কিভাবে ? এ প্রসঙ্গে লেখক বিধুবাবুর মানসিক চেতনাকে অসাধারণ মমতা আর দক্ষতায় তুলে আনেন এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

> "টাকার চেয়ে বেশি দাম থিয়েটার জগতের সঙ্গে এই সম্পর্কটুকুর। এই সম্পর্কটুকু ছাড়া এ বয়সে তিনি বেঁচে সুখ পাবেন না। এই নকল সাজ, রঙ্গমাখা চেহারা, আঁকা পর্দা আর রঙিন আলোর জগতই তাঁর কাছে সব। নিত্য নূতন দর্শকের কাছে কয়েক মিনিট বা কারবা ঘন্টার জন্যে এই যে কাল্পনিক চরিত্রে নিজেকে বিলীন করে আত্মপ্রকাশ করা, এই তাঁর জীবনের চরম আনন্দ।" (২খ, ২৫২পৃ)

এ অবস্থার পরও তিনি ছোট হতে চান না। তিনি ধরে নিয়েছেন তাকে থিয়েটার ছেড়ে যেতেই হবে।

একটি অমানুষিক আত্মহত্যা গল্পের নায়ক আদ্যনাথ। তার রোমান্টিক স্বপ্ন মধ্যবিত্তেরই। পদ্মাতীরবর্তী গ্রামের যুবক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মানুষ হয়েছে। কিন্তু তার মানসিকতা ছিল শিল্পীর। শিল্পী হওয়ার উদগ্র বাসনা ও তজ্জনিত সংগ্রাম চালাতে দেখা যায়। চাকচিক্যময় কলকাতা নগরীতে আসার পর সে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। লেখক আদ্যনাথের সে অবস্থাকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "কলিকাতা নগরীতে এমন কোনো সভা-সমিতি বা সম্মিলনী হয় না যেখানে আদ্যনাথকে তাহার রূপা-বাঁধানো ছড়ি, গগল্‌স-চশমা ও মাদ্রাজী চাদর সমেত দেখা যায় না। তাহার কবিতা বাংলার প্রায় সমস্ত মাসিকেরই পাদপূরণ করিয়া থাকে এবং এদেশের যে কোনো স্বল্পায়ু পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় আদ্যনাথের রচিত গল্প তাহার শোভা বর্ধন করিতেছে।"(২খ, ১৭৪ পৃ)

প্রথম প্রথম সে ছুটিতে বাড়িতে গেলেও পরে মায়ের চিঠির জবাবে সে জানিয়েছে তার সময় নেই। তদুপরি দেশে রাশভারী পিতার সামনে তার নব্যরুচি ও মতামত প্রতিক্ষণেই ক্ষুণ্ন হতো। অন্যদিকে পালন করতে হতো আচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি। এসব এড়াতে সে কলকাতায় সংবাদপত্র অফিসে চাকরি নেয়। পরিবার বিয়ের আয়োজন করলে কিছু দিন তা ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু পরে মায়ের অসুস্থতার কথা বলে তাকে বাড়িতে নিয়ে বিয়ে দেয়া হয়। এই প্রবঞ্চনায় সে ক্ষেপে যায়। বিয়ের রাতের নেশাও তার দূর করে দেয় শ্যালিকা সম্পর্কীয় মলিনা নামের একটি মেয়ে। আর তাতেই পুড়ে নীলিমার ভাগ্য। পরদিন কাউকে কোনো কথা না বলে সে নীলিমাকে লজ্জায় ফেলে কলকাতায় পালিয়ে যায়। তারপর নীলিমা আদ্যনাথকে চিঠি লিখে। 'শ্রীচরণেষু' বানান লিখতে পারে নি বলে নীলিমাকে ভর্ৎসনা করে আদ্যনাথ। গোহাটিতে বড় গোছের একটা সম্মিলনী বসলে সেখানে আদ্যনাথ বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে আসে। সে গোহাটিতে বেশ কিছু দিন অবস্থান করলেও শ্বশুর বাড়িতে যায় নি। হঠাৎ আদ্যনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার শ্বশুর একথা শুনে মর্মাহত হন। এখানে আদ্যনাথ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু বানান ভুলের কারণে সে নীলিমার আকাঙ্ক্ষাকে কোনোই মূল্য দিতে পারে নি।

Dhaka University Institutional Repository

তার শ্বশুর যে এখানে তিন মাস আগে বদলি হয়ে এসেছেন তাও সে জানত না। তার না জানার কারণ শ্বশুর বাড়ির চিঠির প্রতি সে কোনো গুরুত্বই দেয় নি। এর পরে বন্ধুরা সঙ্গে থাকায় শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তাব সে এড়াতে পারে না। অন্যদিকে বন্ধুদের কাছে তার বিয়ের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে সে রুষ্ট হয়। এ অবস্থায় সে শ্বশুর বাড়িতে যেতে রাজি হয় সন্ধ্যার পর কলকাতায় যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে।

পরে রাতে খাওয়ার প্রস্তাব ও শ্যালিকা মলিনার কথায় যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় তা কমে আসে। আদ্যনাথ এ পরিবর্তনকে এভাবে মূল্যায়ন করেছে—

> "তাহাদের দাম্পত্যজীবনের বিরোধ ঘুচাইবার জন্য যে মহাপ্রাণ ব্যাঘ্র জঙ্গল ছাড়িয়া লোকালয়ে আসিয়া প্রাণ বিসর্জন দিল, তাহাকে সে নিজের বিকৃত কল্পনাপ্রসূত কল্যাণকর বিভীষিকা বলিয়াই আজও জানে।"(২খ, ১৭৯ পৃ)

আদ্যনাথের এই পরিবর্তন তার মনোলোকের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ। কেননা সে গল্প ও কবিতা লেখে। লেখার কাজ সে করেছে অতি আন্তরিকতার সঙ্গে। সংসারকেও সে যে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই ।

আদ্যাক্ষর গল্পের নায়ক অটল। অর্থনৈতিক বিবেচনায় উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তবে তার উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ করার সুযোগ ছিল। তা সম্ভব হয় নি অটলের সাহসের অভাবে। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবে তাকে এ গল্পে সংগ্রাম বা তৎপর হতে দেখা যায় না। তার যে সম্পদ রয়েছে তা পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া। এ সম্পর্কে লেখকের মতামত—

> "পিতার একমাত্র সন্তান হয়ে প্রচুর না হোক গ্রাসাচ্ছাদনের ওপর নির্দোষ কয়েকটি শখ মেটাবার মতো যথেষ্ট সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়া যেমন তার কপালে ছিল, অটল নামও নিশ্চয় তাই।" (৩খ, ১পৃ)

অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকায় তার জীবন কেটেছে খুব স্বাভাবিক ছকে। কোনো টানাপড়েন তাকে স্পর্শ করে না। ফলে তাকে দেখা যায় সহজ সুখী জীবন যাপন করতে। মা-বাবা বা অন্য কোনো অভিভাবক না থাকায় এ সুযোগ অনায়াসে সে লাভ করে। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

> "আদর্শ সুখী মানুষ বলতে যা বুঝি অটল ছিল তাই। বাপ-মা যথাসময়ে ইষ্ট-দেবতা স্মরণ করে গত হয়েছেন। ঘন ঘন সুপরামর্শ দিতে বা সাহায্য চাইতে আসার মতো আত্মীয়স্বজন নেই। চরিত্রটি মাত্রামাফিক সিগারেটের ধোঁয়ায় একটু কলঙ্কিত। চেহারা ঠিক এমন যে ফিল্ম কোম্পানির চরও জ্বালাতে আসে না আবার নৃতত্ত্ববিদেরও কৌতূহল

Dhaka University Institutional Repository

> জাগায় না। সচ্ছলতা ঠিক সেই স্তরের যাতে আয়করের আদালতের ডাক পড়ে না— আবার কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়বার জন্যে চায়ের দোকানের খবরের কাগজ টানাটানিও করতে হয় না ! বিদ্যাবুদ্ধি এমন যে বিশ্বকোষও হাতড়াতে হয় না আবার বাংলা গোয়েন্দাকাহিনী নিয়েও দিন কাটে না। জীবন-উপভোগের উৎসাহ ঘোড়দৌড়ের মাঠেও নিয়ে যায় না আবার ঘরে বসে ধৈর্যের তাসও একা একা পাতায় না।" (৩খ, ২ পৃ)

সচ্ছল অর্থনৈতিক অবস্থার অধিকারী অটলের সিগারেট ছাড়াও নেশা ছিল 'ব্রীজ' খেলা ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া। তবে অটলের মনে নারী সম্পর্কে ভীতি লক্ষ করা যায়। ছোটবেলা থেকে নারী বর্জিত পরিবেশে বড় হওয়ার কারণে এ সঙ্কট তৈরী হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

> "সবচেয়ে বড় কথা পঞ্চশরের কোন বাণ তার কাছে পৌছোয়নি। তার সংসারে কোনো শাড়ির সংস্পর্শ নেই। সে সংসারে বাজার রান্না ঘর-গুছানো থেকে হিসেব-রাখা পর্যন্ত সবকিছুতে কর্তৃত্ব করে উদ্ধব।" (৩খ,২পৃ)

তার বন্ধুদের ক্ষেত্রেও এমন মনোভাব লক্ষণীয়। তাদের মতো যুবকদের সমাবেশে নারী প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তা হয় নি। ফলে নারী নিয়ে তাদের ভীতি লক্ষ করা যায়। সেকারণে অটল নারী সংক্রান্ত জটিলতা তথা তাকে বিয়ের বিষয়ে এক মহিলা চাপ দেয়ায় তাদের সকলকে নার্ভাসনেস অবস্থায় পড়তে দেখা যায়। অটলের বন্ধু জুলু ঘোষও অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। বিয়ে সংক্রান্ত সঙ্কট মোকাবেলায় অনেক যুক্তি তর্কের পর অটল অজ্ঞাতবাসকে বেছে নেয়। এটা করতে গিয়ে অটল ঐ মহিলার পাতা ফাঁদে পড়ে। টেলিফোন ইনডেক্স থেকে মহিলা ফোন নম্বর সংগ্রহ করে অটলের সঙ্গে আলাপের পরেই হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন এই একত্রিশ বছর বয়সীর সঙ্কট কোথায়। তাই তিনি নারী সংক্রান্ত ভীতি কাটানোর কৌশল নেন। নিজের ফ্লাটের পাশে রুম খালির বিজ্ঞাপন দেন। আর সেখানেই ওঠে অটল। সেখানে পরিকল্পনা মাফিক অটলের মুখোমুখি হয় প্রথম ভদ্র মহিলার স্বামী ডা. হোড়। তারপর তাদের মেয়ে রুমা। এক পর্যায়ে অটলের ঘরে তাস খেলার আসরও বসে। এভাবে নারীর প্রতি অটলের ভীতি কেটে যায়। কুন্তলিনী দেবীকে সেখানে দেখে জুলু শেখ সঙ্কটে পড়ে। সে গিয়ে তা অটলকে জানায়। কুন্তলিনী দেবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা শুনে অটলের মনে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এমন—

> "কিন্তু এখন উপায়! মাথার মধ্যে ঝড়ের মতো অনেকগুলো মতলব আউড়ে ফেললাম। জানালা গলিয়ে বাইরে লাফ দেব ? বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে থাকব ? মুখে কালি মেখে চেহারাটা বদলে দেব ? পাগল সাজব ?" (৩খ, ৯ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অটলকে তেমন কিছুই করতে হয় না। কুণ্ডলীনি দেবী একপর্যায়ে তার রুমে আসলে এর সমাধান হয়ে যায়। ডা. হোড়ের সঙ্গে বই ও নারী অধিকার নিয়ে তর্ক যখন জমে উঠেছিল সে সময়ই অটলের মধ্যে অসাধারণ রূপান্তর ঘটে। সে বলে ওঠে—

"কিন্তু বইগুলো তো বাজে নয়।" (৩ খ, ৯ পৃ)

এ পর্যায়ে রুমাকে বিয়ে করতে অটলের আর আপত্তি থাকে না। এক পর্যায়ে তাদের বিয়েও হয়ে যায়। দেখা যায় অটলের মধ্যে নারীর প্রতি যে ভয় ছিল তা সে জয় করতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে নারীর সঙ্গে মেশার কারণে। অটলের এই যে পরিবর্তন তা অস্বাভাবিক নয়। বরং বলা যায় এ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অটল জীবনমুখি চেতনার পরিচয় দিয়েছে।

পাশাপাশি গল্পের নায়ক অমল। পেশায় সিনেমার টিকেটমাস্টার। গল্পের অপর চরিত্র বিধুভূষণ চাকরি ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে তা অমলের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। একারণেই হয়তো সে সিনেমার টিকিট বিক্রি করার চাকরি ধরে রাখতে পারে না। সে এই চাকরি থেকে যে খুব বেশি আয় করতে সক্ষম হয়েছে তাও নয়। সেকারণে স্ত্রী ও একটি মাত্র ছোট ছেলেকে নিয়ে তার সংসার হলেও অভাব-অনটন লেগেই থাকে। তাকে অন্য একটি পরিবারের সঙ্গে এক উঠানে বাস করতে হয়। এটি করতে হয় দারিদ্র্যের কারণে। তার ছেলে অপর পরিবারের নেওটা হয় পড়ে। শুধু তাই নয় অমলের চাকরি চলে যাওয়ার পরই তার স্ত্রীকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি করতে হয়। পিসির মাসোহারার দশ টাকা ভেড়ে মুষে সাবার করে। এসব বিষয়ে অমলের লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। অমলের ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে পিসিমা দোষ চাপায় নিঃসন্তান মেজবৌর উপর। তার বিশ্বাস যার মায়া করার অধিকার বিধাতা দেয় নি তার সে আশা কেন। একারণে অমলের ছেলের এ অবস্থা হয়েছে। এ কথায় মেজবৌ ভীষণ আঘাত পায়। সে অমলের সন্তানের বিষয়েও নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে। এসব পরিবর্তন অমল লক্ষ করে না। এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

"আর পরিবর্তন হয় না শুধু অমলের। এসব ব্যাপারের কিছুই সে জানে না।" (১খ, ২৪৩ পৃ)

পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের খোঁজ রাখার ক্ষেত্রেও অমল চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। এসব বিষয়ে অবশ্যই তার লক্ষ করা উচিত ছিল। এসব বিষয়ে খেয়াল নেই বলে অমল চাকরি খোঁজার চেষ্টা করেও পায় না। চাকরি খুঁজে না পাওয়াটা বড় কথা নয় আসল কথা যে কোনো একটি কর্মসংস্থান অবশ্যই যোগার করতে হবে। আর এমনটি অসম্ভব বলে বিশ্বাস হতে চায় না। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অমলের সিরিয়াসনেসের অভাব রয়েছে। সেকারণে গণকের কাছে তাকে ভাগ্য গুনতে হয় দু' পয়সা দিয়ে। গণকের আশ্বাসবাণী নিয়ে সে গল্প করে মেজবৌর সঙ্গে। তার এ আচরণে মেজবৌ বুঝে যায় অমলের স্বভাব সম্পর্কে। অমলের মধ্য দিয়ে নিম্নবিত্ত শ্রেণির পরাশ্রয়ী মানুষের চরিত্র প্রকাশ পায়। তা হল চরম অনিশ্চয়তার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে ভাবনাহীন আমুদে জীবন যাপন করা। পিসিমা তার সন্তান ও স্ত্রী কাননের ভাইদের নিয়ে যে মজা উপভোগ করতে চেয়েছে তাও তাকে আমুদে ও হালকা স্বভাবের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। তবে এসব ত্রুটি সত্ত্বেও অমলের মধ্যে এক ধরনের সরলতা প্রবহমান। সরলতার কারণে মেজবৌ তার প্রতি রাগ করতে পারে নি। অমলের প্রচেষ্টাতেই মেজবৌর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠে। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিধুভূষণের স্ত্রীর সঙ্গে। বিধুভূষণকে অমল ভয়ই করে তার মৌন স্বভাবের কারণে। এ সম্পর্কে মেজবৌকে অমলের মন্তব্য—

> "নেইত ? বাঁচলাম বাবা ! সত্যি কথা বলতে কি, বৌদি দাদাকে দেখলেই আমার ভয় করে। ওই যে মুখে কথাটি নেই, ও সব লোক সোজা নয়। দাদা আমার দিকে চাইলেই তো আমার মনে হয় ভাঁড়ার ঘরে আমসত্ত্ব চুরি করতে গিয়ে বুঝি সবেমাত্র ধরা পড়ে গেছি, এখনি কান মলে দেবে।" (১খ, ২৪০ পৃ)

অমল সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন—

> "অমল কথা বলে একটু বেশী। হাসি তামাসা করিতে গিয়া একটু বাড়াবাড়িই হয়ত করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার উপর বিরক্ত হইতে মেজ বৌ পারে না। তাহার আচরণে কথাবার্তায় যেন সত্যকার একটি সরলতা আছে।" (১খ, ২৩৯ পৃ)

অমল সম্পর্কে কানন বালার নেতিবাচক কোনো মন্তব্য নেই। সে বরং মেজবৌর কাছে অতিরিক্তভাবে বানিয়ে স্বামীর চরিত্রে উচ্চশিক্ষার প্রলেপ দিয়ে উচ্চাসনে বসাবার চেষ্টা করে। অভাব সম্পর্কে সে স্বামীর কাছে কোনো অনুযোগ করে নি। স্বামী সম্পর্কে মেজবৌর কাছে কানন—

> "আমাদের উনি ভাই কিন্তু বি-এ পাস দিয়ে জলপানি পেয়েছেন " (১খ, ২৪০পৃ)

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় জীবন সম্পর্কে অসচেতন আমুদে স্বভাবের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি অমল। অবস্থা উন্নয়নে যার কোনো সক্রিয় প্রয়াস নেই। অমল জীবন স্রোতে ভেসে চলা আমুদে মানুষ।

বিধুভূষণ *পাশাপাশি* গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেজবৌর স্বামী। পেশায় চাকরিজীবী। তবে সে চাকরি সাধারণ মানের। বিয়ের দশ বছরেও সে সন্তান লাভ করতে পারে নি। এ পরিস্থিতিতেও বিধুভূষণের দাম্পত্যসংকট নেই। সংসারের ছোটখাট বিষয় নিয়েও সন্তান না থাকার কারণে হয়তো উদাসীন বিধুভূষণ স্বল্পভাষী স্বভাবের তার (বিয়ের সময় থেকে) মেজবৌ জানিয়েন বিধুভূষণ স্বল্পভাষী স্বভাব উদাসীন প্রকৃতির সংসারে ছোট খাট বিষয়ে উদাসীন হলেও *অনাবশ্যক* গল্পের স্বর্ণময়ীর স্বামীর মতোই চাকরি ক্ষেত্রে সফল। চাকরি নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে এমন নজির নেই। আর সন্তান-সন্ততি না থাকায় স্বল্প আয় করলেও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে হয় না। অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকলেও এমনটি কেউ সাধারণত করে না। অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য নেই। এর প্রমাণ পাওয়া যায় একই উঠানে অমলের পরিবারের সঙ্গে বাস করায়। নিম্নবিত্ত মানুষের সংসার হিসেবে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে যায়। বিধুভূষণ সম্পর্কে স্ত্রীর মনোভাবকে লেখক তুলে ধরছেন এভাবে—

> "মেজ বৌ স্বামীকে চেনে সুতরাং রাগ তাহার বেশীক্ষণ থাকে না। ওই লোকটির কাছে মানুষের ভাষা সে একটা বাহুল্য বিলাস মাত্র এবং অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সে তাহা ব্যবহার করিতে একেবারে নারাজ, একথা এই দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। সুতরাং খানিক আপন মনে গজ গজ করিয়া সে চুপ করে।" (১খ, ২৩৯পৃ)

উদাসীন প্রকৃতির বিধুভূষণ স্ত্রীর সাধারণ কথা-বার্তায় তেমন একটা গা করে নি। প্রতিবেশী অমলের পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মেজবৌ বাড়ি বদল করার কথা জানালেও তাকে বিধুভূষণ গুরুত্ব দেয় নি। মেজবৌর মন্তব্যে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামীর মনোভাব সম্পর্কে মেজবৌ—

> "আছে গো আছে। এতক্ষণ ধরে বকে মরলুম তা মানুষ না পাথরকে বললুম জানবার জো নেই। আমার কথায় তো তুমি গা কর না, চিরদিন দেখে আসছি।" (১খ, ২৩৮পৃ)

বিধুভূষণ উদাসীন প্রকৃতির হলেও বুদ্ধিহীন নয়। স্ত্রীর সাধারণ অভিযোগে কর্ণপাত না করলেও স্ত্রীর কঠিন মনোভাব অনুধাবন করতে তার কষ্ট হয় নি। অমলের পিসিমা মেজবৌর সন্তান না হওয়াকে ঘিরে কটূ মন্তব্য করলে মেজবৌ ভীষণ কষ্ট পায়। অমলদের প্রতি কঠিন হয়ে উঠে তার হৃদয়। এ অবস্থায় মেজ বৌ কোনো অভিযোগ না তুলে বিধুভূষণকে নতুন বাড়ি দেখতে বলে। মেজবৌর বক্তব্য—

> "এ বাড়িতে আমি কিছুতেই থাকব না, তুমি অন্য বাড়ি দেখ।"(১খ, ২৪৩পৃ)

এরপর বিধুভূষণ নতুন বাড়ি না দেখে পারে নি। ঠিক হয় কিছুদিনের মধ্যে তারা নতুন বাড়িতে উঠে যাবে। এক্ষেত্রে বিধুভূষণ সচেতনতার পরিচয় দেয়। বিধুভূষণও স্ত্রীর মতো উদার। বিধুভূষণের উদারতা সহজে বুঝা যায় না। তা অনুধাবন করে নিতে হয়। শুধু উদারই নয় সে স্নেহপ্রবণও। একারণে মেজবৌ অমলের সন্তানকে এটা সেটা দিলে বাধা দেয় নি। খোকার উপস্থিতিকে বিধুভূষণও সহজভাবে মেনে নিয়েছে। বিধুভূষণও যে উদার প্রকৃতির তা টের পাওয়া যায় অমলের চাকরি চলে যাওয়ার পর তার সংসারের অভাবের চরম মাত্রা বুঝতে

Dhaka University Institutional Repository

পেরে মেজবৌ আবার সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলে। রান্না ঘরে তালা না দেয়া প্রসংগে মেজবৌ জানায়—

> "কি করব বল? সামনা সামনি দিতে গেলে তো নেবেন না। নবাবের বেটির যে তাতে মান যায়। তা বলে ওই দুধের ছেলেটা উপোষ করে মরবে !" (১খ, ২৪৬পৃ)

স্ত্রীর এ মনোভাবে বিধুভূষণ নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করে নি। আমাদের বিশ্বাস বিধুভূষণও ছেলেটির কষ্ট লাঘব করতে চায়। তাই সে স্ত্রীর আচরণে সারা দিয়ে বলে—

> "তাহলে বাড়ি বদল আর দরকার নেই?" (১খ, ২৪৬পৃ)

বাড়ি তাদের আর বদল করা হয় না। বাড়ি বদল না করার মধ্যে দিয়ে বিধুভূষণ দখল করে নেয় কোমল পাঠকের অন্তঃকরণ। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সে সেবা করে মানবতার। এ বৈশিষ্ট্য উদাসীন প্রকৃতির বিধুভূষণকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা দান করে। মানবিকবোধ বিধুভূষণকে অসাধারণ করে তোলে।

জীবনের বিচিত্রসংকট : স্বাধীনতা সংগ্রম

পেমেন্দ্র মিত্র তার সময়কেও ছুঁয়ে গেছেন সার্বিকভাবে। তাই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। স্বাধীনতাসংগ্রামকে তিনি নিয়ে এসেছেন তাঁর ছোটগল্পে। এক্ষেত্রে অসাধারণ কিছু বিপ্লবী চরিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। সামনে *চড়াই* গল্পের মহিম ও *পাহাড়* গল্পের শশধর তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এসব স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত লক্ষ করা যায়। তিনি নিজেও স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন—

> "নন-কোঅপারেশনের বান ডাকা দিন। আমাদের কলেজের দোতলার বারান্দা থেকে দেশবন্ধুর বাড়ির আঙ্গিনা দেখা যায়- শুধু এক দেয়ালের ব্যবধান। মহাত্মা আছেন। মহম্মদ আলি আছেন, বিপিন পালও আছেন বোধহয়- তরঙ্গতাড়নে কলেজ প্রায় এলোমেলো। কি করে যে আঁকড়ে থাকলাম কে জানে, শুনলাম প্রেমেন ভেসে পড়েছে।"[৩]

শুধু স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণই করেননি, স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তিনি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথাও চিন্তা করেছেন। ১৯২১ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বদেশ ভাবনা ছিল এমন—

> "ভারতবর্ষে তখন আকাশে বাতাসে দেশের মুক্তিসাধনার উত্তেজনা। সে সাধনার নানা দিক নানা রূপ। হঠাৎ একদিন মনে হল দেশে কি বিদেশে মামুলী পড়াশোনা করে কোনো লাভ নেই। নগরে বন্দরে নয়, আসল চিরন্তন ভারতবর্ষ যেখানে অবহেলায় পড়ে আছে, গ্রামাঞ্চলের সেই

Dhaka University Institutional Repository

> চাষীদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হবে। তার জন্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শেখা দরকার।"[৪]

পাহাড় গল্পের নায়িকা মেনকা। আলোকিত ও ব্যতিক্রমি ভূমিকায় মেনকাকে দেখা যায়। সাহস ও দেশপ্রেম তাকে অন্যসব নারী চরিত্র থেকে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। বিয়ের আগে তাকে পরাশ্রয়ী হিসেবে থাকতে হয়। বলা যায়, এ পর্যায়ে তার অর্থনৈতিক কোনো ভিত্তিই ছিল না। অনাথা হয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয় মামাবাড়িতে। মেনকার এই পরিস্থিতি তাকে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। কারণ মধ্যবিত্তের জীবনের যে নিশ্চয়তা তা মেনকার ছিল না। থাকলে হয়তো মেনকার পক্ষেও এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হতো না। সহজ হতো না বলা একারণে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষও যে ঝুঁকি নেয় না তা নয়। তবে সংখ্যায় তা নগণ্য। মেনকার অবস্থানগত ভিন্নতা তাকে চরম সাহসী হবার মনোবল যুগিয়েছে।

একারণে মেনকা স্বদেশি তরুণ শশধরকে বিয়ে করার সাহস দেখায়। সে নিজেও স্বদেশি আন্দোলনের উত্তেজনায় ছিল বিভোর। সে সচেতনভাবে জড়িয়েছে এই আন্দোলনে।

মামাবাবু যখন বিপদ আঁচ করে শশধরের জন্য মেনকাকে নানা কথা বলে অপমান করে তখন তা তার গায়েই লাগে নি। তখন সে স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তেজনায় মগ্ন। মামার আচরণ এ সময় তেমন বিরূপ অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে না মনের প্রবল উত্তেজনার কারণে। এ ক্ষেত্রে মেনকা অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয়ে দিয়েছে। এ সময়ের মেনকার মানসিকতাকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "মেনকাকে এসব আঘাত অপমান কিন্তু স্পর্শ করেনি। সমস্তক্ষণ একটা তীব্র নেশার মধ্যে তার কেটেছে। দুরন্ত একটা উত্তেজনার ঢেউয়ের মাথায় এমন জায়গায় সে উঠে গেছে, তুচ্ছ ব্যথা বেদনা ক্ষোভ যেখানকার নাগাল পায় না।"(২খ, ২৭৮ পৃ)

সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সাহসও মেনকার রয়েছে। একাধিকবার সে এর প্রমাণ রেখেছে। আত্মগোপনের যাওয়ার আগে ফেরিওয়ালা সেজে শশধর দেখা করতে এলে মেনকা তার সহযাত্রী হয়। নারী হিসেবে মেনকার এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই সাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

অচেনা এক শহরে গিয়ে তাকে পাঁচ বছর কাটাতে হয়। এখানে অবস্থানকালে তার মনে স্বাভাবিক সংসার ধর্ম পালনের প্রতি কিছুটা আগ্রহ লক্ষ করা যায়। এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। মেনকাও নারী- অনুভূতিশূন্য জড় পাথর নয়।

Dhaka University Institutional Repository

একঘেঁয়েমিতে দূর আকাশে জানালা দিয়ে যে পাহাড়টি দেখা যায় সেটিই তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠে। প্রথম দিকে এক বছর অচেনা এই শহরে অবস্থান করাটাকেই তার তাই শাস্তি মনে হয়েছিল। ধীরে ধীরে তার এ মনোভাব অবশ্য কেটে যায় ।

মেনকা নারী। তার মধ্যে সুন্দর পরিপাটি করে সংসার গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। অচেনা এই শহরে হিন্দুস্তানী বাড়িতে অবস্থানকালে তা চোখে পড়ে। বাড়িটির ছোট খাটো ত্রুটি জোড়াতালি দিয়ে নিজেই ঠিক করে নেয়। জানালাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মেনকার বেশ খারাপ লাগে। এখানে সুন্দর একটি বাড়ির প্রতি তার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। মেনকা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন নারী। শশধর বাড়িওয়ালাকে জানালাটা ঠিক করে দিতে বলে মেনকার তাগিদে। শশধরের এ কথা বাড়িওয়ালা না শুনায় তার আত্মমর্যাদায় লাগে।

শশধর অচেনা শহরে দোকান করুক এটা তার ভালো লাগে নি। দোকান করার কারণে মেনকা সদা শঙ্কিত ছিল কখন যে বিপদ নেমে আসে। তার এ আশঙ্কা শশধরের কাছে প্রকাশ করেছে এভাবে—

> "তোমার দোকান করাটা আমার কিন্তু ভালো লাগে না বাপু। বাজারের মধ্যে সকলের চোখের সামনে বসে থাকা, এটা কী ঠিক।"(২খ, ২৭৭ পৃ)

তার উদ্বেগের মুখে শশধরের যুক্তিতে তাকে আশ্বস্ত হতে দেখা যায়। মেনকার এ শঙ্কা মধ্যবিত্তেরই শঙ্কা। ঘরবাধার মধ্য দিয়ে তার এ শঙ্কার সূচনা। কিন্তু প্রথম দিকে তা মনে সায় পায় নি জীবনের চরম অনিশ্চয়তার জন্য।

বাসায় একদিন পুলিশ আসলে মেনকা শশধরকে পালিয়ে যেতে বলে। শশধর দরজা খুলতে চাইলেও প্রথমে মেনকা তা খুলতে দেয় নি। মেনকা এ সময় তার আশঙ্কার বিপদকে সামনে দেখতে পায়। এ সময় মেনকা শশধরকে কথা বলতে নিষেধ করে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। এক্ষেত্রে সে মধ্যবিত্ত নারীর ভাবাবেগকে লালন করে বসে থাকে নি। অবশ্য সেদিন শশধরকে আর পালাতে হয় না। সেদিন পুলিশ তারই দোকানের কর্মচারীকে চোর হিসেবে ধরে এনেছিল। এর পর পাঁচ বছরেও অবশ্য তাদের কোনো বিপদ ঘটে নি।

তাদের জন্য এক পর্যায়ে এসেছে খুশির সংবাদ। শশধর যেকারণে ফেরারি হয়েছিল, আজ তাই হয়ে উঠেছে শুধু তাদের জীবনে নয় গোটা জাতির কীর্তি হিসেবে। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। তারা আজ মুক্ত। যেখানে খুশি তারা এখন যেতে পারে। পুলিশের ভয় আর তাদের তাড়া করবে না। এ সংবাদে শশধর উত্তেজনায় টগবগ করতে থাকলে তা মেনকার মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এ সংবাদে মেনকাও বিহ্বল ও বিমুঢ় হয়ে যায়। এ সংবাদ খুব সহজে বিশ্বাস করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেকারণে ভালো করে সৌভাগ্যটাকে উপলব্ধি করার জন্য জানালার দিকে মুখ ফেরায়।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মেনকা চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য তা খুব বেশি নারীর মধ্যে লক্ষ করা যায় না। বলা যায়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব নারী ত্যাগ স্বীকার করেছেন মেনকা তাদের মধ্যে একজন। আর একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে জেনে-শুনে অংশ নেয়া অবশ্যই ব্যতিক্রমি ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ। মেনকা সে কাজ অবলীলায় গ্রহণ করতে পেরেছে। এজন্য ছন্নছাড়া জীবনকে গ্রহণ করতেও সে দ্বিধা করে নি। এসব বিবেচনায় বলা যায় চাই মেনকা শেকড়হীন মধ্যবিত্ত থেকে একজন বিপ্লবীকে গ্রহণ করে তার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে। মেনকা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ব্যতিক্রমি উজ্জ্বল চরিত্র।

শশধর *পাহাড়* গল্পের নায়ক। শশধর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রসৈনিকদের সাহসী জীবনচিত্র অংকিত হয়েছে। যে সময় একজন তরুণ আনন্দ উপভোগে সময় কাটিয়ে দেয় সে বয়সে শশধর বেছে নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কণ্টকিত পথ। এ চেতনার কারণে শশধর ব্যতিক্রমি এক চরিত্র। সময় অতিক্রান্ত একটি নামও বটে। কেননা এমন সাহসী সিদ্ধান্ত সবাই নিতে পারেন না। যারা পারেন তারা অর্জন করেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কুড়িয়ে নেন সবার প্রশংসা। শশধর জানে সংগ্রামের পথ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ পথে প্রতি মুহূর্ত মৃত্যু পিছু ধাওয়া করে। স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকি নিয়ে পথ চলতে হয়। শশধর অবলীলায় তা গ্রহণ করে।

জীবনসংগ্রামে পথ চলতে সঙ্গিনী নির্বাচনেও শশধর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। সে জানে তার জীবন জটিলতাপূর্ণ। সাধারণ মধ্যবিত্ত নারী তার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা সাধারণ মধ্যবিত্ত নারী ঝামেলামুক্ত ও শঙ্কামুক্ত জীবনের স্বপ্ন লালন করে। এমন নারী কখনোই জটিলতায় জড়াতে চাইবে না। এ সরল জীবন সংসারে জড়ানো শশধরের লক্ষ্য নয়। তাই সে বেছে নেয় ব্যতিক্রমি ও অসহায় নারী মেনকাকে। যে তার মামার বাড়িতে আশ্রিত। মেনকার অবস্থান বিবেচনায় তার এ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক। কেননা পিছুটান না থাকায় মেনকার পক্ষেও সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়েছে। যার প্রমাণ পরবর্তী সময় মিলেছে।

শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়ার মতো গৌরবজনক কাজই সে করে নি। সে সমাজ সংস্কার বিরোধী মানুষ হিসেবে আলোচিত হতে পারে। এটি তার জীবনে গৌরবের আর একটি সোনালী পালক। যেমন যৌতুক নারীর জীবনে বিড়ম্বনা ডেকে আনে। সেটা ঘটছে সেকালে ও একালে সমানভাবে। শশধর অন্তত একজন নারীকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। এক্ষেত্রেও সে সমাজের উজ্জ্বল ব্যতিক্রমি চরিত্র। শশধর বিয়ে করে মেনকাকে কোনো যৌতুক ছাড়াই। এতে তার প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শশধর যেমন অসীম দুঃসাহসী ছিল তেমনি কৌশলি। এর পরিচয় পাওয়া যায় জেল থেকে পালানোর পর মেনকার সঙ্গে দেখা করার মধ্য দিয়ে। শশধর এ সময় দিনের বেলায় পুলিশের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ফেরিওয়ালা সেজে দেখা করতে এসেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মেনকা এ সময় তার সঙ্গে আসতে চাইলে প্রথমে সে আপত্তি করেছিল। পরে অবশ্য মেনকার এ প্রস্তাবে রাজি হয়। মেনকার প্রস্তাব মেনে নিয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় ও নতুন একটি ধারণাকে সে স্বীকৃতি দেয়। সে মনে করে লুকিয়ে থাকার জন্য মেয়েদের শাড়ির আঁচল এখনো বেশ নিরাপদ। এক্ষেত্রে তার মূল্যায়ন ছিল এমন—

> "তা মন্দ হয় না। লুকোবার পক্ষে শাড়ির আড়াল এখনো বেশ নিরাপদ !"(১খ, ২৭৮ পৃ)

শুধু এই নয়, পালিয়ে যাবার পর মেনকাকে নিয়ে হিন্দুস্থানী অচেনা শহরে আশ্রয় নেয়। এখানেও সে সাহসিকতা ও বৈচিত্র্যময়তার পরিচয় দেয়। তার মনে হয়েছে লোকচক্ষুর সামনে থাকাটাই লুকিয়ে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। এ সম্পর্কে সে মেনকাকে বলেছে—

> "হ্যাঁগো ওইটেই ঠিক। লুকোতে যদি হয় তো হাটের ভিড়েই সব চেয়ে সুবিধে।"(১খ, ২৭৭ পৃ)

এ সম্পর্কে সে আরো জানায় –

> "নেহাত কাজ না থাকলে লোকে কী বলবে তাই একটা লোকদেখানো ব্যাপার বুঝেছ। বছর খানেক থাকতে তো হবে এখানে।"(১খ, ২৭৬ পৃ)

তাদের অবশ্য এখানে পাঁচ বছর থাকতে হয়। এখানে প্রায়ই মেনকাকে শঙ্কিত জীবন কাটাতে হয়।

বিপদের মাঝেও শশধর স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বের কথা ভুলে যায় নি। একদিন তাদের বাড়িতে পুলিশ আসলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শশধর সেদিন দরজা খুলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মেনকা এতে বাধা দেয়। মেনকা তাকে দরজা দিয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যেতে বলে। এ সময় সে মেনকার কি হবে তা জানতে চায়। মেনকা তাকে তার কথা ভাবতে নিষেধ করে। বিপদ মোকাবেলার জন্যে তৈরী হতে বলে। অবশ্য সেদিন শশধরকে পালাতে হয় নি। পুলিশ সেদিন চোর হিসেবে তারই দোকানকর্মিকে ধরে এনেছিল।

সংকটে শশধর যেমন চিন্তিত হয়ে পড়ে তেমনি শুভ সংবাদও তাকে সমানভাবে আবেগপ্রবণ করে। অর্থাৎ মানবমনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে বিদ্যমান। ভারত স্বাধীন হবার সংবাদ পত্রিকায় পড়ে সে উল্লসিত হয়ে পড়ে। তার এ উল্লাস সে মেনকার মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। মেনকার উত্তেজনা নিরসনে তাই সে জানায়—

> "হাওয়া যে একেবারে বদলে গেছে। যা ছিল আমাদের ক্ষমাহীন অপরাধ তাই এখন পরম কীর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের কোনো ভয়

Dhaka University Institutional Repository

নেই। আমাদের ঘেয়ো কুকুরের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার অধিকার আর কারুর নেই।"(১খ, ২৭৯ পৃ)

দেশের স্বাধীনতার জন্য শশধরের সংগ্রাম তার চরিত্রে অসাধারণ গৌরব এনে দিয়েছে। শশধর আপসহীন সংগ্রামী। আপস ও হীনম্মন্যতা তাকে স্পর্শ করে না। দেশমাতৃকা ও প্রিয়তমার প্রতি তার ভালোবাসা সমান নিখাদ। সে জীবনবাজি রেখে দেশের জন্য যেমন লড়াই করেছে তেমনি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও ফেরিওয়ালা বেশে দিনের বেলায় স্ত্রী মেনকার সঙ্গে দেখা করেছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় শশধর মধ্যবিত্ত শ্রেণির উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অসাধারণ দক্ষতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাধারণ মানুষের লড়াই সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপন করেছেন *সামনে চড়াই* গল্পে। এ গল্পের নায়ক মহিম সাধারণ মানুষ। বংশ পরিচয় সম্পর্কে এ গল্পে মহিমের কোনো তথ্য নেই। আছে তার সংগ্রামী হয়ে উঠার গল্প। এ গল্পে তার সামগ্রিক পরিচয় আমাদের সামনে যেভাবে ফুটে উঠে তাতে বলা যায়, মহিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির পিছুটানহীন অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। গল্পকথক লোকেশের বর্ণনায় মহিমের পরিচয় এভাবে ফুটে উঠে—

"সবিস্ময়ে এবার সামনের লোকটির দিকে তাকিয়েছি। এই মহিমদা ! রাস্তায় ঘাটে চায়ের দোকানে হাজার হাজার যে সব লোক দেখা যায় তাদের থেকে আলাদা করবার মত কোন বিশেষত্বই সে চেহারায় চোখে পড়েনি। ভিড়ের মধ্যে দেখলে সে চেহারা আলাদাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সাধারণভাবে একবার দেখলে মনেও ছাপ রেখে যায় না। সাদাসিধে রোগাটে শ্যামবর্ণ একটি মানুষ, বেঁটে খাটোও নয়। লম্বা চওড়াও বলা যায় না। গায়ে একটি সস্তা টুইলের হাত কাটা সার্ট আর মিলের ধুতি। বিশেষ ভাবে চিনিয়ে না দিলে যে কোন আড্ডায় এই মানুষটির সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে এসেও মুখটা ভাল করে স্মরণ রাখতে পারতাম না।"(১খ, ৩২০-৩২১পৃ)

মহিম যে অতি সাধারণ মানুষ বাইরের দিক থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন মহিম বলে—

"তোদের ঠিক পছন্দসই হল না নারে!" (১খ, ৩২১পৃ)

এই সাধারণ মানুষ মহিম স্বাধীনতা সংগ্রামে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতির কারণে মুক্তিকামি মানুষের কাছে বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দাবা খেলার সময় মহিমের আলাপচারিতায় লোকেশ এ স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিশেষত্বের পরিচয় পায়। মহিম শুধু উঁচু মানের একজন আবেগপ্রবণ স্বাধীনতাকামি কর্মি নয় সে যুক্তিবাদীও। সে সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে তার চিন্তায় নতুনত্ব পাওয়া যায়। মহিম মনে করে সাধারণ মানুষ জেগে উঠলে স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র পাল্টে যাবে। এ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন—

> "তা দাবা নেবে নাও, আমার বড়েরা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি ভয় পাই না, বুঝেছ স্বামীজি! ও দাবা নৌকা পিল ঘোড়া যাই বল না কেন, সকলের জারিজুরি শুধু দুদিনের, শেষ পর্যন্ত ওই বড়েদের জোরেই সব কিস্তি মাৎ!" (১খ, ৩২১ পৃ)

স্বামীজি হেসে বলেছেন—

> "কিন্তু তুমি নিজে তো বড়ের চাল চাল না ভাই !" (১খ, ৩২১ পৃ)

> "সে ক্ষমতা কই স্বামীজি ! তা ছাড়া সময়ও হয়নি।"(১খ, ৩২১পৃ)

এরপর মহিমদার অবস্থা সম্পর্কে লোকেশ বলেছে—

> "মহিমদাকে একটু যেন গম্ভীর মনে হয়েছে। 'দাবা নৌকা পিল ঘোড়ার সঙ্গে যুঝেই আমরা ফুরিয়ে যাব। তারপর আসবে বড়েদের দিন। ওই যারা গুটি গুটি এক পা এক পা করে চলে, সামনে ছাড়া পিছু হাটতে জানে না, সেই বড়েরাই তখন নতুন করে ছক পাল্টাবে।" (১খ, ৩২১পৃ)

শুধু তত্ত্ব নয় সরাসরি সংগ্রামে জড়িত ছিল মহিম। অপারেশনে গিয়ে সে গুরুতর আহত হয়। সরকারিভাবে প্রচারিত হয় এ ঘটনায় মহিম মারা গেছে। মহিম অসাধারণ দৃঢ়তাসম্পন্ন একজন স্বাধীনতা সৈনিক। সে ছিল ব্রিটিশ শাসকদের আতঙ্ক। সরকারের কাছে মহিমের গুরুত্ব সম্পর্কে স্বামীজির মন্তব্য—

> "পছন্দ তোমাকে কেই বা করে ! শুধু সি.আই.ডি. ভায়ারা যে তোমায় কি চোখে দেখেছে তাই ভাবি। ও চেহারার মূল্য একেবারে দশহাজার টাকা।"(১খ, ৩২১ পৃ)

মহিমচরিত্রে এই কঠোরতার মাঝে আমরা সহৃদয়তার পরিচয়ও পাই। মহিম আহত হলে যে মেয়েটি তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল ও সেবা করেছিল নিষ্ঠার সঙ্গে তাকেই মহিম বিয়ে করে। মেয়েটি ছিল বোবা। অন্য কেউ হলে এই মেয়েটিকে সহজে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইতো না। অনেকেই আবার হয়তো কোনো প্রকারেই গ্রহণ করতো না। কিন্তু মহিম

Dhaka University Institutional Repository

এখানে আর সবার থেকে ব্যতিক্রম। সে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে বোবা মেয়েটিকে। দেশমাতৃকার মতো মানুষকেও সে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে।

দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার করতে তার কোনো দুঃখ নেই। সে সাধারণ মানুষের মাঝে সহজেই মিশে যেতে পারে। পারে যে কোনো কাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে। তার এই গুণ সম্পর্কে লোকেশের বর্ণনা—

> "মহিমদা সেই অসাধারণ জাতের মানুষ সব অবস্থাতেই যাকে সাধারণ বিশেষত্বহীন বলে মনে হয়। যে কোন জায়গাতে যে কোন আবেষ্টনের সঙ্গেই নিজেকে তিনি এমন ভাবে মিশ খাওয়াতে পারেন যে এতটুকু বিসদৃশ ঠেকে না। বাইরের ছদ্মবেশও তাঁর লাগে না। বহুরূপীর মত নিজের ভিতর থেকেই পরিবেশের সঙ্গে মানানসই রঙ তিনি যেন বার করতে পারেন।"(১খ, ৩২৩ পৃ)

মহিম একজন সতর্ক মানুষও বটে। সে নিজেকে রক্ষার জন্য চালিয়েছে সচেতন প্রয়াস। লোকেশের সঙ্গে বিএনআরের স্টেশনে মহিমের দেখা হওয়ার সময় তার এ সতর্ক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকেশ তাকে মহিমদা বলে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশলাই এর আলো নিভিয়ে দেয়। এরপর নিশ্চিত হতে চেয়েছে কে তাকে ডাকলো। মহিম প্রশ্নকারীর পরিচয়ও জানতে চায়। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর মহিম লোকেশের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করে। এর আগে তার আচরণ ছিল অতি সতর্কতাময়। এ ধরনের মনোভাব তার দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

মহিম উদার ও সাহসী। সে মানুষের মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করতে চায় না। সে চায় মানুষের মাঝে এখনো যে ব্যক্তিত্ববোধটুকু আছে তা টিকে থাক। তার বিশ্বাস ব্যক্তিত্ববোধ মানুষকে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে সহায়তা করবে। তাই সে লাউ বিক্রেতাকে পয়সা দিয়ে লাউটি নিয়ে নিয়েছে। পয়সা দিয়ে লাউ না নিয়ে সে গরীব কৃষকের ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করতে রাজি নয়। লোকেশের এক প্রশ্নে তাই মহিম বলেছে—

> "ভিক্ষে না করে বাড়ির মাচার বীজ লাউ ছিঁড়ে নিয়ে যে বিক্রী করতে আসে, কিছু আত্মসম্মান তার মধ্যে এখনো অবশিষ্ট আছে। দু আনা পয়সা অমনি দিয়ে সেইটুকু নষ্ট করতে আমি রাজী নই।"(১খ, ৩২৬ পৃ)

অন্য আর এক জায়গায় তার এ সুউচ্চ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা সাধারণ মধ্যবিত্তের ব্যতিক্রমি ও অসাধারণ একজন মানুষ হিসেবে তুলে ধরে।

ক'জন গরীব চাষী তার মহাজনের কাছে ঋণ চাইতে আসলে তাদেরকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস চালায়। তারা ঋণ না পেলে না খেয়ে মারা যাবে এমন কথা বললে মহিম তাদের প্রশ্ন করে—

"মরে তো যাবিই, বাঁচবার হিম্মৎ তোদের আছে ?" (১খ, ৩২৪ পৃ)

এই সাধারণ মানুষ মাথা নিচু করে কিছু চেয়ে নিক এটাও মহিম পছন্দ করে নি। কারণ সে বিশ্বাস করে তাতে তাদের মুক্তি আসবে না। বরং তারা যে তিমিরে আছে সেই তিমিরে থেকে যাবে। তাই তাদের উদ্দেশে তার বক্তব্য—

"পায়ে ধরেই তোরা সবখানে তরে যাবি— কেমন ? দশটাকা তো পায়ে ধরে পাবি। এ দশটাকা ফুরোলে কি করবি ? চুরি ডাকাতি করবি না বাজার লুট করে খাবি ?"(১খ, ৩২৪ পৃ)

মহিমের এ মন্তব্য তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে না। এ বক্তব্যে তাদের প্রতি গভীর মমত্ববোধের ছোঁয়া খুঁজে পাওয়া যায়।

জীবনের বিচিত্রসংকট : ব্যক্তিস্বার্থের টানাপড়েন

প্রেমেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্তে শ্রেণির মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সবরকম মানুষের যাপিত জীবনকে তুলে ধরতে। এক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মধ্যবিত্তরা যেমন মানসিকদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, অর্থনৈতিক সংকটে আবর্তিত হয়েছে, তেমনি কিছু মানুষ অত্যন্ত সচেতনভাবে এই দুই বাস্তবতা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন কিছু চরিত্র অঙ্কন করেছেন যারা এই দুই স্রোতে কখনই তলিয়ে যায় নি। নিজেকে রক্ষার সচেতন প্রয়াস তাদের মধ্যে লক্ষযোগ্য। নারী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণির চরিত্রই খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থ সচেতন পুরুষের কিছু স্বরূপ নিম্নে আলোচনা করা হলো—

পরিত্রাণ গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র পরিতোষবাবুর ম্যানেজার। পরিতোষবাবুর সবকিছু তিনি দেখাশুনা করেন। এমনকি অনুপমা যে চিঠি দিয়েছিল পরিতোষবাবুকে তার উত্তরও এই ম্যানেজার দিয়েছিলেন। অনুপমা পরিতোষবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার পর তিনি তাদের খোঁজ খবর নিতে ত্রুটি করেন নি। খোকাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা পরিতোষবাবু বলেছেন এ কথা অনুপমাকে জানান। সব ক্ষেত্রে এসে বলেন—

Dhaka University Institutional Repository

"পরিতোষ বাবু বলে পাঠালেন— ....." (২খ, ১০১ পৃ)

সরকার মশাই সম্পর্কে অনুপমার মূল্যায়ন এমন—

> "সরকারমশাই লোকটি অমনিই কী ভাবে কে জানে? চতুর সাবধানী লোক! মুখে তাহার কোনো ভাবান্তর হয় না, কিন্তু অনুপমাকে এতখানি সম্মানের সহিত এমন ভাবে আশ্রয় দেওয়ার কোনো কৌতূহল কি তাহার জাগে না? জাগে নিশ্চয়। মনে মনে কী যে একটা গড়িয়া লইয়াছে কে জানে!" (২খ, ১০১ পৃ)

অনুপমা যখন বলেছে—

> "আপনার পরিতোষ বাবু রোজ রোজ বলে পাঠান কেন? নিজে একদিন এলেই তো পারেন। এমন কিছু দূরও তো নয়!" (২খ, ১০১ পৃ)

অনুপমার এ প্রশ্নে বিনয়ের সঙ্গে ম্যানেজার শুধু জানান—

> "পরিতোষবাবুর যে অসুখ!" (২খ, ১০১ পৃ)

অসুখের কথা শুনে পরিতোষবাবুকে দেখার পর ঘর থেকে অনুপমা যখন বের হয়ে আসেন তখন শুধু ম্যানেজারকে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়। অনুপমা রহস্যের একটা ইঙ্গিত পায় ম্যানেজারের কথায় নয় তার কথা বলার সুরে ও মুখের ভঙ্গিতে। অনুপমার প্রশ্নে তখন ম্যানেজার জানান, এক বছর ধরে পরিতোষবাবুর মানসিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অনেক সময় ঠিক থাকেন আবার অনেক সময় সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। ম্যানেজার হিসেবি তিনি যে অত্যন্ত সচেতন ও স্পষ্ট ভাষী একথা থেকে তা বুঝা যায়। কেননা অনুপমাকে তিনি স্পষ্ট করে বলেন—

> "আমি জানলে আপনাকে যেতে দিতাম না অমনভাবে। কখন কি বেঠিক বলে ফেলেন।"' (২খ, ১০৫ পৃ)

ম্যানেজার হিসেবে তার পরিচয় জানা গেলেও তার জীবনের অন্য দিক সম্পর্কে গল্পে কিছু উল্লেখ নেই। ধরে নেয়া যায় তিনি এক্ষেত্রে একজন সৎ ম্যানেজার হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন। তার পরিবারিক অবস্থা সম্পর্কেও কোনো কিছু জানা যায় না। তাকে আমরা একজন সচেতন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আর বলতে পারি বাস্তব-বোধসম্পন্ন সচেতন ও সৎ ম্যানেজার। তবে সে সময় এমন একনিষ্ঠ ম্যানেজার অনেকেই ছিলেন। যারা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন।

পঞ্চস্বর গল্পের তৃতীয় গল্পের কথক দীনেশ প্রবাসে সচ্ছল জীবন যাপন করে। সে এ গল্পের নায়ক। সে সময়কার শিক্ষিত বাঙালিদের অগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি। প্রবাসে সচ্ছল জীবন

Dhaka University Institutional Repository

যাপন করে। মন, মনন ও আর্থিকবিচারে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। আর্থিকসংকট তাকে স্পর্শ করে নি। মানসিকসংকট তার জীবনে প্রবলভাবে ছুঁয়ে না গেলেও তার হৃদয়ে দাগ কাটে হিন্দুভাষী অঞ্চলে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তার এই মানসিকসংকট তৈরী হয়। সেখানে সে এক কারখানার ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে। কারখানাটি ছোট নয়, সেখানকার মান বিচারে বেশ বড়ই। সেখানে তাকে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। ভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন ভাষার মানুষ তাকে আকৃষ্টও করে খুব সহজে। সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতিকে সুতীক্ষ্নভাবে লক্ষ করার সচেতন প্রয়াস তার মধ্যে রয়েছে। তবে শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে কাজ করার কারণে তাকে কখনো হয়তো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু তা মানবিক আচরণকে ছাড়িয়ে যায় নি। বরং মানবিকতা রক্ষা করার দুর্লভ প্রয়াস তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। তার এই মানবিক আচরণ কর্তব্য কাজে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি বরং সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে উঁচু মানের ব্যক্তিত্বের কারণে। তারই কারখানার শ্রমিক দরদীয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ এ বক্তব্যের প্রতি সমর্থন তুলে ধরে। মুনিরাও চরম আসক্তি প্রকাশ করে দীনেশের প্রতি। এই মেয়েটি যে তার প্রতি অনুরক্ত সেটিও তার দৃষ্টিতে এড়ায় নি। কাছাকাছি জায়গা থাকা সত্ত্বেও তার বাংলোর কাছে মুনিরার স্নান করতে আসার মধ্যে এর প্রমাণ পায় সে। একদিন চরম সুযোগ আসে মুনিরাকে সম্ভোগ করার। মুনিরা এক রাতে এসে ধরা দেয় তার কাছে। প্রথমে দীনেশ ভুল করে। সে দরদীয়ার যৌবনের ছল ও কামনাকে কৈশোরের চঞ্চলতা ও কৌতূহল বলে ভুল করে। তাই তো সে সরল মনে দরদীয়াকে ঘরে ডেকে নিয়ে হাসুলি কেনার জন্য দশ টাকা দেয়। পরে আরো টাকা দেবে বলে জানায়।

এই অর্থ দানে দীনেশের সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তার চারিত্রিক উৎকর্ষ আরো আলোকিত হয়ে উঠে যখন সে রাতে দরদীয়া তাকে সম্ভোগের সুযোগ করে দিলেও তা গ্রহণ না করার মধ্য দিয়ে। সুন্দরের প্রতি, নারীর রূপের প্রতি তীব্র আকার্ষণ থাকলেও দীনেশ সুযোগকে কাজে লাগায় নি। দরদীয়া যখন আশ্বস্ত করে যে তার শাশুড়ি বাড়িতে নেই এমন প্রলোভনও তাকে টলাতে পারে নি। দীনেশের আচরণে দরদীয়া ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছে—

> "তোহার রুপেয়া তু লেহঁল। তোহার রুপেয়া কৌন মাঙত?"
>
> (২খ, ৩০১ পৃ)

দরদীয়ার এই কথায় ও আচরণে দীনেশ তার মহত্ত্বকে ধরে রাখার সচেতন প্রয়াস চালিয়েছে। তবে দীনেশের এই আচরণ নিজের কাছে পরিপূর্ণভাবে সত্য-তাড়িত বলে মনে হয় নি এর প্রমাণ পাওয়া যায় দীনেশের এ কথায়—

> "নোটটা আমার মাথার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আরক্ত মুখে সে দ্রুতপদে নিচে নেমে গেল। আমি নিজের মহত্ত্বে একটু হাসলাম।" (২খ, ৩০১ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

শুধু এই মহত্ত্ব নয়। নীতিহীন কাজেও আমরা দীনেশকে জড়াতে দেখি। আল্লুর বিরুদ্ধে সে মুসলমান খয়রাকে লাগিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়। আর তা করেছিল সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে যা অতি ঘৃণ্য কাজ। মানবিক বোধসম্পন্ন কোনো মানুষ এমন জঘন্য অপরাধ করতে পারে না। যা করার চেষ্টা চালায় দীনেশ। সে সময় দীনেশ খয়রাকে বলে—

> "তার আগেই তোর ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে যে রে। তুই মুসলমান, তবু তোকে উঠোব না, তাই তোর ঘর পুড়িয়ে দেবে।"(২খ, ৩০২ পৃ)

তবে এই হীন কাজে জড়ানোর জন্য সে অনুশোচনা প্রকাশ করে। এই ঘৃণ্য প্রয়াস তার আগের অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় কালিমা লেপন করে। পাঁচু-শা যখন খয়রাকে তুলে দেবার জন্য দীনেশকে বলে তখন সে দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করে।

দীনেশের মনে ঈর্ষা ও প্রতিশোধ প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। আল্লুর পেছনে খয়রাকে লাগিয়ে দেয়ার মধ্যে এই দুই কারণ ছাড়া ভিন্ন কোনো অজুহাত ছিল না। এদিক দিয়ে দেখলে দীনেশচরিত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। যা তাকে রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে তুলে ধরে। দীনেশের এই মানবীয় রূপ চুপসে যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসপ্রবণতায়। প্রেমের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক আচরণ সরাতে পারে না দীনেশ। আর তা না হলে কসৌলিয়া ও দরদীয়ার সঙ্গে তার প্রণয় গড়ে না ওঠার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না। বিশেষ করে কসৌলিয়ার ক্ষেত্রে এ কথা বেশি করে প্রযোজ্য। কসৌলিয়াকে আল্লু তুলে দিতে চেয়েছিল দীনেশের হাতে। সামাজিক সংস্কারের কারণে সে তা গ্রহণ করতে পারে নি। দরদীয়া তো চরম আঁকুতি প্রকাশ করেছিল দীনেশের সঙ্গ লাভের জন্য। দরদীয়া চেয়েছিল তার যৌবনের কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে। দরদীয়ার এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে দীনেশের ভীরুতায়। এরই পরিণতি লক্ষ করা যায় কেসৌলিয়ার ক্ষেত্রে। বলা যায়, দীনেশের ভীরুতায় ভেঙে যায় প্রণয় গড়ে ওঠার ভিত। এর কারণ অবশ্যই মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা। কেননা কসৌলিয়া ও দরদীয়ার মানসিক ও সামাজিক অবস্থান বৃত্তহীন শ্রেণিতে। তবে আল্লু অবশ্য বৃত্তহীন শ্রেণি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সে পরিণত হয় ঠিকাদারে। তবে এতে করে কসৌলিয়াও আল্লুর সামাজিক অবস্থান এতটা পরিবর্তিত হয় নি যা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি দীনেশের সামাজিক অবস্থান ছুঁতে পারে। এই ব্যবধানের কারণেই পরিণতি পায় নি মর্ত্যলোকের সাধারণ রমণী দরদীয়া ও কসৌলিয়ার প্রেম। শহরবাসী সৌখিন মধ্যবিত্তের কাছে তা শুধু অনুভবের আর পুলকিত হবার। যার বাস্তব পরিণতি দেখা যায় না। ছোঁয়া যায় না সংসার জীবনে নিম্নবর্গের ঐ নারীকে। ছুঁইলে যে ভেঙে যায় সচেতনভাবে লালন করা মধ্যবিত্তের মানসপ্রাসাদ। এই দুই সাধারণ রমণীর ব্যর্থ

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের গল্প বলে পুলকিত হয় দীনেশ। বট গাছের ছায়ায় ভ্রমণপিয়াসী বন্ধুদের কাছে ঐ প্রেমের গল্প বলার আগে তার ভূমিকা ছিল এম—

> "সামান্য কটি জিনিস নিয়ে তুমি মন্দ রোমান্স খাড়া করোনি ! কিন্তু তোমাদের দুজনেরই প্রেম কৈশোরের প্রেম, স্বপ্নই সেখানে বেশি। তোমাদের প্রেমে তোমরা নিজেদের কল্পনাকে ভালোবেসেছ। কিন্তু প্রেমের কল্পলোকের মতো তার মর্ত্যও-আছে। অবশ্য সত্যিকার প্রেম এই মর্ত্য থেকে উঠে কল্পলোকে পাখা মেলে। কিন্তু তোমরা যখন শুধু কল্পলোকের কথা বললে, আমি পাল্লা ঠিক রাখবার জন্যে শুধু মর্ত্যের কথাই বলব গল্প করে।"(২খ, ২৯৫ পৃ)

পঞ্চশরের প্রথম গল্পের একটি চরিত্র চিত্রার বাবা। গল্পে তার প্রত্যক্ষ কোনো উপস্থিতি নেই। সংসারের প্রতি উদাসীন বলেই গল্পের অবয়বে তার প্রত্যেক্ষ উপস্থিতির প্রয়োজন হয় নি। ঘটনা প্রসঙ্গে তার কথা উঠে এসেছে মাত্র। চিত্রাদের পরিবারে দারিদ্র্যের জন্য তার নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করা যেতে পারে। যে সল্প পরিসরে তার কথা উঠে এসেছে তাতে তার পেশা সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণা মেলে না। তবে সৌখিন মানুষ হিসেবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সখ মেটানোর জন্য তিনি টাকা ধার করতে দ্বিধা করেন নি। বাড়িওয়ালার ছেলের কাছে টাকা ধার নিতেও তার কোনো দ্বিধার পরিচয় পাওয়া যায় নি। এসব সংকট চিত্রার বাবা চরিত্রের বড় দুর্বলতা। এই দুর্বলতার কারণেই তিনি সংসারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে তারা স্বামী-স্ত্রী দু জনেই একই মনোভাব ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অনন্তের কাছে যে চিত্রার বাবা- টাকা ধার নিয়েছে ঘোরদৌড়ের জন্য এটা চিত্রাই তুলে ধরেছে। এর মধ্য চিত্রা বাবা গল্পে প্রবেশ করেন। চিত্রা যেমন তার মায়ের অর্থলোভী মনোভাবকে সমর্থন করতে পারে নি তেমনি পারে নি তার বাবার মানসিকতাকে মেনে নিতে।

সমাজে চিত্রার বাবার মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু মানুষ রয়েছেন যারা সংগ্রামশীলতাকে ভয় পান। চান না লড়াই করতে। করতে চাননা ভাগ্য পরিবর্তন। তারা নিজের সুখ ও ইচ্ছা পূরণের দিকেই মনোযোগ দেন। তাতে যদি মর্যাদাহানির প্রশ্নও আসে তাতে কিছু আসে যায় না। লক্ষ্য পূরণে তারা বিভোর ও একমুখি। চিত্রার বাবাকে যেমনটি দেখা যায়। সেজন্য এসব পরিবারের সন্তানদের দিতে হয় চরমমূল্য। যেমন মূল্য দিতে হয়েছে চিত্রাকে।

অন্যদিকে চিত্রার মা স্বামীকে অনেক ভালো মানুষ হিসেবে দেখেছেন। তিনি আসামে জিতেনের বাড়িতে থাকা অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে তার চিন্তা তুলে ধরতে গিয়ে অনন্তকে বলেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> "এই বিদেশে কী সুখে আছি বাবা! তিনি তো পুণ্যাত্মা লোক, সকল দায় এড়িয়ে স্বর্গে চলে গেলেন– আর আমি হতভাগী পড়ে রইলাম ! একটি পয়সা নেই, গলায় এত বড় একটা মেয়ে ঝুলছে, কী যে করব !" (২খ, ২৯০ পৃ)

তবে স্বামী যে পরিবারের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন নি এটি তার উপর্যুক্ত অভিযোগ থেকেই উঠে এসেছে। এই অভিযোগ অবান্তর নয়। তবে চিত্রার বাবা বেঁচে থাকাকালে অর্থনৈতিক সংগ্রামের জন্য স্ত্রীর দিক থেকে কোনো তাগিদ লাভ করেন নি।

অনন্তের মায়ের কাছে লেখা চিত্রার মায়ের চিঠি থেকে জানা যায় চিত্রার বাবা মারা গেছেন হঠাৎ কদিনের জ্বরে। তার মৃত্যুতে চিত্রার মা অসহায় হয়ে পড়েন। দেশেও তাঁদের বেঁচে থাকার মতো সম্পদ না থাকায় সংকট চরম রূপ নেয়।

সেকারণে চিত্রার বাবা চরিত্রটি পাঠক হৃদয়ে অনুকম্পা ছাড়া মর্যাদাকর কোনো আসন পায় না। চিত্রার বাবা সমাজের একটি অংশের উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি যারা ব্যর্থতায় নিজেদের অবস্থান ষোলকলায় পূর্ণ করেন।

ভিজেবারুদ গল্পের একটি প্রাণবন্ত চরিত্র দিবাকর। গল্পের স্বল্প পরিসর জুড়ে অবস্থান করলেও উজ্জ্বলতম চরিত্র এটি। সে পেশায় ব্যাংকার। কলকাতার একটি বিখ্যাত ব্যাংকের শাখা স্থাপিত হলে দিবাকর প্রথম ম্যানেজার হয়ে আসে। সে ব্যাংকটিকে দুদিনে যেমন দাঁড় করিয়ে দেয় তেমনি সবার মন জয় করে নেয়। যেমনি সুঠাম তার দেহ তেমনি সরল মধুর ব্যবহার। সবচেয়ে অদ্ভুদ তার ভেতরকার প্রাণের প্রাচুর্য। তার দুরন্ত উৎসাহ অল্প সময়ে সবার মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বদলে যায় শহরের জীবনধারা।

দিবাকরকে সম্ভাবনাময় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করে তার জীবনবোধ। প্রভাব বিস্তারের অসীম ক্ষমতা তাকে সমাজের উপর তলার আসনে উঠে যাওয়ার ঈঙ্গিত দান করে। কেননা তার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে। সে সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছে বিষয় ও প্রাণপ্রাচুর্যকে। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে সে আকড়ে ধরে থাকে নি। তার এই বৈশিষ্ট্য সমাজে উপর তলায় আসন করে নেয়ার উপযুক্ত সিঁড়ি। যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠার ক্ষমতা দিবাকরের ছিল।

তার এ প্রাচুর্য ও প্রাণময়তায় শুধু সাধারণ মানুষই মোহিত হয় নি। মোহিত হয়েছে শঠ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনের অধিকারী লতিকার বাবা ও মা। লতিকাও আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। দিবাকরের উজ্জ্বলতায় তাদের মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠে। এর মধ্যে লতিকার বাবা-মা সিদ্ধান্ত নেন দিবাকরের হাতে মেয়েকে তুলে দেবেন। তারা এ বিষয়ে কথা পাকাপাকি করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

একদিন দিবাকরকে বাড়িতে ডাকেন। এ সময়ে দেখা দেয় বিপত্তি। দিবাকরের ব্যাংকের বেশ কিছু টাকা এ সময় খোয়া যায়।

ব্যাংকম্যানেজার হিসেবে দিবাকর তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। সাত দিনের মধ্যে লোপাট হওয়া টাকা ব্যাংকে জমা না দিলে তা আর চেপে রাখা যাবে না। এমন পরিস্থিতিতে দিবাকর আঘোরকে জানায়—

> "যদি সাত দিনের মধ্যে না ফিরি তাহলে আর ফিরব না জানবেন। লতিকাকে কিছু কিছু বলেছি শুধু এই কথাটাই জানাতে পারিনি। যদি আর না ফিরি তাহলে আশা করি আমায় ভুল বুঝবেন না, লতিকাকেও এ কথাটা জানিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বারণ করবেন।"(২খ, ২৭৩ পৃ)

অঘোরকে দিয়ে লতিকাকে তার অবস্থান জানাতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে দিবাকর নীতিবোধের পরিচয়ে দিয়েছে। দিবাকরের এ থেকে বুঝা যায় দিবাকর চায় অযথাই লতিকা তার জন্য অপেক্ষা করে যেনো জীবনকে নষ্ট না করে। তার বিশ্বাস এ মনোভাবের কথা জানতে পারলে লতিকার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে।

দিবাকর সব মানুষের সঙ্গে মেশার সহজাত ক্ষমতা অর্জন করলেও আমরা তাকে একজন ব্যর্থ প্রশাসক হিসেবে দেখতে পাই। যদিও প্রথম দিকে খুব সহজে সে ব্যাংকের শাখা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। কিন্তু ব্যর্থ হয় সে শৃঙ্খলা রক্ষায়।

অনেক টাকা চুরি যাওয়ার বিষয়টির সঙ্গে কারা জড়িত এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কারণ জানা যায় না। তবে ব্যাংকের টাকা খোয়া যাবার পরও দিবাকরের সততার প্রতি লতিকা অটল বিশ্বাস বজায় রাখে। এ সম্পর্কে লতিকার মূল্যায়ন–

> " ---এ চুরির দায় ওর নিজের কাঁধে নেবার কোনো দরকারই ছিল না, কিন্তু ওর আশ্রয়ে তোমার মতো যারা কাজ করে, পাছে নির্দোষ হয়েও তারা এই ব্যাপারে লাঞ্ছিত হয়, তাই সমস্ত দোষ নিজের ওপর নিয়ে ও টাকার সন্ধানে যাচ্ছে। আমি ওকে ভালো করেই চিনেছি। মুখে আমায় না বলে গেলেও আমি জানি, টাকার জোগাড় না করতে পারলে ও আর ফিরবে না।---------" (২খ, ২৭৪ পৃ)

অঘোর অনেক দিন পর এ শহরে এসে দেখে সত্যিকারে এখানে একটি কাগজের কল হচ্ছে আর সেই কাগজের কলের কন্ট্রাকটরের গাড়িতে লতিকার মতোই একজন নারীকে আবিষ্কার করে অঘোর।

Dhaka University Institutional Repository

এই কন্ট্রাকটরই যদি দিবাকর হয় তাহলে বলা যায় দিবাকর তার উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি অতিক্রম করে বিত্তবান পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শশধরবাবু *ভিজে বারুদ* গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তিনি নিজেকে অবসর প্রাপ্ত পেশাজীবী হিসেবে পরিচয় দেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তবে উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা তার রয়েছে। কিন্তু তার সে আকাঙ্ক্ষা বাস্ত বায়নের সামর্থ্য বা কার্যকর উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। উদ্যোগহীনতা ও উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষার কারণে তার জীবন ও সংসারে এসেছে জটিলতা। শশধরবাবু পরিণত হয়েছেন শঠ ও প্রতারকে।

সেকারণে মধ্যবিত্ত পরজীবী শ্রেণিতে তার অবস্থান। তার বর্তমান অবস্থা এ বক্তব্যের পক্ষেই সমর্থন যোগায়।

বর্তমানে ছোট একটি শহরের শেষ প্রান্তে তিনি বাড়ি করে আছেন। সেখানে এখনো গ্রামের চিহ্ন মুছে যায় নি। এমন পরিবেশে অবস্থান করাটা বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বাধ্যতামূলক। তার অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় বাড়ির বর্ণনায়। লেখক তার বাড়ির পরিবেশকে তুলে ধরেছেন এভাবে—

> "দূর থেকে দেখলে বাড়িটায় কেউ যে বাস করতে পারে তা মনে হবার কথা নয়। চারিধারের অরণ্য-বেষ্টনীর ভয়ে কারা যেন তৈরী করতে করতে বাড়িটা ফেলে চলে গেছে বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাঁশের ভারাগুলো খোলা হয়নি। ইঁটের দেওয়ালগুলোতে চুনবালির পলস্তারা পড়েনি, রোদে জলে এখানে-সেখানে শুধু শ্যাওলার ছোপ ধরছে। চুনমাখা বালতি কড়া পর্যন্ত এধারে ওধারে ছড়ানো। বাঁশের ভারার তলা দিয়ে সাজানো ইঁটের ধাপ বেয়ে তারপর ভেতরে ঢোকা যেত। ভেতরটা বাহিরের মতোই অসম্পূর্ণ। গুটি চারেক মাত্র ঘর তারও দুটিতে জানলা দরজা বসানো হয়নি। বিরাট ফোকরগুলো দাঁত-বারকরা ইঁটের দেয়ালের গায়ে হাঁ করে আছে।"(২খ, ২৬৮ পৃ)

অর্থনৈতিক সংকট থাকলেও শশধরবাবু তা চেপে রাখতে চান। তিনি কর্তৃত্ব ফলাতেও পিছপা হন না। তিনি গ্রহণ করেছেন সুবিধাবাদী নীতি। অন্যকে ঘায়েল করার জন্য তিনি বিশেষভাবে তৎপর। এটি তার মানসপ্রবণতার অন্যতম দিক। অঘোরের প্রতি তার আচরণে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। যে অঘোরের টাকা ছাড়া তার সংসার চলে না। সে অঘোরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে তার বাধে না।

শশধরবাবু সুস্থ থাকলেই অঘোরের প্রতি এমন আচরণ করেন। শশধরবাবু অঘোরকে খবরের কাগজের টেন্ডার আর ব্যবসা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো পড়তে বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

অঘোর ইংরেজি উচ্চারণে ভুল করলেই তার শিক্ষা নিয়ে ঠাট্টা করেন। অঘোরের শিক্ষা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ছিল এমন—

> "তুমি নাকি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছিলে অঘোর। Veterinary হাসপাতালের মতো ওইরকম কলেজে নাকি ? ঘোড়া- গোরুতে যেখানে পড়ে! "(২খ, ২৭০ পৃ)

অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে ও শিক্ষায় ব্যাংক কর্মকর্তা দিবাকর ভালো অবস্থানে থাকায় শশধরবাবু তার প্রতি মর্যদাকর আচরণ করেন। দিবাকরের সঙ্গে তিনি সম্মানের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মীয়তার পরিচয় তুলে দিবাকরকে বাসায় আনেন। অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে খাতির জমিয়ে তোলেন। শুধু তাই নয় এক পর্যায়ে দিবাকরের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেয়ারও সিদ্ধান্ত নেন। বিয়ের বন্দোবস্ত দ্রুত পাকাপাকি করে নিতে চান।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শশধরবাবুর অবস্থান অঘোরের কাছে ধরা পড়েছে এভাবে—

> "বেশির ভাগ সময় চটের ডেক চেয়ারটায় বসে তিনি হিসেবপত্র লেখালেখি করেন। কলকাতার বাড়ি বেঁচে সেই টাকায় এখানে একটা কাগজের কারখানা বসাবার মতো কোম্পানি গড়ে তুলবেন বলে অঘোর শুনেছে। দু-চারজন বড়ো বড়ো অংশীদারও নাকি তিনি জুটিয়ে ফেলেছেন!"(২খ, ২৭১ পৃ)

তবে শশধরবাবুর চরিত্রের সুনিপুণ বিশ্লেষণ প্রতিফলিত হয়েছে লতিকার এ মন্তব্যে—

> "ভণ্ড চোরের ঘরেই আমার জন্ম। আমার বাবা সারাজীবন লোক ঠকিয়ে এসেছেন। আমার মার সমস্ত গয়না যেমন মেকী গিল্টি, বাবার কলকাতার বাড়িও তেমনি একটা মিথ্যে ধাপ্পা। এই কাগজের কলের মতো বাবার কত কারবার শূন্যে তৈরী হয়ে মিলিয়ে গেছে তার হিসেব নেই।"(২খ, ২৭৪ পৃ)

শশধরবাবুর মধ্যে যে শঠতা ও ব্যক্তিস্বার্থ চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তা আমাদের সমাজেরই একটি বাস্তব রূপ। আর সেই বাস্তবতা ছুঁয়ে গেছেন শশধরবাবু।

মেনকার মামা *পাহাড়* গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। পেশায় সরকারি চাকরিজীবী। পেশাগত অবস্থান বিবেচনায় তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। কলকাতা শহরে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করার অর্থনৈতিক সামর্থ্য তার রয়েছে। অনাথা ভাগ্নীকেও আশ্রয় দিয়েছেন সংসারে। তবে ভাগ্নীর পিছনে তিনি অর্থ ব্যয় করেন হিসাব করে। এক্ষেত্রে তাকে বেশ হিসাবি হিসেবে দেখা যায়। এ মানসিকতার কারণে বিনা খরচে স্বদেশি ছেলে শশধরে কাছে অনাথা ভাগ্নীকে উৎসর্গ করতে পেরে খুশিই হয়েছিলেন। এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের ভারমুক্ত হওয়ার যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা তা মামাবাবুর মধ্যে লক্ষ করা যায়। এমনকি

Dhaka University Institutional Repository

সেটা যদি একটু মান হারিয়েও হয় তাতেও এই শ্রেণির মানুষের আপত্তি থাকে না। যেমন আপত্তি হয় নি স্বদেশি শশধরের সঙ্গে ভাগ্নীর বিয়ে দিতে।

আবার সংকট দেখা দিলে পরক্ষণেই তাতে চরম বিরক্তিবোধ করেন। মনে হয় অযথাই উৎপাত। যেমনটি হয়েছিল শশধরের ক্ষেত্রে। তখন আর খুশির রেশ থাকে না। শশধর জেল থেকে পালিয়ে গেলে পুলিশ মেনকার মামার বাড়ি নজরে রাখে। পুলিশি তৎপরতার কারণে সবসময় থমথমে পরিস্থিতিতে মামাবাবু রাগ ও বিরক্তি গোপন করতে পারেন না। এক্ষেত্রে তার মনে হয়েছে যেনো সব দোষ মেনকার। তার জন্যই তো এ সমস্যা তৈরী হয়েছে। এ জন্য মেনকাই যে দায়ী বার বার উঠতে বসতে সে কথা বলেছেন। এমনকি চাকরিটাও যে চলে যেতে পারে তাও প্রায়ই শুনিয়েছেন। চাকরি চলে যাবার ভয়ে মামাবাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন । এই অসহিষ্ণুতা মধ্যবিত্তেরই। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনুষ তার স্বাভাবিক স্থান চ্যুত হতে দেখলে আঁতকে ওঠে। বিশেষত তা যদি জীবিকা সংক্রান্ত হয়। সরকারি চাকরি হলে তো আতঙ্কের পারদ উঠে সর্বোচ্চ পর্যায়ে।

বিশেষত সে চাকরিটি যদি একমাত্র জীবিকা অর্জনের পথ হয় তাহলে তো কথাই নেই। মামাবাবুর ক্ষেত্রে চাকরিটি একমাত্র অবলম্বন কিনা তা গল্পে উল্লেখ না থাকলে এটি যে তার একমাত্র আয়ের পথ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বিকল্প আয় থাকলে তিনি ভাগ্নীকে হয়তো এভাবে বিয়ে দিতেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। লেখক স্বল্প পরিসরে মামাবাবুর অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> "মামাবাবু তো তখন বিরক্তি ও রাগ গোপন করবার চেষ্টাই করেননি। সব দোষ যেন মেনকার। এই হতভাগী মেয়েটার জন্যেই তাঁর সব শাস্তি ,এমনকি চাকরিটা পর্যন্ত যে যেতে বসেছে, উঠতে বসতে সে কথা শুনিয়েছেন। অনাথা ভাগনীটাকে, স্বদেশী ছেলে বলেই বিনা খরচে উৎসর্গ করতে পেরে একদিন যে খুশিই হয়েছিলেন সে কথা তখন ভুলে গেছেন।"

মামাবাবু চরিত্র বিশ্লেষণে আত্মসচেতনতার লক্ষণ প্রথমেই ধরা পরে। এক্ষেত্রে নিজের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলেই তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। হারিয়ে ফেলেন আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। প্রকাশিত হয়ে যায় তার মানসিক জটিলতা ও ক্ষুদ্রতা। তবে এটিকে মামাবাবু চরিত্রের পরিকল্পিত স্বার্থবুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন আচরণ হিসেবে গ্রহণ করা থেকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। কেননা মামাবাবু চরিত্রটি একেবারে মানবিক অনুভূতি শূন্য নয়। ভাগ্নী মেনকাকে আশ্রয় ও বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নেয়ার বিষয়টি তাকে মানবিক করে তুলেছে।

চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে তিনি মেনকার প্রতি বিরূপ আচরণ করেছেন। মধ্যবিত্তের এ আচরণ অস্বাভাবিক নয়। মধ্যবিত্তের এই শ্রেণিটি সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর ও স্থির

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাবের। এদের অধিকাংশ কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। জটিলতাহীন জীবন তাদের পছন্দের। আর যারা এখানে ঝুঁকি নিতে পারেন তারা মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ক্রমান্বয়ে বিত্তবান শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। মামাবাবু প্রথম দলের অন্তর্গত।

মামাবাবু এ আচরণকে তাই মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক টানাপড়েন হিসেবে দেখা যায়। এমন বিশ্লেষণ অধিক যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তব সম্মত।

পঞ্চশরের দ্বিতীয় গল্পের নায়ক সুধীর একজন পেশাজীবী। পেশাগত দক্ষতা অর্জনে তার রয়েছে সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ। শুধু তাই নয় সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কেও সে অত্যন্ত সচেতন। পেশাজীবী হলেও তার মধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ জড়তা লক্ষ করা যায় না। বিদেশে গিয়ে তাই সহজে সে আস্তানা গড়ে নেয়। সেখানে সে বন্ধু সহদেবের মাকে পাতানো মা বানায়। পাতানো মায়ের বাড়িতে যওয়ার সময় প্রথম দিন সে ভুল করে অন্য বাসায় চলে যাচ্ছিল। কেননা সে বাসা ও সহদেবদের বাসায় যাওয়ার একটিই রাস্তা। এই ভুল করার সময় সে একটি মৃণালশুভ্র মুখের আভাস দেখতে পায়। দেখে তুষারধবল বসনে অবগুণ্ঠিতা এক নারী সরে যাচ্ছে। ছেড়া জামা পরার মধ্য দিয়েও সে এই প্রমাণ রেখেছে। ছেঁড়া জামা পড়তে লজ্জা হয় কিনা মায়ের এ প্রশ্নের জবাবে সে বলেছে—

> "না, মা, তোমার ও ছেলেটির মতো ভোলানাথ আজও হতে পারিনি। সেলাই করবার উপায় নেই বলেই ছেঁড়া জামাটা চালিয়ে নিই।"(২খ, ২৯৩ পৃ)

বাইরে কাজ করার সময় তাকে প্রায়ই রাত করে বাড়িতে ফিরতে হয়। একদিন দরজা দিয়ে ঢুকে অন্ধকার পথে সুধীর হোঁচট খায়। মাকে সেটা সুধীর জানায় নি অন্ধকার দূর করতে তিনি অতিরিক্ত কষ্ট করবেন দেখে। এরপরের রাত বারোটায় সে দেখে প্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। প্রদীপ জ্বালানো দেখে সুধীর ভাবে মায়ের মনে কিছু লুকানো থাকে না।

এই সময়ে পাতানো মা সুধীরের জন্য সবকিছু করার চেষ্টা করেন। পুত্রের ছেঁড়া জামা পাশের বাড়ির মেয়েটিকে দিয়ে রিপু করিয়েছেন। এমনকি যে বাড়িতে দীর্ঘদিন আমিষ রান্না হত না যেখানে সুধীরকে আমিষ খেতে দেন। সুধীর এতে আপত্তি জানালে মা জানিয়েছেন পাশের বাড়ির মেয়েটি জোর করে দিয়ে যায়।

ঝড় বৃষ্টির রাতে এই মেয়েটি লণ্ঠনের আলো দিয়ে পথ দেখাতো। এই মেয়েটির মানসিক প্রবণতাকে সুধীর অনুভব করেছে এভাবে—

> "শুধু আমায় একটুখানি পথ দেখাবার জন্য দুরন্ত রাত্রির প্রহর কেউ বিনিদ্র হয়ে কাটিয়েছে— একথা কল্পনা করবার মতো দুঃসাহস বা

Dhaka University Institutional Repository

> অহংকার আমার ছিল না, তবে----অদ্ভুত এই অপরিচিতা রহস্যময়ীর আচরণ !"(২খ, ২৯৪ পৃ)

এই মেয়েটি মনোভাব অনুভব করলেও সুধীর নিজেকে প্রেমের জালে জড়ায় নি। এক্ষেত্রে সে সচেতনার পরিচয় দিয়েছে। অসম অবস্থার কারণে তার মনে সাড়া জাগে নি। জেগেছে কৌতূহল মাত্র। এ সাড়া না জাগার কারণ মেয়েটি একে তো গরিব তার ওপর বাল্য বিধবা। এই প্রবল বৈরী পরিবেশে প্রেমের স্রোতে ভেসে চলা সচেতন সুধীরের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তার লক্ষ্য বেশ সুদূরে। তার মধ্যে শ্রেণি উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এজন্যে সে সাগরপারে দেশান্তরে যেতে দ্বিধা করে না। সে চলে যায় সুদূর সুভালাভালিতে । সুধীরের বিদেশে যাওয়ার কথা শুনে পাতানো মায়ের আর্তি ছিল এমন—

> "অত দূরদেশে কাজ শিখতে না গেলে কি চলত না বাবা, যা তোরা ভালো বুঝিস কর, কিন্তু মায়ের মুখের দিকে চাইলিনে এই বড়ো দুখ্‌খু। একজন তো সন্ন্যাসী হয়ে রইল, তুই কাছে থেকে বিয়ে-থা করে সংসারী হবি দেখব বলে কত আশা ছিল, তা নয়, তুই চললি একেবারে একটু-আধটু দূরে নয়— সাগরপারে দেশান্তরে। তোদের আর মায়ামমতা নেই"(২খ, ২৯৪পৃ)

মায়ের এই আর্তিতে সুধীর যা বলেছিল তাতেও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। সে বলেছে—

> "আশীর্বাদ করো মানুষ হয়ে তোমার কোলে ফিরে আসি তাড়াতাড়ি"(২খ,২৯৪ পৃ)

বিদেশে যাওয়ার পর সুধীর মেয়েটির আর কোনো খবর পায় নি। নিজে উদ্যোগী হয়ে তার অবস্থা জানার চেষ্টাও করে নি। এই খোঁজ না নেয়াটা তার জন্য অস্বাভাবিক নয়। কেননা প্রয়োজন ছাড়া সে খোঁজ নেবে কেনো। সেখানে তো তার কোনো স্বার্থ নেই। তাই মেয়েটির যে কোনো পরিণতিতে তার কিছু আসে যায় না। মেয়েটির চকিত চাহনি দেখতে পেলেও সুধীর সে বাড়িতে অবস্থানকালেও তার প্রতি অতিরিক্ত উৎসাহ দেখায় নি। মায়ের কাছে মেয়েটির বর্ণনা কর্মহীন দর্শকের মতো শুনেছে মাত্র। যেখানে দু মাসের জায়গায় ছয় মাস অবস্থান করতে হয় তাকে। এই দীর্ঘ সময়ে মেয়েটির সঙ্গে তার কোনোদিন আলাপও হয় নি। তাই দূর দেশে গিয়ে ঐ মেয়েটি খবর নেবে এটা আশা করা স্বাভাবিক কারণেই ঠিক নয়।

তবে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তার কষ্টে সুধীরকে ব্যথিত হতে দেখা যায়। মাকে দিয়ে আমিষ রান্না করিয়ে নিতে তার আপত্তি এই চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। মায়ের প্রতি সুধীর কি দায়িত্ব পালন করেছে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এটি সুধীর চরিত্রের আর একটি বড় দুর্বলতা। তবে তার বন্ধু সহদেব ও পাতানো মায়ের মৃত্যুর খবর সে জানে। এ ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

কিছুটা হলেও সে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু নয়।

রমেশ *শবযাত্রা* গল্পের নায়ক। মানুষের কোমল অনুভূতি কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় তাই দেখা যায় রমেশের মধ্য দিয়ে। দাম্পত্য ও আর্থিক বিষয় নয় একটি মৃত্যুকে ঘিরে মানুষের মনের চিরকালীন যে ভাবনা তাই চিত্রায়িত হয়েছে রমেশের মধ্য দিয়ে। ছোট বোন রমার সাত বছরের খুকির মৃত্যুকে ঘিরে সে অবলোকন করে মৃত্যুর স্বরূপ। তাই মৃত্যুকে ঘিরে সে নতুন অনুভূতি প্রত্যক্ষ করে। ছোট বোন রমার মতো সেও মৃত্যুর রূপ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ মৃত্যুকে ঘিরে যখন মানুষের অনুভূতিহীনতা প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে তখন সে ব্যথিত হয়। মামা, অক্ষয়, পিসিমা, শ্মশানের কেরানীর আচরণে সে বিস্মিত হয়। সে বিস্মিত হয় এই ভেবে যে একটি মৃত্যু তাদের কাছে এত স্বাভাবিক হয় কিভাবে ? সে পিসিমার কথায় ভগ্নিপতি প্রশান্তের জন্য বিচলিত হয়ে উঠে। সে ভাবে প্রসন্নবাবু হয়তো এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে পারে। পোলের দিকে দ্রুত ছুটে যাওয়া তারই প্রমাণ। কেননা সে জানে মাস খানেক আগে পোলের উপর হতে খালে লাফ দিয়ে একটি রমণী আত্মহত্যা করে। কিন্তু পরক্ষণে প্রসন্নবাবুর অবিচলিত ভাব দেখে রমেশ বিস্মিত হয়। সে ভাবতে পারে না এমন পরিস্থিতিতে একজন মানুষ কিভাবে তার স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এই প্রশ্নই জাগে রমেশের মনে—

> "কিন্তু মৃত্যু— খুকী যে মরিয়াছে ! আজ পৃথিবীর সব কাজ সঙ্গতির মাত্রা রাখিয়া কেমন করিয়া চলিবে !"(১খ, ২৭১ পৃ)

প্রসন্নবাবুর কিছু কাজও তাই তার কাছে অদ্ভুদ ঠেকে। যেমন—

> "প্রসন্নবাবু একটা চুরুট ধরান। রমেশ বিমূঢ় হইয়া দেখে মন তাঁহার যত বিচলিতই হোক উত্তরে বাতাস হইতে দেশলাই এর শিখাটিকে আড়াল করিয়া সযত্নে চুরুটে লাগাইবার বেলা কোন ত্রুটিই প্রশন্নবাবুর হয় নাই। কাঠিটা দুই বার নাড়িয়া নিভাইয়া তিনি চিরদিনের অভ্যাস মতই ফেলিয়া দেন। "(১খ, ২৭১ পৃ)

অন্যের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেই সে বেদনাবোধ করে নি। সে আত্ম সমালোচনাও করেছে। বোনের এই বিপদের সময় নিজের সুখের কথা ভাবার কারণে সে আত্মপীড়নে দগ্ধ হয়েছে। তবে রমেশ যে পরিস্থিতিতে আত্মসুখ হারানোর জন্য কষ্ট অনুভব করেছে তা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যু সম্পর্কে রমেশের মূল্যায়ন ছিল এমন—

> "কাল যে ছিল আজ সে নাই এই নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারটির ভয়ঙ্কর রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে অকস্মাৎ বিহ্বল হইয়া পড়ে। "(১খ, ২৭০ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

জীবন সম্পর্কে তার ধারণা ছিল এমন—

> "মৃত্যু পুরাতন, কিন্তু বাঁচিবার অভ্যাস যে মানুষের আরো পুরাতন। মৃত্যুকে সহজে উপলব্ধি করা কি যায় !"(১খ, ২৭০ পৃ)

মানুষের বেঁচে থাকার অভ্যাস মৃত্যুর থেকেও পুরাতন তাই আর সব জীবনমুখি মানুষের মতো রমেশের যদি নিজের জীবনের প্রতি মায়া জাগে তাতে কোনোভাবে দোষ দেয়া যায় না। বরং বলা যায় রমেশের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক আচরণ চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উষাপতি রক্ষিত *দৃষ্টি* গল্পের অন্যতম চরিত্র। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই তার যাত্রা শুরু। প্রথম জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যায় তাকে নিমজ্জিত হতে হয়। অবশ্য সাধ্যের চেয়ে তার আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক বড়। তার স্বপ্ন ছিল ছবি আঁকা। কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়ে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে দেখা যায় তাকে। সে ছবি আঁকা বাদ দিয়ে অফিসের চাকরি খুঁজতে থাকে। এই চাকরি খুঁজাকালে গল্পকথক তাকে বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার পরামর্শ দেন। যখন বিজ্ঞাপনের বাজারে শিল্পীদের তেমন কদর শুরু হয় নি। এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিবের কাছে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানে দু' একটা কাজও পায়। কিন্তু সেখান থেকে তাকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়। তার কাজ দেখে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিবের মন্তব্য ছিল এমন—

> "কাগজের ওপর এ কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং আঁকবার জন্য পয়সা দিয়ে লোক নেবার কী দরকার ? রঙের বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে তিনি নিজেই এরকম কাগজ নোংরা করতে পারতেন।"(১খ, ১৫৩ পৃ)

নিজে চিত্রশিল্পী হিসেবে মেধাবী না হলে শিল্পকর্ম ও জাত শিল্পী চিনতে ভুল করে নি। উষাপতি রক্ষিত একদিন প্রতিমার চালচিত্র দেখে অধরদাসকে আবিষ্কার করে। সে বাপ-পিতাম'র এই আঁকা-আঁকির পেশা ছেড়ে দিয়ে কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ নিয়েছে।

উষাপতি রক্ষিত তাকে আবিষ্কার করে বসে থাকে নি। রক্ষিত অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দেয় অধরকে সেখান থেকে নিয়ে এসে ছবি আঁকার কাজে লাগিয়ে দিয়ে।

এর পর অধর ছবি আঁকা ছেড়ে দেয়ার কথা রক্ষিতকে জানায়। রক্ষিত এ সময় অধরের ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করার কথা বলে। রক্ষিত আরো জানায়, অধরের ছবি দেখে দেশ-বিদেশের গুণীরা তাক লেগে যাবে। শুধু তাই নয় এ সময় সে অধরকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু সে এতে অধরকে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়। তবে তার আশা ছিল তরলার টানে অধর হয়তো ফিরে আসতে পারে। তরলা মারা যাওয়ার পর রক্ষিত সে আশা ছেড়ে দেয়। গুণী চিত্রশিল্পী না হলেও রক্ষিতের ছবির গুণ বুঝার ক্ষমতা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

উষাপতি রক্ষিত এর পর অধরের ছবি নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে। অন্যের ছবিকে নিজের বলে চালিয়ে দিতে সে সামান্যতম দ্বিধা করে নি। এটি রক্ষিত চরিত্রের চরম নেতিবাচক দিক। এই মনোভাবকে বাজারমুখি চেতনা হিসেবে ধরে নেয়া যায়। যা রক্ষিত অবলীলায় গ্রহণ করেছে। তবে এমনটি সে না করলেও পারতো। ছবি আঁকার কাজে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর প্রতিভাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে পারতো। কিন্তু সে তা না করে শঠতার মাধ্যমে সাফল্য লাভের চেষ্টা করেছে সুনিপুণভাবে। এ পথে সে খ্যাতির পাশাপাশি বিপুল অর্থও অর্জন করেছে। তবে রক্ষিত যে হঠাৎ করেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে এমনটি নয়। আগে থেকেই সে ছিল স্বার্থ সচেতন। যেভাবে হোক সে তার সখ মেটানোর চেষ্টা করেছে। এ সম্পর্কে গল্পকথকের মন্তব্য—

> "কিন্তু রক্ষিত তো সে জাতের মানুষ নয় ! ট্যাক তার গড়ের মাঠ হলেও নজর তার সব সময়ে উঁচু। ঋণ করেও ঘি খাবার শখ সে চিরকাল মিটিয়ে এসেছে।"(২খ, ১৫৩ পৃ)

এ মন্তব্য থেকে দেখা যায় আগাগোরাই রক্ষিত চার্বাক নীতিতে বিশ্বাসী। এর ওপর যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সংকট। এই দু'কারণে রক্ষিতের এমন হঠকারী কাজ করাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে রক্ষিত একেবারে অকৃতজ্ঞ এমনটি বলা যাবে না। অধরকে খোঁজার চেষ্টা রক্ষিত করেছে। কিন্তু খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। অধরকেকে খুঁজে না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে রক্ষিত বলেছে—

> "বিশ্বাস করো, চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু অধরদাস তো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে খোঁজ করবার লোক নয়। রাস্তার ধারের আগাছার মতো সে অতি সাধারণ, অতি নগণ্য। পৃথিবীতে এরা যদি নিজে থেকে হারিয়ে যেতে চায় কার সাধ্য খুঁজে বার করে ! তবু একমাত্র আশা ছিল এই যে, তরলার কাছে একদিন সে হয়তো ফিরে আসতে পারে। তরলা যতদিন ছিল ততদিন তাকে তাই যতদূর সাধ্যে সুখে রেখে ও-অঞ্চল থেকে নড়তে দিইনি। যদি অধর কোনোদিন আসে! কিন্তু সে আশাও আর নেই।"(২খ, ১৫৫ পৃ)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বিবেচনায় বলা যায় রক্ষিত স্থান পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। সে অর্থ ও খ্যাতি দুটোই অর্জন করতে পেরেছে । যদিও এর পেছনে রয়েছে বিরাট একটা ফাঁকি। আমাদের সমাজের অনেকে দেশ ও মানুষকে ফাঁকি দিয়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে নিয়েছে। উষাপতি রক্ষিত এখন বিপুল অর্থ- বিত্তের মালিক। যা ফাঁকি দিয়ে অর্জন করতে তার বাধে নি। তাই বলা যায় উষাপতি রক্ষিত মধ্যবিত্তের সংগ্রামময় জীবন থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এই উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ করার সামগ্রিক গুণাবলীর পরিচয় প্রথম থেকেই পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরোপকারী গল্পের মহিতোষ ভিন্ন ধরনের এক চরিত্র । তার চরিত্র নতুন দিক উন্মোচন করে। মহিতোষ পরের উপকার করে ক্ষতি করার জন্যেই। গল্পের নায়কের সে উপকার করার ছলে বারবার ক্ষতি করেছে। তা করেছে জেনে শুনেই। কিন্ত সে যে পুরোপুরিভাবে শঠ তাও নয়। মহিতোষকে পরিপূর্ণভাবে খল চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। গল্পকথক যখন মহিতোষের স্কুলে প্রথম পড়তে যায় তখন পেন্সিলের অভাবে লিখতে পারছিল না। শিক্ষক প্রচণ্ড কড়া হওয়ায় সে যে প্রথম স্কুলে এসেছে একথা বলার সাহসও পায় না। এ সময় তাকে সহায়তায় এগিয়ে আসে মহিতোষ। সে গল্পকথকের পায়ে প্রবলভাবে খোঁচা দিয়ে খাতা ও পেন্সিল এগিয়ে দেয়। লাল-নীল পেন্সিলে লেখার কারণে কানমলা ও আরো কয়েকটা গাট্টা সেদিন গল্পকথকে খেতে হয়েছিল। এভাবে শুরু হয় মহিতোষের উপকারের পালা । এরপর মহিতোষ বার বার দুঃখ প্রকাশ করে। পা কেটে গেলে গাছ থেকে রস লাগিয়ে দেয়। এ অবস্থায় পাটাই কেটে ফেলার অবস্থা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তা করতে হয় নি। তবে এখনো খুঁড়িয়ে চলতে হয়। এই মহিতোষ কলেজজীবনে গল্পকথকের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে বসে। যার কোনো মাসুল নেই। মহিতোষ উপকার করতে গিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার পথও বন্ধ করে দেয়। অথচ মহিতোষ আশ্বাস দিয়েছিল আজকালের মধ্যে দেখা না করলে চিঠি অবশ্যই পাঠাবে। চিঠি অবশ্য পাঠিয়েছিল। আর তাতে বলা হয়েছিল এ মেয়ের সঙ্গে কোনো দিন যোগাযোগ না রাখার জন্য। এ অবস্থায় গল্পকথকও মহিতোষকে শায়েস্তা করার জন্য জুটিয়ে দেয় এক কবিরাজ। যে কবিরাজ বিপন্ন করে তোলে মহির জীবন। অথচ মহি মনে করে কবিরাজ মশাই তার রোগ ধরতে না পারলে মোটা হওয়ায় সে মারা পড়তো। এ অবস্থায় আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওষুধ খাওয়ার কারণে সে আর বাইরে বের হতে পারে না। বাইরের ওষুধের ওপর আস্থা হারানোর কারণে বাড়িতেই ওষুধ তৈরী করে দেয়। এ শাস্তি যদি মহিতোষ কাটিয়ে ওঠে তারপর তাকে সায়েস্তা করার জন্য গল্পকথক নতুন শাস্তি ভেবে রাখে। এবার তার কেনা সেকেন্ড হ্যান্ড মোটরটা মহিকে দান করবে। যাতে মহির চুল পাকতে আর দেরি না হয়। কেননা এ গাড়ি চুল পাকাবার জন্য মহৌষধ।

এখানে মহিতোষের যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তাতে তাকে একজন সহজ সরল মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মহির পরিপূর্ণভাবে শঠ চরিত্র হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল। কিন্তু সে পরবর্তীকালে নিজেই বোকারমত আচরণ করে। যা তার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ধরনের মধ্যবিত্ত চরিত্র সমাজে রয়েছে। যারা মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করার ওস্তাদ। আবার নিজেও ঠকার ক্ষেত্রে কয়েক গুণ বেশিই এগিয়ে যায়। এ ধরনের চরিত্র করুণা কিছুটা প্রত্যাশা করতেই পারে।

পরোপকারী গল্পের গল্পকথক চরিত্রটি উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যায়ের। মহিতোষের সঙ্গে যার স্কুলে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। এ চরিত্রটি প্রথম দিকে সরলতার পরিচয় দিলেও পরবর্তীকালে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। তবে আমরা মনে করি স্কুলে খাতা ও পেন্সিল দিয়ে ঠকানোর বিষয়টি মেনে নেয়ার মত। কেননা নতুন স্কুলে নার্ভাসনেস পর্যায়ে এ ধরনের বিপদ কাটিয়ে ওঠা

Dhaka University Institutional Repository

কঠিন। মহিতোষের পায়ে রস লাগানো পর্যন্ত মেনে নেয়া যায়। কিন্তু কলেজে উঠেও মহির কাছে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়ায় জীবনে দুঃখের আঁধার নেমে আসে। কলেজে পড়ার ফলে অবশ্যই গল্পকথকের মহির চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় কোনো প্রকারেই উচিত হয় নি বিয়ের ব্যাপারে তার সহায়তা নেয়া। যতই সে তা করতে চাক না কেনো। আর এই সহায়তা নিতে রাজি হওয়ায় ভালো করতে গিয়ে মহিতোষ প্রায় হয়ে যাওয়া বিয়েতে জটিলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তেমন উপকারী বন্ধুকে শায়েস্তা করার বাসনা জাগা অসম্ভব কিছু নয়। মহির জীবনে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করা থেকে গল্পকথকের প্রতিশোধ পরায়ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ তার ঐ অবস্থানকে আরো বেশি সক্রিয় করে তোলে।

বৃষ্টি গল্পে অল্প রেখায় একটি ডাক্তার চরিত্র অংকিত হয়েছে তার নাম মৈত্র। এখানে ডাক্তার মৈত্রের ব্যক্তিজীবনের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। তার দৃষ্টিভঙ্গি ও পেশাগত অবস্থান জানা যায়। মানসিক দিক দিয়ে ডা. মৈত্রকে পরিচ্ছন্নতার অধিকারী বলা যায় না। কেননা লতিকার সঙ্গে প্রতুলের সম্পর্ককে সে এভাবে রাখার আহ্বান জানায়—

> "কিন্তু দেখো তলিয়ে যেও না বাপু ! বড়ো কঠিন সাধনা তোমার। একটু-আধটু সাধনায় ওরা লাগে বটে কিন্তু দরকার হলেই ছেদ করতে হবে। এ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলে নির্মম হতে হবে ! নিচের তলায় গোলমাল হচ্ছে হোক কিন্তু উপরের ঠাকুরঘরে তা না পৌছায় !" (২খ, ৩৬ পৃ)

প্রতুল সম্পর্কে রয়েছে ডা. মৈত্রের উচ্চ ধারণা। প্রতুলের রিসার্সের সে প্রশংসা করেছে। জার্মানিতে যে গ্র্যান্ট পেয়েছে তা প্রত্যাখ্যান না করারও অনুরোধ জানায়। প্রতুলের প্রশ্নের জবাবে মৈত্রের উচ্চারণ—

> "পাগল! তোমায় ডিগ্রির জন্যে আমি যেতে বলছি মনে করছ— মোটেই না! ডিগ্রি দরকার আমাদের মতো সাধারণ লোকের, তোমার নয়— রিসার্চের জন্যেই তোমাকে যেতে বলছি। সেখানে কত ফেসিলিটিজ। কত নতুন টেক্‌নিকের সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচিত হয়ে আসবে। ছি-ছি প্রতুল এমন কাজ কোরো না। নিজেকে এমন করে অপব্যয় করবার তোমার অধিকার নেই।" (২খ,৩৬পৃ)

প্রতুলের প্রশংসা করে ডা. মৈত্র চুপ করে থাকে নি। লতিকাকে টিবি ওয়ার্ডে ট্র্যান্সফারড করেছে প্রতুলের কাছ থেকে লতিকাকে দূরে রাখার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতুল যেদিন ভোর বেলায় লতিকার দিদির বাসায় উপস্থিত হয় সেদিন ডা. মৈত্রকে দেখেছে লতিকাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। ডা. মৈত্র হয়তো প্রতুলের মেধার প্রশংসা করেছে। একই সঙ্গে এও চেয়েছে প্রতুল যেনো জার্মানিতে গিয়ে গ্র্যান্টের সুযোগ নিয়ে গবেষণা করে। তার এই প্রশংসা ও বাসনা নিঃস্বার্থ না জটিলতার জালে মুড়ানো তা বুঝা যায় না। ডা. মৈত্রের চরিত্র নিয়ে কেনো যেনো একটু জটিলতাই জাগে মনে। রহস্যাবৃত এই চরিত্র কিন্তু তার শ্রেণিগত অবস্থান গোপন রাখে নি। শেণিগত অবস্থানের দিক থেকে ডা. মৈত্র উচ্চবিত্তের সংস্কৃতির অনুসারী। তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। শুধু বুঝা যায় না লতিকার সঙ্গে তার আচরণকে। লতিকার কাছ থেকেও কিছু বুঝার উপায় নেই। শুধু ভেসে আসে লতিকার বিধ্বস্ত রূপ। লতিকার এই বিধ্বস্ত রূপ থেকে হয়তো এটুকু বুঝা যায় তার ওপর ডা. মৈত্রের প্রভাব কাজ করছে।

ভিড় গল্পের অনন্তবাবু স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ। অনন্তবাবু গল্পের নায়ক অজয়ের ভগ্নিপতি। সাহেবি পোশাক পরলেও কৃপণতার আশ্রয় নেন। তাই অজয়ের সঙ্গে ট্রেনে থার্ড ক্লাশে উঠেন। তবে চলমান সকল সংকটের মাঝে অনন্তবাবু তার সুবিধা আদায় করে নিতে জানেন। এতে তিনি সামান্যতম লজ্জা পান না। মধুপুর যাওয়ার পথে আসানসোলে যখন ট্রেন থামে তখন বিজয়কে অনন্তবাবু একটা "হিন্দু চা" ডেকে দিয়ে যেতে বলে। কেননা বেশি পয়সা লাগে বলেই অনন্তবাবু এই গোড়ামির আশ্রয় নেন। অনন্তবাবু নিজের সুবিধা আদায় করে ক্ষ্যান্ত হন না।

প্রত্যাগত গল্পে আছে এক যুবকের উচ্চাভিলাস বাস্তবায়নের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তার স্বার্থপরতার চিত্র। অন্যদিকে তার স্বার্থপরতায় বিপর্যস্ত একটি পরিবারের করুণ আলেখ্য পাঠককে বেদনাবিধূর করে। এই বেদনার অতলে তলিয়ে যাওয়ার মাঝে সরসী নামে এক তরুণী স্বার্থত্যাগের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। একদিকে চরম স্বার্থপরতা অন্যদিকে মানবিকতার অনন্য সুকৃতি এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাঠক অনুভব করে পৃথিবীর জটিল উত্তাপ। সরোজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

> "সরোজের তখন হইতেই দৃষ্টি ছিল অনেক উচ্চে নিবদ্ধ। সেই টিউশনিতেই সে সন্তুষ্ট থাকে নাই, আরো ভালো কাজ সে খুঁজিয়া লইয়াছে কিন্তু এই পরিবারটির সহিত যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধটি ইতিমধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সে ভাঙে নাই। না ভাঙিবার কারণও অবশ্য ছিল, একটি নয় অনেক।"(২খ, ২৩ পৃ)

সরোজ শহরে এসেছিল সুদূর পল্লীগ্রাম হতে। জলপানি পেয়ে সে বিলাতে পড়তে যাবে এমন সংবাদ সবাই অবগত। সরোজ নিজেও এমন স্বপ্ন মনে মনে লালন করতো। কিন্তু সরোজের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বপ্ন পূরণের বাসনায় সে সরসীদের বাড়িতে যায়। কেননা সে আগেই জানতো সরসীর মা-বাবা মেয়ের জন্য স্বর্ণালংঙ্কার জমিয়ে রেখেছেন। এগুলো সরসীকে বিয়ের সময় দেয়া হবে। সরোজের সঙ্গে সরসীর বিয়েতে মা-বাবার অমত নেই সেটাও সে জানত।

Dhaka University Institutional Repository

তারপরও সেদিন যে তার স্বপ্ন পূরণ হবে এতটা সে আশাবাদী ছিল না। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে তাই সরসীকে সেদিন সে বলেছিল—

> "সামান্য একটা মাস্টারী, সামান্য একটা চাকরি হয়তো পাব। কিন্তু তা তো আমি চাইনি। সে রকমভাবে বাঁচা না-বাঁচা সমান আমার কাছে। শুধু যদি হাজার খানেক টাকাও পেতাম।" (২খ, ২৪ পৃ)

সেদিন সরসী তার মায়ের গহনার বাক্স সরোজের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—

> "এ তো তোমারই।" (২খ, ২৫ পৃ)

সরসী সেদিন এ কথা বলছে তার সকল লজ্জার জানালা ভেঙে। এই অসাধারণ প্রাপ্তির পর সরোজ বিলেতে গিয়ে যা করেছে তা তার স্বার্থপর মানসিকতারই পরিচয় বহন করে। সরসীদের খোঁজ না নেয়ার সরোজ অপরাধ স্বীকার করে সরসীর বাবা উমেশবাবুকে একটি চিঠি দিয়েছিল। এই চিঠির জবাবে সে পেয়েছিল উমেশবাবুর মৃত্যু সংবাদ। সরসীর বড় রকমের ক্ষতি হলেও অর্থসহায়তা দিতে সে এগিয়ে যায় নি।

এরপর সরোজ আর কোনো চিঠি পায় নি। এ চিঠি তার সংকল্পে যে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল তাও আর বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। সে এরপর সরসীদের ভুলে না গেলেও উদাসীন হয়ে পড়ে। তার এ উদাসীনতা এ পর্যায়ে কাম্য ছিল না। পাঠক আশাবাদী ছিল হয়তো সরোজ এবার সরসীর পরিবারকে সহায়তায় সক্রিয় হবে। কিন্তু সরোজ তা করে নি। এটা তার স্বার্থপরতারই প্রকাশ।

তবে বিলেত থেকে ফেরার পর সে সরসীদের খোঁজ নিয়েছে। সরোসীদের পাওয়া যাবে না এমন ধারণা তখন বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু সংবাদপত্রের একটি মামলার সংবাদে তাদের খবর পাওয়া যায়। সেই সংবাদে অংকিত হয়েছে একটি অসহায় পরিবারের মর্মস্পর্শী বিবরণ। তা ছিল এমন—

> "কলিকাতায় একটি নগণ্য গলির একটি বাড়িতে অনেক দিনের ভাড়া না পাইয়া বাড়িওয়ালা নাকি ভাড়া চাহিতে গিয়া কয়েকটি পাড়ার লোকের কাছে প্রহৃত ও অপমানিত হইয়াছে। বাড়িওয়ালার এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অপর পক্ষ জানাইয়াছে যে কঠিন রোগে মুমূর্ষু একজন অসহায়া বিধবার উপর অন্যায় জুলুম করাতেই তাহারা বাধা দিয়াছিল। মামলার এই বিবরণ নয়, অসহায়া বিধবার পরিচয়ই সরোজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। মামলার বিবরণে তাঁহার পরলোকগত স্বামীর নামটাও দেওয়া ছিল।"(২খ, ২৬ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

এ অবস্থায়ও সরোজ সাহসিকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সে সরসীদের বাড়ির সন্ধান পেয়েও লজ্জায় ফিরে আসে। তারপর আবার একদিন সিদ্ধান্ত নেয় সে আজ আর ফিরে যাবে না। কিন্তু করাঘাত করার মুহূর্তকাল আগে একজন তাকে চমকে দিয়ে বলেছিল—

"বেশ! এতদিনে তাহলে আসবার সময় হল ! "(২খ, ২৬ পৃ)

তারপর সরোজ ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করে। তরপর তাকে যেতে হয় দোতলায়। সেখানে সরোজের মনোভাব ও সরসীদের বাড়ির চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে লেখক একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকেন পাঠকের মনে। সেই পরিবেশের বর্ণনা ছিল এমন—

> "সেখানে আরো অনেকে আসিয়াছে। সরোজ তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, গল্প করিয়াছে, হাসিয়াছেও বই কি। বারান্দা হইতে সামনের একটি টিনের চালের বাড়ি দেখা যায় বুঝি। কান পাতিয়া থাকিলে মুমূর্ষু কোনো বিধবার শ্রান্ত নিশ্বাসও শোনা যায় নাকি ! আর একটি ম্লানমুখী মেয়ের নিঃশব্দ সঞ্চরণ?" (২খ, ২৬ পৃ)

এ বর্ণনায় পাঠকের মন আদ্র হয়ে এলেও সরোজের প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষ করার মতো। সে তখন মেতে উঠে ভিন্ন এক আনন্দের জগতে । সে পরিবেশের চিত্র ছিল এমন—

> "কিন্তু সময় কোথায় ! সন্ধ্যার আবছা আলোয় লীলাকে দেখাইতেছে অপরূপ। দূর আকাশের মেঘ যেন তাহারই টকটকে লাল শাড়ির বর্ণ চুড়ি করিয়াছে, আকাশের প্রথম ফোটা তারকায় তাহারই মুখের দ্যুতি। দ্যুতিমান তারকার মতই ঝকমক করিতেছে। কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নাই। এমন মেয়ের সঙ্গে পাশে বসিয়া সমস্ত অপরূপ শাণিত যে স্বাদ পাওয়া যায় তাহার সত্যই যে তুলনা নাই। এতদিন যখন গিয়াছে তখন আর একটা দিনে এমন কী আসিয়া যাইবে। ওবাড়ির খোঁজ কাল পাইলেও চলিবে। আর হয়তো সত্যই তাহার ভুল হইয়াছে। পৃথিবীতে নামের মিল অমন কত হয় !"(২খ, ২৬ পৃ)

এ ধারণার মধ্য দিয়ে সরোজের যে মানসিকতা প্রকাশ পায় তা হল সে ঐ পরিবারের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। আর সে ভয় আরো বেশি করে জেগে উঠে যখন লীলার অপরূপ সৌন্দর্যে সে মোহিত হয়। লীলার সৌন্দর্যে মোহিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ জীবন ও সাধারণ এক রমণীকে গ্রহণ করার অনিহাই প্রকাশিত হয়। কেননা সরোজদের মানসিকতাই এমন বড় হওয়ার জন্য সিঁড়ি হিসেবে সাধারণ মানুষের দান গ্রহণ করা যায় কিন্তু সেই মানুষকে বরণ করা যায় না। এ মানসিকতাই সরোজকে চিহ্নিত করেছে স্বার্থপর হিসেবে। সে যদিও বারবার সরসীদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেখানে সদিচ্ছার চূড়ান্ত অভাব ছিল। আর এই অভাববোধ পাঠক মনে পীড়নের কারণ। আর তা এসেছিল বিত্তহীন

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের এক মেধাবী শিক্ষার্থীর সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণের কারণে। সামাজিক অবস্থান বিচারে বলা যায় সরোজ শ্রেণি উত্তীর্ণ ম'নুষ। সে সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসের দুটি স্তর টপকিয়ে আজ উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে।

পঞ্চশরের প্রথম গল্পের চিত্রার মা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তার অবস্থান। স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। টানাপড়েনের সংসার। এই অবস্থায় অর্থনৈতিকসংকট মোকাবেলা করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। নীতি ও আত্মসম্মান তাকে স্পর্শ করে না। তিনি হয়তো জানেন, লজ্জা করা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় ঠিক নয়। একারণে তিনি মেয়ের পানি প্রত্যাশী অনন্তের কাছে আর্থিক সহায়তা নিতে দ্বিধা করেন না। পড়ে থাকা জমিতে অনন্ত ঘরে তুলে দিতে চাইলে চিত্রার মা আপত্তি করেন না। কৌশলী জবাব দেন এভাবে—

> "তা তো হয়ই বাবা, কিন্তু উপায় কি ? আমরা তো আর বেশি ভাড়া দিতে পারব না, ঘর তৈরী করতে বলি কোন মুখে ?"(২খ, ২৮৩ পৃ)

তাদের অবসর সময়ের ও অংশিদার হয় অনন্ত। অনন্তের মা এলে তাস খেলাও চলে।

মাসিমার সঙ্গে গল্প করে অনন্তের যেমন ভালো লাগে তেমনি মাসিমাও অনন্তের এমন আচরণে খুশি হতেন। অনন্ত মাসিমার মনোভাব এভাবে তুলে ধরেছে—

> "মাসিমাও বিশেষ খুশি হতেন দেখতাম এবং প্রায়ই আমাকে শুনিয়ে দিতেন যে বড়োলোকের ছেলে হয়েও এমন অমায়িক ও নিরহংকার তিনি কখনো দেখেন নি। "(২খ, ২৮৩ পৃ)

এমনকি অনন্ত যেনো কোনো কিছুতে কষ্ট না পায় বা অসন্তুষ্ট না হয় সেজন্য মাসিমাকে সচেতন থাকতে দেখা যায়। অনন্ত অসন্তুষ্ট হতে পারে দেখে মাসিমা আত্মীয় জিতেনকে তাদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেন। আত্মীয়কে বাড়িতে আসতে নিষেধ করার মধ্য দিয়ে মাসিমা তার চরিত্রকে হেয় করে তোলেন। এতে তার কোনো মনোবিকার লক্ষ করা যায় নি। অর্থাৎ যখন যা বলা বা করার প্রয়োজন স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি তা করতে ইতস্তত বোধ করেন না। অনন্তকে খুশি রাখতে জিতেনকে তিনি বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছিলেন।

চিত্রার নিক্ষিপ্ত পেপার ওয়েট যখন অনন্তের চোখে আঘাত করে তখন প্রতিবেশীদের কাছে তিনি মুখ দেখাতে পারেন নি। এ ঘটনার পর সেখান থেকে তারা বাস উঠিয়ে চলে যায়। তারপর চিত্রার বাবা মারা যাওয়ার পর জিতেনের বাড়িতে আশ্রয় নিতে মাসিমার বাধে নি। তিনি তখন তার পূর্ব আচরণের কথা মনে করারও প্রয়োজন মনে করেন নি। এবারও তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্যতার প্রমাণ দেখান।

Dhaka University Institutional Repository

তবে তার আত্ম-সম্মান বোধ একেবারে নেই তা নয়। আত্ম-সম্মান বোধ আছে বলেই মেয়ের ঐ আচরণের পর তিনি প্রতিবেশীদের মুখ দেখাতে পারেন নি। যেকারণে তিনি অনন্তদের ঐখানকার বাস তুলে অন্যত্র চলে যান।

তবে মাসিমা কোমল মনেরও অধিকারী। একারণে অনন্তের মা চিত্রাকে বিয়েতে রাজি করার জন্য চিঠি লিখলে মাসিমা তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মাসিমা তার এ ব্যর্থতার জন্য অনন্তের মার কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দেন।

অনন্ত জিতেনের বাড়িতে সুদূর আসামে গেলে মাসিমা শেষ বারের মতো মেয়ের মন পরিবর্তন করার চেষ্টা চালান। মেয়ের জন্য তিনি চিন্তিতও। এ সময় মাসিমা অনন্তের কাছে তার চিন্তার কথা জানান এভাবে—

> "এই বিদেশে কী সুখে আছি বাবা ! তিনি তো পুণ্যাত্মা লোক সকল দায় এড়িয়ে স্বর্গে চলে গেলেন— আর আমি হতভাগী পড়ে রইলাম ! একটি পয়সা নেই, গলায় এত বড় একটা মেয়ে ঝুলছে, কী যে করব !" (২খ, ২৯০ পৃ)

মেয়ের ভবিষৎ নিয়ে তার এই ভাবনা চিরন্তন মায়েরই ভাবনা। স্বার্থ সচেতন হলেও মায়ের ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রম নন। সব আদরণী মায়ের মতো তিনিও মেয়ের মঙ্গল কামনা করেছেন সবসময়। এক্ষেত্রে তিনি অধিক সচেতন বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই দেখা যায় চিত্রার মানসিকতা পরিবর্তন হচ্ছে না দেখে তিনি শেষ পর্যায়ে হাল ছেড়ে দেন। অনন্ত সম্পর্কে কঠিন হয়ে উঠেন। অনন্তের ছোট-খাটো দরকার শেষে মাসিমাই তদারক করেছেন। চিত্রাকে পাঠাবার প্রয়োজন সম্পর্কে তার মত বদলে গেছে। তার এই পরিবর্তিত মানসিকতার মধ্য দিয়ে তিনি তার সহজাত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

তবে অর্থের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন থেকেও তিনি তা অর্জনে কোনো উদ্যোগ নেন নি। এমনকি স্বামীর সঙ্গেও এ বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করতে দেখা যায় না। স্বামীকে অর্থ উপার্জনে তাগিদ দিয়েছেন এমন নজির দেখা যায় নি। স্বামীর আমুদে মনকে সমর্থন দিয়েছেন বলে অনুমান করলে ভুল হবে না। আর এই মনোভাব মাসিমা চরিত্রের আরেকটি বড় দুর্বলতা। অর্থ উপার্জনে নিজস্ব উদ্যোগ বা তাগিদ না থাকায় অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারে দুর্ভোগ নেমে আসে। যেমনটি নেমে এসেছে চিত্রাদের বেলায়।

চুরি গল্পের উলেখযোগ্য নারী চরিত্র হেমলতা। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী। স্বামী স্কুলমাস্টার। যে স্কুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে ক্রমশ অধপতিত হচ্ছে। পর্যায়টি এমনই যে স্কুল উঠে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে সেক্রেটারি শিক্ষকদের বেতন কমিয়ে দেন। শিক্ষকতার আয়ে কোনো রকমে সংসার চালাবার জন্য হেমলতার স্বামী প্যারিমোহনবাবুকে টিউশনিও করতে হয়। পণ্যমূল্য দ্বিগুণ তিনগুণ হওয়ার দিনে তাই স্বাচ্ছন্দ্য নেই হেমলতার সংসারে।

Dhaka University Institutional Repository

নেই বাড়তি কাজও। যে অর্থনৈতিক অবস্থায় হেমলতার মানসপ্রবণতা আলোড়িত হয় তা নিচের অংশটুকুই উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে—

> "কিন্তু রবিবার বলে উনুনে এখনও আঁচ পড়েনি। কয়লার যা দাম, তাতে বুঝেসুঝে উনুন ধরাতে হয়। দু বেলা উনুন ধরাবার দরকারই থাকে না অনেকদিন, রাঁধবার জিনিসের অভাবে। অভাব যে দিন থাকে না, সেদিনও প্যারিমোহনবাবুর স্ত্রী হেমলতা এক বেলার বেশি আগুন জ্বালেন না। দু বেলা রান্না করার বিলাসিতা করবার মতো অবস্থা তাঁদের অনেক দিন ঘুচে গেছে।" (২খ, ১৮৪ পৃ)

এখানে দেখা যায় হেমলতা স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংসার চালানোর কৌশল রপ্ত করেছেন বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে। যেদিন সামর্থ্য থাকে সেদিনও তিনি বাড়তি ব্যয় করেন না। এক্ষেত্রে হেমলতা অসাধারণ আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

হেমলতাকে স্বামীর প্রতিও দায়িত্বশীল হতে দেখা যায়। প্রথম দিকে নীতি-নৈতিকতা ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে কোনো সঙ্কট সৃষ্টি হলে তা শুধু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন নি। প্রতিকার চেয়ে স্বামীকে তা অবহিতও করেছেন।

নীতি-নৈতিকতা ও মেয়ের ভবিষৎ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে প্রতিবেশী শঠ পুলিনবাবুর আসা-যাওয়াকে ঘিরে। মেয়ে উমা বড় হয়েছে এ অবস্থায় ধনাঢ্য ব্যক্তি পুলিনবাবুর আসা যাওয়া হেমলতা সমর্থন করেন নি। প্যারীমোহনবাবু স্ত্রীকে যখন বলেন—

> "তা মাসিমা বললে দোষটা কী?" (২খ, ১৮৫ পৃ)

এ প্রশ্নের জবাবে হেমলতা বলেন—

> "দোষটা কী বুঝতে পার না। উমা যে বড়ো হয়েছে সে-খেয়াল আছে? লোকটির স্বভাবচরিত্র জানতে পাড়ায় তো কারুর বাকী নেই। স্ত্রীকে মেরেধরেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে, না মনের দুঃখে সে নিজেই বিদেয় হয়ে গিয়েছে কেউ জানে না। আমাদের ওপর অত দরদ ওর কিসের?"(২খ, ১৮৫ পৃ)

হেমলতা স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে অনেক বেশি সচেতন তা বুঝা যায়, হেমাকে গান শেখানোর পুলিনবাবুর প্রস্তাব অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে। তিনি গান শেখানোর প্রস্তাব শুধু অস্বীকার করেন নি পুলিনবাবুকে এও শুনিয়ে দেন—

> "আমাদের মতো গরিবের ঘরের মেয়েরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে চুল বাঁধবারই সময় পায় না, গান শিখে তাদের কী হবে?" (২খ, ১৮৫ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

এসব আলোচনায় হেমলতার মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও মান-সম্মান তিনি যেমন খোয়াতে চান না তেমনি সন্তানের মঙ্গল কামনায় তিনি অত্যন্ত সচেতন। এমন কি ভালো-মন্দ চরিত্র নিরূপণে তার কষ্ট হয় না। যেমন তার আয়নায় চরিত্রহীন হিসেবে ধরা পড়ে পুলিনবাবু। পুলিনের আসা-যাওয়ায় তাই তিনি স্বামীর কাছে আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু তার এই ন্যায়-নীতি জ্ঞান শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে নি। দেখা যায় হঠাৎ করেই যেনো সেই বিশ্বাসের পাথরে শুধু চিরই ধরে নি সেখানে মহাগহ্বর তৈরি হয়েছে। তাই শেষের দিকে মাস্টারবাড়িতে পুলিনের আসা যাওয়ায় বাধা থাকে না। এমন কি উমার জন্মদিনে পুলিন লালশাড়িও উপহার দেয়। পুলিনবাবুর দেয়া লালশাড়ি পরিহিত উমাকে দেখে প্যারিমোহনবাবু ভীষণভাবে আহত হন। কিন্তু হেমলতার কোনো বিরূপ মনোভাব লক্ষ করা যায় না। বরং এতে তিনি খুশিই হয়েছেন। এমনকি ছোট ছেলে নেপু চুরি করলেও তিনি আহত হন নি। বরং দেখা যায় এসব কিছু দেখে স্বামী যেনো চড়াও না হন সেজন্য সচেতনভাবে তাদের রক্ষায় প্রয়াস চালান। বড় ছেলে দেবু ছোট ভাই নেপুর চুরিবিদ্যা শেখার কথা জানাতে থাকলে হেমলতা স্বামীকে দেখিয়ে তা সে সময় বলতে নিষেধ করেন। এ থেকে বুঝা যায় হেমলতার নৈতিকতার আবরণ শুধু খসেই পড়ে নি, ক্লেদাক্ত করেছে তার অন্ত রকেও। হেমলতার এই পরিবর্তন স্বামী প্যারিমোহনবাবুর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি হেমলতার মানসিকতায় এমন পবির্তন ঘটতে পারে। এমন পরিবর্তন প্যারিমোহনবাবু যে আসা করে নি তা তার এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়—

> "পুলিনবাবু যে তবু আসে প্যারীবাবু তা সব-সময়ে চোখে না দেখলেও জানেন। কিন্তু উমাকে জন্মদিনের নামে তার শাড়ি দেওয়া পর্যন্ত যে হেমলতার প্রশ্রয় পেতে পারে এতটা তিনি ভাবতে পারেন নি।"(২খ, ১৮৫ পৃ)

সত্যিই হেমলতার মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এই পবিরবর্তন একেবারে অস্বাভাবিকও নয়। প্রতিনিয়ত অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে বাস করায় মানুষের মনে পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ অবস্থায় সুখ ও অর্থের হাতছানিতে মানুষ প্রলুব্ধ হতে পারে। এমন সুযোগ আসলে মানুষ হেমলতার অবস্থানে থেকে তা গ্রহণ করতে পারে। কেননা লোভ-লালসা মানুষের সহজাত ধর্ম। একে সবাই এড়াতে পারে না। যেমন এড়াতে পারেন নি হেমলতা। সমাজে এমন পরিবর্তন অহরহই ঘটছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, হেমলতা রক্তে মাংসে গড়া আমাদের সমাজেরই একজন নারী। যিনি তার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতাকে ছুঁয়ে গেছেন। প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন রক্তে-মাংসে গড়া মানুষের মতো। হেমলতার আদর্শের মোড়ক খসে পড়াকে চারিত্রিক ত্রুটি হিসেবে ধরা যেতে পারে। তবে হেমলতার এই জীবনমুখি আচরণ শিল্প-সাহিত্যে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি গল্পের একটি উজ্জ্বল চরিত্র অমলের স্ত্রী কানন। সে পঁচিশ টাকা মাইনের টিকিট মাস্টারের গৃহিণী। তদুপরি স্বামী উদাসীন প্রকৃতির। এক পর্যায়ে স্বামীর স্বল্প বেতনের চাকরিটি চলে গেলে কাননকে চরম অর্থসংকটে পড়তে হয়। চরম অর্থসংকটে পড়ার আগেও কাননের চরিত্রে কিছু দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। সে মেজবৌর সংসার থেকে গোপনে এটা ওটা সরিয়ে নেয়। কিন্তু প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে সে চরম আপত্তি করে। শুধু তাই নয় প্রায় প্রতিদিন খোয়া যায় মেজবৌর জিনিস। আর তা যায় কাননের সংসারে। এমন পরিস্থিতিতেও কানন স্বামীর প্রতি কোনো অনুযোগ তোলে নি। স্বামীর প্রতি এমন মনোভাব তাকে সরল প্রকৃতির নারী হিসেবে চিহ্নিত করে। তবে তার মধ্যে কপট ইগো বিদ্যমান। অনটনের মধ্যে কপট আভিজাত্য বজায় রাখার এক দুঃসহ প্রয়াস কাননের রয়েছে। এটি কানন চরিত্রের একটি দুর্বলতম দিক। মেজবৌ কাননের ছেলেকে আম দিতে গেলে কানন বলেছিল—

> "দিচ্ছ তো ভাই, আমার ছেলের মুখে ও আবার রুচলে হয়, দিশী আম খাওয়া অভ্যেস নেই কিনা।" (১খ, ২৪০ পৃ)

খোকা অসুস্থ হয়ে পড়লে পিসিমার মতো সেও মেজবৌকে দায়ী করে। খোকাকে কোনো কিছু যেনো মেজবৌ না দিতে পারে তা বললে কানন মেজবৌকে কটূ কথায় আঘাত করে। এ সম্পর্কে তার মন্তব্য—

> "আমি কি করব বলুন? ওসব গলাগলি ঢলাঢলিতে আমি নেই। মানুষের নিজের যদি লজ্জা সরম না থাকে তো মা কে কি করতে পারে।"(১খ, ২৪২ পৃ)

তবে কাননের এ বক্তব্য পুরোপুরি সত্য নয়। কেননা কানন নিজে চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মেজবৌর সঙ্গে আনন্দে অংশ নেয়। পিসিমার সঙ্গে ঠাট্টায় সেও অংশিদার ছিল।

স্বামী অভাব-অনটনে রাখলেও সে কোনোদিন ছোট হতে চায় নি। অমল মেজবৌর স্বামী বিধুভূষণের চেয়েও যে বেশি শিক্ষিত এমন বানানো গল্পও সে করেছে। এমনকি সে এও বলেছে যে অমল বি.এ পাস। সে নাকি জলপানিও পেয়েছিল।

কাননের হাতটানের অভ্যাস থাকলেও তার মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য খুঁজে পাওয়া যায়। সে নীরব নিস্তরঙ্গ নির্জীব নয়, সক্রিয় নারী। প্রয়োজনে নেতিবাচক বিষয় আয়ত্ত করতে তার বাধে না। এজন্যে তার মনের মধ্যে কোনো অপরাধবোধ কাজ করছে বলে মনে হয় নি। সে অপরাধ করছে তাও মনে করে না। এজন্যে তার মনের মধ্যে কোনো পীড়নও নেই। এটি তার সরলতার প্রমাণ বহন করে। এমন নারী চরিত্র সমাজে এখনো অহরহ খুঁজে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ভিড় গল্পের নায়ক অজয়ের স্ত্রী করুণা মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহিণী। মানসিক নয় ভিন্নরকমের সমস্যা তাকে মোকাবেলা করতে হয়। নব বিবাহিতা মেয়ের জন্য যা বেশ কষ্টকর। উপরন্তু স্বভাব যদি একটু নরম হয় তাহলে কষ্টের মাত্রা বেশি হয়। করুণা এ স্বভাবেরই মেয়ে। তার স্বভাব সম্পর্কে অজয় বলেছে—

> "মেয়েদের গাড়ির অবস্থা এর চেয়ে নিশ্চয় ভালো নয়। দিদি সঙ্গে আছেন এই যা ভরসা, কিন্তু এই ভিড়ের ভেতর দিদিই বা কী করতে পারেন। একটু জল দরকার হলে তারা পাবে কি না সন্দেহ। তার ওপর করুণা যে রকম ভয়-কাতুরে লাজুক। এত ভিড়ে কি তার অবস্থা হয়েছে কে জানে ! মুখ ফুটে সে তো কাউকে কিছু বলতেও পারবে না। "(২খ, ১২৪ পৃ)

ট্রেনে ভিড়ের কারণে অজয় ও করুণা এক সঙ্গে যেতে পারে না। করুণাকে দিদির সঙ্গে মেয়েদের কামরায় তুলে দিতে হয়। এটি ছিল করুণার সঙ্গে অজয়ের দ্বিতীয়বার দেখা। শুধু ট্রেনে নয় বিয়ের পর তারা একে অপরকে কাছে পাওয়ার তেমন সুযোগ পায় না। বিয়ের পর এর সুযোগ ছিল। তা নষ্ট হয় অজয়ের বাড়ির অবস্থার কারণে। লোকসংখ্যার তুলনায় ঘরের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে অজয় মন খুলে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। এ সম্পর্কে অজয় বলেছে—

> "এ পর্যন্ত আলাপ করবারই কতটুকু সুযোগ তারা পেয়েছে। বাড়িতে ঘর বেশি নেই, বিয়ের সময় আবার আত্মীয়স্বজনে ঠাসাঠাসি। টিনের পার্টিশন দেওয়া একটা ছোট কুঠুরি তাদের ফুলশয্যার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। কুঠুরিটা এত ছোট যে বিয়ের খাটেই সেটা জুড়ে গিয়েছিল বেশির— ভাগ। তার ওপর ফুলশয্যার তত্ত্বের জিনিসপত্র ট্রাঙ্ক সুটকেসগুলো রেখে তাদের নিজের নড়াচড়ার জায়গাই ছিল না।"(২খ,১২৭পৃ)

ঘরের বাইরের অবস্থাও ভালো ছিল না। জায়গার অভাবে সে ঘরের বারান্দায় অনেককে জায়গা করে দিতে হয়। অন্যত্র তার সুনিপুণ বিবরণ পাওয়া যায়—

> "জায়গার অভাবে ঘরের বাইরে বারান্দাতেই অনেককে শুঁতে হয়েছে। সারারাত তাদের নড়াচড়া কথাবার্তার আওয়াজ। পাশের ঘরটি দূর সম্পর্কের এক পিসি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে দখল করেছিলেন। তাদের একটি আবার রুগ্‌ণ। সারারাত থেকে-থেকে তার কেঁদে উঠা— পিসিমার সান্ত্বনার চেষ্টা। টিনের পার্টিশনে, ঘুমের ভেতর ছটফট করতে করতে কোনো ছেলের পায়ের লাথি— এরই ভেতর পরস্পরের পরিচয় নেবার তাদের সলজ্জ চেষ্টা।"(২খ,১২৭পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

তবে এসব অবস্থার মধ্যে করুণার তেমন কোনো সমস্যা হয় না। তবে তার লজ্জাবোধ প্রখর। এটা অজয়ের কাছ থেকে যেমন জানা যায়। ট্রেনে অজয়, দিদি ও করুণার আলাপের মধ্যেও তা ভালোভাবে টের পাওয়া যায়। করুণা সৌন্দর্য প্রিয়ও বটে। মধুপুরের সৌন্দর্য সে স্বামীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

একটি বিষয়ে অজয় ও করুণার মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। আর তা হল পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের উদগ্র বাসনা। এটি অজয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। সেকারণে অতিরিক্ত ভিড়ে সে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। অজয়ের ক্ষেত্রে এটা বেশি করে মানসিক সংকট তৈরী করে এজন্য যে সে বরাবরই ভিড়ের মধ্যে মানুষ হয়েছে। তাই সে উৎপাতহীন জীবন চায়। একাকী সান্নিধ্যের আশা করুণার মধ্যে নেই তা বলা যাবে না। একদিকে সে নারী অন্যদিকে তার লজ্জার মাত্রা বেশি হওয়ায় তা তেমনভাবে প্রকাশিত হয় নি। বিদ্যমান পরিস্থিতিকে করুণা স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে। বলা যায় একটু উত্তেজনাও অনুভব করেছে। তাই অজয়ের প্রশ্নের জবাবে তাকে বলতে শুনা যায়—

> "কষ্ট হবে কেন ? করুণা মৃদু অথচ উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয় 'কি রকম দেখেছ! "(২খ,১২৯পৃ)

গল্পের পরিসরে করুণা সম্পর্কে যা জানা যায়, তাতে তাকে সহজ-সরল জীবনমুখি নারী হিসেবে পাওয়া যায়। কারণ তাদের জীবনের যে সমস্যা এতে করুণার কোনো মানসিক পীড়ন নেই। সমাজে এমন কিছু মানুষ পাওয়া যায়, যারা সংসারে ছোট-খাটো সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। তবে অজয়ের কারণে কিছুটা দুর্ভোগ তাকে পোহাতে হবে বলেই মনে করা যেতে পারে। কারণ অজয় সিরিয়াসভাবে জীবনমুখি ও সাহসী নয়। প্রবল আত্মদ্বন্দ্ব তার মধ্যে কাজ করে। নিজের সম্পর্কে অজয়ের শেষ মন্তব্য—

> "তবু কোনোদিন তার মুক্তি নেই সে জানে। মুক্তি নেবার সংগতি বা সাহস কিছুই তার নেই।"(২খ,১২৯পৃ)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে মানসসংকট থাকলেও আর্থিক বিবেচনায় তাদের মানসলোক খুব বেশি উদ্ভাসিত হয় নি। স্বল্প সংখ্যক চরিত্রে এরূপ মানসচেতনা পরিস্ফুট হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন *ভিজেবারুদ* গল্পের মাসিমা। তার চরিত্রের মধ্যে সুবিধাবাদী মনোভাব সুতীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহিণী তিনি। স্বামীর মানসিকতার সঙ্গে রয়েছে তার অপরূপ মিল। তাদের মানসিকতার তেমন কোনো বিরোধ ও পার্থক্য নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সততার প্রতি তার কোনো অঙ্গীকার নেই। নেই সুস্থ জীবনবোধ। যেমন নেই তার স্বামীর। তারা দুজনে একই গোত্রের। শশধরবাবুর কলকাতার বাড়ি যেমন একটা ধাপ্পাবাজি তেমনি মাসিমার গয়নাও গিল্টি। অথচ এ দুটো বিষয় দেখিয়ে ছন্নছাড়া যুবক অঘোরের সামান্য চাকরির টাকা হাতিয়ে নিতে তার বাধে না। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের যে জড়তা থাকে তা তার মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণি খুব সহজে কারো কাছে হাত পাততে পারে না। এমনকি ধার চাইতেও তাদের মধ্যে জড়তা থাকে। ধার চাইলে কি মনে করবে এমন প্রশ্ন তাদের মনে জাগে। ভয় থাকে এও যে, তার অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষ টের পেয়ে যাবে। তাই কষ্ট করেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি তা লুকিয়ে রাখতে চায়। সেক্ষেত্রে ধাপ্পাবাজি করাটা তাদের কাছে অসম্ভব একটি বিষয়। এক্ষেত্রে মাসিমা এ জড়তা অতিক্রম করেছেন। অবশ্য তার ক্ষেত্রে এমন জড়তা কখনো লক্ষ করা যায় নি। বরাবরই তিনি মধ্যবিত্তের মানসিকতাকে পরিহার করেছেন।

অঘোরের টাকা নিতে তার শুধু আপত্তি নেই এমনটি নয়। অঘোরকে দিয়ে গিল্টি গয়না বিক্রির প্রয়াস চালাতে তার বাধে না।

গিল্টি গয়না বিক্রি করতে না পারা অসহায় অঘোরের কাছে তার আক্ষেপ ছিল এমন—

> "এ পোড়া দেশে কি ভালো একটা স্যাকরা নেই, সোনাও চেনে না। তুমি বোধহয় চেষ্টাও করনি !"(১খ, ২৬৯ পৃ)

এক্ষেত্রে দেখা যায় শশধরবাবুর মতো মাসিমাও মানুষকে ঘায়েল করার মতো সহজাত পটুত্ব দেখিয়েছেন। এটি মাসিমাচরিত্রের অন্যতম জটিলতা। মাসিমার কাছে অঘোর ঘায়েল হয়ে যায়। সে তা বিক্রি করার চেষ্টা করেছে কিনা তাও বলার সাহস পায় না। কুণ্ঠিতভাবে সে মাসিমার হাতে তার বেতনের কিছু টাকা তুলে দেয়।

মাসিমা যে লজ্জা ও শোভনতার ধার ধারেন না তা অঘোরের টাকা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়। টাকা গ্রহণ করে তিনি মিথ্যে ছল করে অঘোরকে এও বলেন—

> "কিন্তু তোমার কাছে ধার তো দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। তোমারও তো কিছু জমিদারি নেই। ওই সামান্য চাকরিতে আর কত পারবে।"(১খ, ২৬৯ পৃ)

তবে মাসিমা চরিত্রের একটি ভালো দিক লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে কখনো কখনো অঘোরকে অবজ্ঞা করতে না চাওয়া। তবে অঘোরকে যে তিনি সত্যিকার স্নেহ করেন তা বলা কঠিন। বলা যায়,অঘোরের অর্থ গ্রহণ সাপেক্ষে তার এ আচরণ। তবে কষ্ট করে হলেও কখনো কখনো তিনি অঘোরের প্রতি মমতা দেখান। শশধরবাবু অঘোরের শিক্ষা নিয়ে কটাক্ষ করলে তিনি অঘোরের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে মাসিমা স্বামীর কথায় অনুযোগ তুলে বলেন—

Dhaka University Institutional Repository

> "তোমার একটু মায়াদয়া নেই বাপু, কাজকর্ম ফেলে কষ্ট করে তোমায় কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে, তার বদলে ওর উচ্চারণ নিয়ে ঠাট্টা। অমন করলে ও আর এবাড়ি আসবে না।"(১খ, ২৭০ পৃ)

অঘোরের প্রতি মাসিমার এই মনোভাব স্বার্থহীন নয়। তিনি সংসারের অবস্থা জানেন। একারণে তিনি অঘোরকে বিমুখ করতে চান না। তার এ আচরণ স্বার্থ রক্ষারই কৌশল।

একমাত্র মেয়ে লতিকার ভবিষ্যৎ ভাবনায় তিনি কুশলী সিদ্ধান্ত নিতে চান। শশধরবাবু শহরের নবাগত অথচ খ্যাতি অর্জনকারীও প্রাণবন্ত ব্যাংককর্মকর্তা দিবাকরের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে চাইলে মাসিমাও তাতে দ্বিমত পোষণ করেন নি।

দিবাকরের ঐশ্বর্যে মাসিমা মোহিত হন। শুধু তাই নয়, দিবাকর যখন অঘোরকে কাছে ডেকে নিয়ে বসায় তখন শশধরবাবুর মতো মাসিমাও আপত্তি করেন।

অর্থাৎ এ কথা বলা যায় যে, শশধরবাবু ছন্নছাড়া যুবক অঘোরকে যে অবস্থানে রাখতে চান, মাসিমাও তাকে সে অবস্থানে দেখে থাকেন।

সার্বিক মানসিকতা বিশ্লেষণে বলা যায় মাসিমা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশেষ চরিত্র। যারা নিজ স্বার্থ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তিনি সেই শ্রেণির মানুষ যারা যে কোনোভাবে তাদের স্বার্থ আদায়ে অভ্যস্ত। মাসিমার মধ্যে শ্রেণি উত্তীর্ণ মানসিকতা ও তজ্জনিত হাস্যাত্মক প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মাসিমা উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেও তা সার্থক হয় না। ক্রুর চরিত্রে তিনি মধ্যবিত্তের বৃত্তেই অবস্থান করতে বাধ্য হন। মাসিমা স্বগোত্রচ্যুত বিশেষ শ্রেণির নারী চরিত্র।

স্নেহ-বাৎসল্য ও প্রেম-ভালবাসা : পুরুষ ও নারী

প্রেমেন্দ্র মিত্র কোমল কিছু নর-নারীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। বাৎসল্য ভালবাসা সহানুভূতি অন্তরে লালন করা এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মানুষের সুখে দুঃখে তারা নিজেদের মনের অজান্তে জড়িয়ে ফেলেন। মানুষের প্রতি অসীম দরদবোধ ও সহানুভূতি পাঠক হৃদয় জাগায় অমীয় ফল্গুধারা। তাদের স্পর্শে এসে পাঠক ভাবতে বাধ্য হয় এই তো সত্যিকার জীবন। তখন মানুষ মানুষের জন্য এ কথাই যেনো খুব বেশি করে ভাবতে ইচ্ছে করে। এ ধারার নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণির বেশ কিছু আলোকিত চরিত্র রয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে।

অরণ্যপথ গল্পের সাধারণ একটি চরিত্র বিমল। সে মানবিক অনুভূতির আধার এবং ছোট বেলা থেকেই ছন্নছাড়া। কৌতূহল তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গল্পকথকের সঙ্গে বিমলের প্রায়াগে কুম্ভ মেলায় পরিচয় হয়। সে পরিচয় ঘটে নৌপথে ভ্রমণের মাত্র কয় মাস আগে।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পকথক মেলার ভিড়ের স্রোতের সঙ্গেই বের হওয়ার চেষ্টা করছেন। সেখানেই যুবক বিমলকে দেখতে পান। বিমল একটি ছোট ছাগ শিশুকে দুহাতে তুলে ধরে লেখকের পিছনে পিছনে আসছে। পুণ্যার্থীদের পদনিষ্পেষণে ছাগ শিশুটির স্বর্গলাভের পথ তৈরী হয়ে গেছে। ছাগ শিশুটির অবস্থা ছিল এমন—

> "সে এক বিভৎস দৃশ্য। পায়ের চাপে তাহার মাথায় আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সামনের দুইটি পা একেবারে ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। একটা দিকের চোখ আর নাই। খুলির খানিকটা অংশের সহিত উপড়াইয়া গিয়াছে। যায় নাই শুধু প্রাণটুকু। যন্ত্রণায় তাই সে আর্তস্বরে চিৎকার করিতেছিল" (২খ, ৪২ পৃ)

এই ছাগ শিশুর রক্ত পুর্ণার্থীদের শরীরে পড়ায় তারা মহাখ্যাপা। তারা এর প্রতিবাদ জানায়। হাত পা-নাড়ানোর সাধ্য না থাকায় বিমল উপযুক্ত শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। এ অবস্থায় গল্পকথক ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করেন—

> "এটিকে কোথায় পেলে হে?"(২খ, ৪২ পৃ)

তার উত্তরে বিমল জানায়—

> "এটি পুণ্যফল! কুড়িয়ে পেয়েছি!"(২খ, ৪২ পৃ)

এরপর বিমল অনুরোধের সুরে গল্পকথককে জানায় আপনার বাসায় ছাগ শিশুটিকে একটু জল দিয়ে দেখি। পান্থশালায় এসে অনেক করেও বিমল শিশুটিকে বাঁচাতে পারে না। বিমল ছাগ শিশুটিকে বাঁচাতে গিয়ে পুণ্যস্নানের লোভকে বিসর্জন দেয় নির্দ্বিধায়। এরপর সে গল্পলেখকের সঙ্গে থেকে যায়। বিমলের মাতৃকূলে কেউ না থাকলেও সে আরামপ্রিয় ও ভোজনবিলাসী। সে পান্থশালার আহার ও শয়নের সমালোচনা করতেও দ্বিধা করে না। এমন মানসিকতা অবশ্য সমাজে বিরল নয়। অসময়ে কারো আশ্রয়ে থেকে পরে তার অবস্থানকে সমালোচনা করতে অনেককেই দেখা যায়। তাই বিমলের এই আচরণেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তা সমাজের মানসিকতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিমলকে সঙ্গে নিয়ে গল্পকথক কলকাতায় আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানে বিমল খঞ্জ, আতুর পশুপাখি ও মানুষের পিঁজরাপোল বানাবার চেষ্টা করে। এতে বিমলের সঙ্গে আশ্রয়দাতার বচসা হওয়ায় সে আশ্রয় তাদের ছাড়তে হয়। এখানে পশুপাখির প্রতি বিমলের ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যের সঙ্গে দ্রুত ভাব জমিয়ে তোলা বিমলের আরেকটি বড় গুণ। সে খালাসীদের সঙ্গেও ভাব জমিয়ে কলা, পেঁপে ও তরমুজ সংগ্রহ করতে আড়ষ্ট হয় না। অন্যকে চালিত করার শক্তি তার আছে। জলপথে ভ্রমণে গল্পকথককে সেই উৎসাহিত করে। মালবাবুর ডেকেও চায়ের জন্য গল্পকথককে সে নিয়ে যায়। আবার মালবাবুর সঙ্গে রাগ করতেও তার বাধে না। মালবাবু বোটে উঠার জন্য রাগ দেখালে বিমল তার প্রতিবাদ করে। তার কথার ধারও কম নয়। ঝগড়ার এক পর্যায়ে বিমলের মন্তব্য—

> "না, এটা লাট সাহেবের অন্দর মহল।"(২খ, ৪৬ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

গল্পকথক এরপর অনধিকার চর্চার বিষয়টি জানিয়ে বিমলকে নিয়ে আসলে তার প্রতিক্রিয়া ছিল এমন—

> "মাথাটা ওইখানে গুঁড়ো করে দিয়ে আসাই উচিত ছিল— এমন অভদ্র জানোয়ার তো কখনো দেখিনি। আমরা যেন ওর বোটে চুরি করতে গেছি।" (২খ, ৪৬ পৃ)

হাসির কলধ্বনির রহস্য ও মালবাবুর আচরণ সম্পর্কে তাকে অনুসন্ধিৎসু হতে দেখা যায় দাওয়াতের এক পর্যায়ে রামপদবাবু মেয়ের অসুখের কথা বললে বিমল বিশ্বাস করতে চায় নি কেননা মালবাবু যে তার মেয়েকে প্রায়ই শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে এ খবরও সে জানে। এ ধারণায় গল্পকথকের প্রতিবাদে বিমল জানায়—

> "ঠিকই বলছি, কাল থেকেই আমার কিরকম সন্দেহ ছিল। আজ সন্ধ্যায় আমি নিজে গাধাবোটের ধার দিয়ে ঘুরে গোপনে দেখে গেছি। ঘর অন্ধকার হলেও পায়ের শেকল দেখতে আমার ভুল হয়নি।" (২খ, ৪৮ পৃ)

শুধু কৌতূহল নয়, সময়ে সে কঠোরও হয়ে উঠতে পারে। মালবাবুর প্রতি সে এমন আচরণই করেছে। আবার পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে মালবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে দ্বিধা করে নি। এ থেকে তার মনের সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ছাগ শিশু ও মালবাবুর কন্যার প্রতি তার দরদবোধ তাকে অসাধারণ মানবিকবোধ সম্পন্ন করে তুলেছে। এই গুণের কারণে নিম্নবিত্ত শ্রেণির বিমল পাঠকের অন্তর জয় করে নেয়। সত্যি তো এমনভাবে মানবিকতার জন্য কজন মানুষ নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। বিমল মানবিকতার উজ্জ্বল মশাল। এই মশালের আলো আমাদের সমাজে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

মালবাবু *অরণ্যপথ* গল্পের এক ব্যতিক্রমি চরিত্র। ১৫ বছর ধরে তিনি মেয়েকে নিয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করছেন। বিকলাঙ্গ মেয়ের অসহায়তা ও মর্মপীড়া তাকে প্রতিমুহূর্ত যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। মেয়েটির হাসি ও মুখশ্রী অত্যন্ত সুন্দর হলেও তার শরীরের নিচের অংশ ভয়ঙ্কর। যে হাসি ও মুখ গল্পকথককে আকৃষ্ট করেছিল তার শরীরই হতাশ করেছে। এমন মেয়েকে নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের কৌতূহল থেকে বাঁচার জন্য মালবাবু বোটে আশ্রয় নিয়েছেন। বোটেই এখন তার ঘর সংসার। কেননা বোটে তার কোনো বিপদ নেই। খালাসীদের কৌতূহল কম। তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। রামবাবুর যত ভয় তা সমগোত্রীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিয়ে। কেননা এই শ্রেণির মানুষের অপার কৌতূহল। তাই সংসারের মাঝে কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টির সামনে বাস করা অসহ্য। তার স্ত্রী, সন্তানের বীভৎস রূপ দেখে আত্মহত্যা করে মুক্তি পেয়েছেন। বোটে সমশ্রেণির কোনো যাত্রী উঠলে মালবাবুর উদ্বেগের সীমা থাকে না। এ সময় তিনি তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে মেয়েকে রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কেননা

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণা ও সহানুভূতি দুটিই মেয়েটির অসহ্য। গল্পকথক ও বিমলের ক্ষেত্রেও তাই করেছিলেন। মালবাবু দোষে গুণে মানুষ। মালবাবু একরৈখিক চরিত্র নয়। গল্পকথক ও বিমল প্রথম পরিচয়ে তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। আধাবয়সী এই স্থূলকায় মানুষটি ছয় বছর ধরে সবসময় বোটে বাস করেন। সামান্য মালবাবু হলেও স্টিমারে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তির অধিকারী। সারেঙ হতে খালাসী পর্যন্ত সবাই তাকে সমীহ করে। মালবাবু ইংরেজিও জানেন। খালাসীদের হয়ে সাহেবদের কাছে তিনি দু'এক কথা বলে থাকেন। দরখাস্ত লিখে দিতেও কৃপণতা করেন না। এদিক দিয়ে তিনি গরীব দরদীও। তার ব্যবহার অমায়িক। পরিচয়ের আগে স্মিত হেসে তিনি গল্পকথক ও বিমলের দিকে এগিয়ে আসেন। আলাপের পর সুবিধা অসুবিধার কথা জেনে তাদের আপ্যায়িত করেছেন। এই হাসিখুশি মানুষটিকে দেখে বুঝা যায় না তার অসহায়তা। তিনি দুঃখ ও অসহায়তাকে মানুষের সামনে প্রকাশও করতে চান না। কন্যার অসুস্থতার জন্য নিজের পাপকে দায়ী করেন। এ সম্পর্কে তার উচ্চারণ—

> "ও যে আমারই অপরাধের প্রত্যক্ষ শাস্তি তা জানি। কিন্তু নিজের প্রায়শ্চিত্তকে সাধারণের চোখের সামনে প্রকাশ করে রাখার শক্তি আমার নেই।" (২খ, ৫০পৃ)

অরণ্যপথ গল্পের কথক ও নায়ক মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। এ গল্পে তার পারিবারিক কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে কলকাতায় আশ্রয় নেবার মত আত্মীয় রয়েছে। মানসিক দিক দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি গল্পকথকের আর্থিক পরিচয় ঐভাবে জানা না গেলেও পান্থশালা ভাড়া নিয়ে থাকার সামর্থ্য তার ছিল। তবে সে সামর্থ্য হয়তো অল্প সময়ের। কেননা পুণ্যস্থান থেকে কলকাতায় ফিরে তাকে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করতে হয়েছে। মানসিক দিক দিয়ে উদার ও কমোল হৃদয়ের অধিকারী। এর প্রমাণ পাওয়া যায় অপরিচিত বালক বিমল যখন সমুদ্র কল্লোলের মতো অযুত মানুষের ভিড় ঠেলে মানুষের পদনিষ্পেষণে রক্তাক্ত একটি ছাগ শিশুকে দুহাতে তুলে নিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা চালাচ্ছে তখন গল্পকথকের দৃষ্টিতে তা এড়ায় নি। অন্য পুণ্যার্থীরা রক্ত গায়ে লাগায় বিমলের প্রতি বিরূপ আচরণ করে। অন্যদিকে গল্পকথক বিমলকে সহানুভূতি জানান। ছাগ শিশুসহ বিমলকে নিয়ে আসেন তার পান্থ শালায়। সেখানে অবশ্য পানি দিয়েও বিমল ছাগ শিশুটিকে বাঁচাতে পারে না। ছাগ শিশুটি না বাঁচলেও জীবের প্রতিই দুটি মানুষের মমত্ববোধকে খাটো করে দেখা যায় না। এরপর বিমল কথকের সঙ্গে যেতে চাইলে তাতে আপত্তি করেন নি। বিমলের সমালোচনা সত্ত্বেও তার দায়িত্ব নিজের কাঁধ তুলে নেন। বিমলকে নিয়ে কলকাতায় উঠেন আত্মীয় বাড়িতে। সেখানে বিমলের ঘরকে খঞ্জ, আতুর, পশু-পাখি ও মানুষের পিঁজরাপোল বানাবার ইচ্ছাকে গল্পকারের জ্ঞাতি মেনে নিতে না পারায় সে আশ্রয় গল্পকথককে ছাড়তে হয়। অন্যদিকে কলকাতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ না হওয়ায় জলপথে ভ্রমণে বের হন। এটা অবশ্য গল্পকথক করেছেন বিমলের আগ্রহে। তবে এই যে মানুষের প্রতি দরদবোধ তা শুধু বিমলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সৌন্দর্যের প্রতিও গল্প কথকের অনাবিল আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিমলের অনুরোধে স্টিমারে ঘুরতে গিয়ে উচ্চৈকণ্ঠে নারীর হাসির শব্দে বিমোহিত হন। তার সে অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে—

> "অন্ধকারে এই কণ্ঠস্বর একেবারে যেন অভিভূত করিয়া দিল। মুগ্ধ মন এই ধ্বনির সাহায্যে সেই মুহূর্তে যে মুখখানি রচনা করিয়া ফেলিল, বাস্তবের সহিত হয়তো তাহা কিছুতেই মিলিবে না, তবু তখনকার মতো স্নিগ্ধতায় একেবারে আবিষ্ট হইয়া গেলাম।" (২খ, ৪১ পৃ)

শুধু আবিষ্ট হওয়াই নয় এই হাস্যধ্বনি থেমে যাওয়ার পর তার উৎস অনুসন্ধানেও আগ্রহী হতে দেখা যায়। গল্পকথক সে উৎসের যে অনুসন্ধান করে ফিরছেন তা গোপন করেন নি। স্টিমারযাত্রীদের মাঝে এমন কাউকেই খুঁজে পান নি যে হতে পারে ঐ হাসির উৎস। হাসির উৎস খুঁজে না পাওয়ায় তা অনুসন্ধানে গল্পকথকের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। অবশেষে গল্প কথক জানতে পারেন তার নিজ এলাকার মালবাবুর মেয়ে ঐ হাসির উৎস। একটি মেয়ে দেখতে পান গল্পকথক। মেয়েটিকে গল্পকথক এভাবে দেখেছেন—

> "এ হাসি চিনিতে দেরি হইল না। দেখিলাম হাস্যধ্বনি হইতে তাহার মুখ সেদিন নিতান্ত ভুল অনুমান করি নাই। মেয়েটির বয়স বছর পনেরো-ষোলোর বেশি নয় অবশ্য কিন্তু মুখ চোখ দেখিয়া তাহাও বোঝা সহজ নয়। চোখের দৃষ্টিতে মুখের হাসিতে এমন একটি সারল্য আছে শিশুর মুখেও যাহা বেশি দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। হাসিটি অপরূপ হইলেও মেয়েটির মুখখানিতে কেমন একটি রুগ্‌ণ ম্লানিমা আছে। রুক্ষচুলের রাশ শীর্ণ মুখটিকে যেন অতিরিক্ত পাণ্ডুরতা দান করিয়াছে।" (২খ, ৪৬ পৃ)

মেয়েটির সারল্যের পরিচয় লাভ করেন গল্পকথক। গল্পকথক আর সমালোচনা করেন। এ থেকে তার বুদ্ধিদীপ্ত মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েটিকে দেখার পর ঘটে যাওয়া পরিস্থিতি তিনি মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

> "বুঝিতে কিছু পারি নাই। ওই মেয়েটির সহিত রামপদবাবুর গত রাত্রের রাগ ও এদিনের অনুশোচনার যদি কোনো সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে সে সম্বন্ধ আমার বুদ্ধির এখনো অগোচর। মেয়েটির আকস্মিক ভয়ও আমার কাছে দুর্বোধ্য।" (২খ, ৪৭ পৃ)

এই রহস্যের জাল উদ্ধার করতে গল্পকথককে তৎপর হতে দেখা যায়। যে সেকেন্ডবাবু তাকে শীতল পাটি কেনার জন্য বলেছিল তা কিনেও তিনি সেই রহস্যের কথা জানতে চান। মেয়েটি সম্পর্কে মামুলি কিছু সংবাদ ছাড়া সেকেন্ডবাবু অবশ্য তেমন আর কিছু প্রকাশ করেন না। এই কৌতূহল অবশেষে পূরণ করেন মেয়েটির বাবা মালবাবু নিজে। মালবাবু এক পর্যায়ে বাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে তার মেয়েকে দেখান বিমল ও গল্পকথককে। এরপর গল্পকথক মেয়েটিকে দেখেন এভাবে—

> "লণ্ঠনের আলোয় তাহার সম্পূর্ণ চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সৃষ্টির পরমাশ্চর্য নারীদেহ লইয়া প্রকৃতির ইহার চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস বুঝি আর হইতে পারে না। কোমল এবং প্রায় স্বাভাবিক মুখখানির জন্য বিকলাঙ্গ দেহের বীভৎস ছন্দহীনতা আরো যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বুঝিলাম তাহার চোখে সরলতা বলিয়া যাহা ভুল করিয়াছিলাম তাহা মনের মহাশূন্যতার আভাস মাত্র। কণ্ঠের অপরূপ হাসি দিয়া নির্মম বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি-বিভীষিকার উপর ব্যঙ্গের চরম ছাপ রাখিয়াছেন।" (২খ, ৪৯ পৃ)

গল্পকথক এরপর জানতে পারেন এই মেয়েটির অশান্ত রূপের কারণে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে বাধ্য হন এবং সগোত্রীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টি এড়ানোর জন্য এমন জীবনকে মালবাবু বেছে নিয়েছেন। মেয়েটির পরিণতির জন্য গল্পকথকের মনে করুণা নয় হতাশার সৃষ্টি হয়। বোটের হাসির রহস্য উদ্ধারে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল কথকের মনে সে জায়গায় মেয়েটিকে দেখে হতাশা প্রকাশ করা তার চরিত্রের একটি দুর্বলতর দিক। কেননা এ থেকে তাকে স্বার্থ সচেতন একজন রোমান্টিক মানুষ হিসেবে দেখা যায়। চূড়ান্তভাবে মানবিকতার চরম প্রকাশ আমরা তার মধ্যে লক্ষ করি না। এটি মধ্যবিত্ত স্বার্থ সচেতন মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। গল্পকথক এখানে সেই মানসিকতারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

পঞ্চশরের ৬ষ্ঠ গল্পের নায়ক নিপু মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। এ গল্পে তাকে আর্থিক সংগ্রাম করতে দেখা যায় না। তবে দুটি উদ্যোগ সে গ্রহণ করে। এর একটিতে সে সফল হয় অন্যটিতে আসে ব্যর্থতা। পরিত্যক্ত ভূতের বাড়িকে সে মেস বানাতে সক্ষম হয়। কিন্তু অতি বিশ্বাসের সে মূল্য দিতে পারে না। নিপুর বন্ধু তাকে ইঁটভাটার ম্যানেজার নিযুক্ত করলে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়। সে পেশাগত দক্ষতা নয় মহত্ত্ব অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। সেকারণে কারখানার শ্রমিকরা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরতে থাকলে বন্ধুর একশ টাকা চুরি করে শ্রমিকদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ ঘটনার পর নিপু উধাও হয়ে যায়। এর দীর্ঘদিন পর সুধীরের সঙ্গে আবার নিপুর দেখা হয়। এবার নিপু দেখা দিয়েছে ভীষণ অসুস্থ হয়ে। সুধীরকে অসুস্থতার এক পর্যায়ে নিপু তার পালিত কন্যাকে আনতে বলে। এ আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে নিপুর জীবনের বিশেষ একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হচ্ছে নারীর প্রতি আসক্তি। তবে আসক্তির কোনো কিনারা পাওয়া যায় না। পালিত কন্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি করতে বাধ্য করে। বিশেষত নিপুর জামাই ও পালিত কন্যার রুচি পোশাক ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্যে। এই ভিন্নতা সুধীরের দৃষ্টি এড়ায় নি। যেমন এড়ায় না পাঠকের। তারপর সুস্থ হয়ে মেস থেকে নিপু বিদায় নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্রাণ গল্পের অনুপমার স্বামী বিনয় এক সন্তানের অধিকারী। কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে তাকে থাকতে হয়। গল্পের সামান্য অবয়ব জুড়ে তার অবস্থান। বিনয় অল্পবয়সী পুত্র ও স্ত্রীকে রেখে সংসারের মায়া ছিন্ন করে ইহলোক থেকে বিদায় নেন। কর্মজীবী এই মানুষটি পাঠক হৃদয়ে মর্যাদাকর আসন দখল করে নেন। দখল করে নেন এই কারণে, যে সময় বিশ্বাসহীনতা ও সংশয়ের, সে সময় তিনি বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসের চরম আস্থা প্রকাশ করেছেন। বিনয়ের সঙ্গে অনুপমার বিয়ে হয়। বিয়ের আগে পরিতোষবাবুর সঙ্গে অনুপমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অনুপমার কথায় অভিমান না করলে পরিতোষবাবুর সঙ্গেই বিয়ে হতো তার। আর এই পরিতোষবাবু হলেন বিনয়ের বন্ধু। এই সম্পর্কের কথা জানার পরও পরিতোষবাবু সেখানে আসলে বিনয় কোনোদিন কিছু মনে করেন নি। পরিতোষবাবু একদিন বিনয়কে মনে করিয়ে দেন অনুপমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। পরিতোষবাবু জানান—

> "তুমি আমায় এখানে এমন রোজ আসতে দাও কেন বলো তো বিনয়। তোমার মনে কি সত্যি কিছু হয় না? অনুর সঙ্গে আমার পরিচয়টা কিরকম ছিল তুমি ভালোরকমই জান। ওর কথার ওপর রাগ করে ওকে অপমান করে অমন নির্বোধের মতো অতদিন সরে না থাকলে, তোমার আজ এখানে স্থান হবার কথা নয়, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস করে আসতে দাও। তোমার বন্ধুত্বের লোভে যে আসি না তা তো বোঝ!"(২খ,১০৩ পৃ)

পরিতোষবাবুর এমন কঠিন ও সত্য কথার উত্তরে হেসে বিনয় শুধু জানান—

> "তোমায় আমি চিনি যে।" (২খ, ১০৩ পৃ)

বন্ধুর প্রতি এই অকৃত্রিম বিশ্বাস বিনয়চরিত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে আলোর দ্যুতি। যদিও তার জীবনের আলো নিভে যায় জীবনের প্রথম বেলায়।

পরিত্রাণ গল্পের পরিতোষবাবু আর একটি উল্লেখ যোগ্য চরিত্র।

পরিতোষবাবু বিনয়ের বন্ধু। অর্থনৈতিক অবস্থা তার ভালো। বিষয়-আসয়ের সামগ্রিক খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তিনি ম্যানেজার নিয়োগ করেছেন। একসময় বিনয়ের স্ত্রী অনুপমার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু রাগারাগির কারণে তা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় না। অনুপমার সঙ্গে পরিতোষবাবুর সম্পর্ক বিষয়ে বিনয়বাবুকে সাবধান করেন এভাবে—

> "অনুর সঙ্গে আমার পরিচয়টা কি রকম ছিল তুমি ভালোরকমই জান। ওর কথার ওপর রাগ করে ওকে অপমান করে অমন নির্বোধের মতো অতদিন সরে না থাকলে, তোমার আজ এখানে স্থান হবার কথা নয়, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস করে আসতে দাও। তোমার বন্ধুত্বের লোভে যে আসি না তা তো বোঝ।"(২খ,১০৩পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা জানিয়ে সাবধান করে দিলেও বিনয়ের বিশ্বাস ও বন্ধুত্বকে পরিতোষবাবু যথার্থ মূল্য দেন। বিনয়ের মৃত্যুর সাত বছর পর অনুপমার বাবা মারা গেলে পরিতোষবাবুর বাড়িতে কম ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা করে দিতে চিঠি লিখলে তিনি তা পালন করেন। প্রার্থিত বাড়িতে নির্মাণ কাজ হওয়ায় নিজ বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন। অনুপমাকে নিজের অসুখের কথা জানতে দেন না। যা পরে অনুপমা ম্যানেজারের কাছ থেকে জানতে পারে। অনুপমা অসুখের কথা শোনার দিনই পরিতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যায়। রওনা দেয়ার পর অনুপমার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। সে ভাবে আজ যদি পরিতোষবাবু অসংযত হয়ে পড়েন। আর পরিতোষবাবুর এই অসংযতভাব ঠেকানোর জন্য অনুপমা নানান পরিকল্পনা করে। কিন্তু দেখা যায় এ অবস্থায়ও পরিতোষবাবু নিজেকে সংযত রাখেন। অনুপমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আশ্রয় দান, সংযত আচরণ পরিতোষবাবুকে একজন প্রগতিশীল ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এ তার বাইরের আবরণ। সামাজিকতার খোলস। কেননা, আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, পরিতোষবাবু তার মানসলোক থেকে কোনোদিন অনুপমার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেন নি। বিনয়ের সঙ্গে পরিতোষবাবুর আলাপে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বিনয়কে জানিয়েছিলেন যে এখানে বন্ধুত্বের লোভে আসেন নি। তিনি আসেন অনুপমার জন্য। হ্যাঁ অনুপমার জন্য। অনুপমা যখন পরিতোষবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তখন ম্যানেজারবাবুর কথায় অনুপমা বুঝতে পারে যে পরিতোষবাবুর মনোলোকে সে এখনো বিদ্যমান। কেননা ম্যানেজার তাকে জানান যে, অনেক সময় ফাঁস বেঠিক বলে বসেন।

আর এসব কারণে দেখা যায় অনুপমার মনে পরিতোষবাবুর এই দুর্ভাগ্যে সমবেদনার চেয়ে আর একটি অনুভূতি বড় হয়ে উঠে। সে অনুভূতির কারণে অনুপমার একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। পরিতোষবাবু অর্থনৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। এ চরিত্রটি একরৈখিক নয়। মানবিক অনুভূতি ও ভালোবাসার প্রতি সুগভীর মায়াবোধ তাকে বিশেষ মর্যদা দিয়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হয়েও তিনি পাঠক হৃদয় জয় করে নেন। সমাজে এমন কিছু মানুষের সন্ধান আজও পাওয়া যায়। তবে সংখ্যায় তা খুব অল্প। সেকারণে পাঠক হৃদয়ে এই মানুষটির জন্যে শ্রদ্ধার ফল্গুধারা বয়ে যায় নিরন্তর।

পাশাপাশি গল্পের গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র মেজবৌ বিধুভূষণের স্ত্রী। সে নিঃসন্ত-ান। দশ বছরের বিবাহিত জীবনের সন্তান লাভ না করার হাহাকার তার অন্তরে বিরাজ করে। একই উঠানে অপর পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ গড়ে উঠে অমলের মাধ্যমে। দুই পরিবারের মধ্যে যোগসূত্রের আর একটি উপলক্ষ অমলের ছেলে। ছেলেটি মেজবৌর নেওটা হয়ে ওঠে। মেজবৌর সঙ্গে অমল সরল হাস্যরসের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। মেজবৌ তার সন্ত ানের অনুপস্থিতি পূরণ করতে চায় খোকাকে দিয়ে। তাই তাকে ঘিরে বিকাশ ঘটে মেজবৌর আপত্য স্নেহজাল। তবে এই স্নেহের জাল বুনতে সময় লাগে। কেননা প্রথম দিকে মেজবৌ স্বার্থ সচেতন ছিল। শুধু দারিদ্র্যের কারণে তারা দুটি পরিবার একত্রে বসবাস করে। অমলের সংসারে লোকসংখ্যা বেশি। অমল, অমলের স্ত্রী কানন, পিসিমা ও অমলের ছেলেকে নিয়ে এই

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার জন। এ অবস্থায় সমান ভাড়া গুনে কল পায়খানা এক হওয়ায় মেজবৌকে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়। প্রথমে এই সমস্যাকে মেজবৌ সহজে মেনে নিতে পারে নি। এ সম্পর্কে স্বামীর কাছে মেজবৌর অভিযোগ–

> "কল তো একটি মিনিটের জন্য খালি পাবার জো নেই। যখনই যাব, দেখি ওদের পিসি বুড়ী বসে আছে,– ধুয়ে ধুয়ে হাত পা হেজে গেল, তবু বুড়ীর ছুঁচিবাই যায় না।"(১খ,২৩৮পৃ)

মেজবৌ অমলের পরিবার সম্পর্কে আরো অভিযোগ করে–

> "একদিন আমার জায়গায় থাকতে হত তো বুঝতে, এমন করে একসঙ্গে থাকার কি জ্বালা ! চার বছরের ছেলেটাকে পর্যন্ত সামলান দায় ! এই এটা ভাঙছে, এই সেটা ফেলছে। তা মা কি শাসন করবে একটু !" (১খ, ২৩৮পৃ)

শুধু পিসি ও খোকা নয় এরপর শুরু হয় সংসারের প্রয়োজনে কাননের চুরির অভ্যাস। এটা মেনে নিতে পারে নি মেজবৌ। স্বামীর কাছে এ সম্পর্কে তার অভিযোগ–

> "আরও বুঝতে চাও তো এই দেখ। মাসের সবে সাত দিন, এক টিন তেলে সিকি ভাগও খরচ করে নি। আর দেখ দিকি তেল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে।" (১খ, ২৪০ পৃ)

কাননের চুরির স্বভাবকে মেজবৌ মেনে নিতে পারে না। এমনকি বয়স্ক মানুষের প্রতি ঠাট্টায়ও তার সম্মতি নেই। এরই মাঝে অবশ্য অমল ও খোকার সঙ্গে মেজবৌর ভাব হয়ে যায়। অমল ও খোকাকে ঘিরে তৈরী হয় সম্প্রীতির পরিবেশ। এসময় অবশ্য কানন প্রতিযোগিতায় নামে স্বামীকে বড় করে দেখাতে। মেজবৌর খোকার প্রতি স্নেহের একটি উদাহরণ দেয়া যায়–

> "দেরাজ হইতে সম্প্রতি তাহার নতুন একটা ভাল আসন বাহির করিতে হইয়াছে। বিধুভূষণের সকাল বিকালে চা খাইবার সময়টি খোকা ঘড়ির কাঁটার মত জানে। তখন শুধু চা পাইলেই তাহার চলে না। বিধুভূষণের মত আসন ও পেয়ালা দুইই চাই। মেজবৌ দু দিন অন্য কিছু দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ফল হয় নাই। ভাল মন্দের তফাৎ খোকা ভালো করিয়াই চেনে।" (১খ, ২৪২ পৃ)

এরপর মেজবৌ যত কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেনো খোকার জন্য লুচি ভাজতে ভুল করে নি। নিজের সন্তান না থাকায় খোকাকে মেজবৌ আপন সন্তানের মতোই স্নেহ করেছে। কিন্তু এই দুর্বল জায়গাতেই একদিন চরম আঘাত পেতে হয় মেজবৌকে। খোকা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লে কানন ও পিসিমা দায়ী করে মেজবৌকে। প্রতিটি নারী চায় মা হতে। তবে অনেকেই এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। কাজেই সন্তান না থাকাটা একজন নারীর সবচেয়ে দুর্বল

Dhaka University Institutional Repository

জায়গা। বিষেশত যে নারী সন্তানের জন্য লালন করে অপত্য স্নেহেরধারা। এমন দুর্বল জায়গায় আঘাত দিতেও পিসিমা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কাননকে পিসিমা বলেছেন–

> "ভয় তো আমার ওই জন্যেই বৌমা। কপালে যাদের আদর করা নেই, তাদের আদর যে সয় না কিছুতে-শাপ হয় যে।"(১খ, ২৪৫ পৃ)

এ ঘটনাকে ঘিরে দুই পরিবারের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মেজবৌ খোকাকে আর পাত্তা দেয় না। কিন্তু একদিন কাননদের সত্যিকার দুর্বিষহ অবস্থা টের পেয়ে ধার পরিশোধ করার অজুহাতে মেজবৌ চালসহ অনেক জিনিস দিয়ে আসে। কানন অবশ্য সত্য কথাই বলে যে ধার তারা দেয় নি। কিন্তু পিসিমা কাননকে কথা বলতে হবে না বলে তা গ্রহণ করে। কেননা তখন কাননদের অভাবের চাপ তারই ওপর পড়েছিল। এরপর মেজবৌ রান্নাঘরে আর তালা দেয় নি।

নতুন বাড়ি ঠিক করেও সেখানে বিধুভূষণের পরিবারের ওঠা হয় না। এ প্রসঙ্গে স্বামীর প্রশ্নের জবাবে মেজবৌ বলে–

> "দরকার নেই কি রকম! অমল ঠাকুরপোর একটা চাকরি হোক না, তারপর এই ছোটলোকদের সঙ্গে আমি আর একদিনও থাকব ভেবেছ! "(১খ, ২৪৬ প)

নিজে অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও অমলের পরিবারের দুর্দিনে মেজবৌ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মাতৃস্নেহের কারণে সহযোগিতায় এগিয়ে যায় মেজবৌ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মেজবৌর এ মন্তব্য থেকে--

> "কি করব বল ? সামনা সামনি দিতে গেলে তো নেবেন না। নবাবের বেটির যে তাতে মান যায়। তা বলে ওই দুধের ছেলেটা উপোষ করে মরবে।"(১খ, ২৪৬ পৃ)

মেজবৌর এই গুণের কারণে শরৎচন্দ্রের মেজদিদি গল্পের মেজদিদির প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

শবযাত্রা গল্পের মূল নারী চরিত্র রমা মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহিণী। তাকে সংসারের চরম বাস্তবতার মুখোমুখি আগে হতে হয় নি। তার একমাত্র খুকির মৃত্যুকে ঘিরে জীবনের চরম বাস্তবতায় সে প্রবেশ করে। একমাত্র সন্তানের প্রতি তার গভীর স্নেহ ও মায়া জড়িয়ে আছে। আর আছে দাদা রমেশের প্রতি নির্ভরতা। রমা বরাবরই নম্র ও কোমল স্বভাবের। তার মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে–

Dhaka University Institutional Repository

> "নম্র কোমল মেয়েটি– সারাজীবন সে সংসারের দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে সসঙ্কোচে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। মর্মভেদী কান্নাও তাহার আজ গুমরানির মত শোনায়।" (১খ, ২৬৯ পৃ)

এই কোমল মেয়েটি খুকির অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তার ভরসার মূলস্থল দাদা ও পিসিমার কাছে তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। সকলের দিকে তাকিয়ে তার করুণ আর্তি–

> "খুকীকে বাঁচাতে পারবে না গো ? "(১খ, ২৭০ পৃ)

পরম স্নেহে ও আদরের এক মাত্র সন্তানকে হারিয়ে রমা প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে দুঃখ-বেদনা অন্তরকে দলিত মথিত করে তার সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হয়। সে বুঝতে পারে না এ জায়গায় মানুষ কতটা অসহায়। তাই চিরদিনের শান্ত এই মেয়েটি উত্তেজিত হয় চিৎকার করে বলে–

> "তোমরা একটা ডাক্তার ডাকতেও কি পার না গো ?" (১খ, ২৭০ পৃ)

খুকিকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা পর্যন্ত সে করে যেতে চায়। চরম মহূর্তে মৌনতা হরণ করে সে হয়ে উঠে সাহসী। সন্তান বাৎসল্যের অমীয়ধারা তাকে আবেগী করে তোলে। রমার অবস্থান থেকে এমন আচরণই স্বাভাবিক। তাই কণ্ঠে কান্না জড়িয়ে দাদার কাছে তার মিনতি–

> "ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকতে গেলে না দাদা ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ দাদা ! " (১খ, ২৭০ পৃ)

রমার মত তার দাদাও এমন পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নয়। তাই সে ডাক্তার ডাকার জন্য যেতে চায়। কিন্তু মৃত্যুর খেলায় অভিজ্ঞ দর্শক পিসিমা জানেন আর ডাক্তার ডেকে লাভ নেই। তাই রমেশকে তিনি ডাক্তার ডাকতে নিষেধ করেন। স্নেহশীলা ছোট বোনের দুঃখে সে চোখের জল লুকাতে পারে না। অশ্রু লুকাতে তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়।

সাত বছরের সন্তানের মৃত্যুতে অতীত স্মৃতি নিয়ে রমা কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার সাত বছরের কথা আর শেষ হতে চায় না। তার মনে আঘাত করে সন্তান বঞ্চিত হবার ঘটনাগুলো। সে কেঁদে কেঁদে বলে যায়–

> "পিসীমাগো, খুকী যে আমার গলার হারের মত হার পরতে চেয়েছিল। আমি যে হারিয়ে ফেলবে বলে গড়িয়ে দিই নি পিসীমা। আর কি হার সে পরবে না পিসীমা ?"'(১খ, ২৭১ পৃ)

প্রতিবেশীর প্রবোধ তার কাছে নিষ্ফল। দাদাকে দেখে রমা ডুকরে কেঁদে উঠে বলে–

> "খুকীকে যে তুমি বায়স্কোপে নিয়ে যাবে বলেছিলে দাদা। তোমার খুকীকে ফিরিয়ে নিয়ে এস দাদা!"(১খ, ২৭১ পৃ)

Dhaka University Institutional Repository

স্নেহ ও ভালোবাসার কারণে সৎকার করতে নিয়ে যাওয়ার সময় সন্তানকে সে দড়ি দিয়েও বাঁধতে দেয় নি। সে সন্তানকে নিয়ে যেতেও বাধা দিয়েছে। তার বাধার মুখে খুকিকে নিয়ে যেতে হয়। খুকিকে নিয়ে যাবার সময় তার মর্মভেদী করুণ আর্তি ছিল এমন–

> "ওগো আর একটু রেখে যাও, আমি যে সোনামুখটি ভালো করে দেখিনি।"(১খ, ২৭২পৃ)

সন্তান হারানোর প্রথম মর্মবেদনায় মায়ের যে অনুভূতি জাগে তাই ফুটে উঠেছে রমার মধ্য দিয়ে। এ অনুভূতি বাঙালির চিরন্তন প্রকাশ।

পঞ্চশরের দ্বিতীয় গল্পের মাসিমা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তিনি গল্পের নায়ক সুধীরের বন্ধু সহদেবের মা। সুধীরের পাতানো মা। গরীব গৃহস্তের গৃহিণী তিনি। তার ছেলে সহদেব সন্ন্যাসী। তিনি স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসারের গাঁথুনি বেশ শিথিল হিসেবে দেখতে পান। ছেলে সহদেবের সন্ন্যাসগিরিতে তিনি সমর্থন জানাতে পারেন না। পুত্রকে সংসারমুখি না করতে পারার ব্যর্থতা তিনি ভুলতে চান পুত্রবন্ধুকে সংসারী হিসেবে দেখার মধ্য দিয়ে। তিনি সে কথা প্রকাশ করেছেন সুধীরের কাছে এভাবে–

> "অত দূরদেশে কাজ শিখতে না গেলে কি চলত না বাবা, যা তোরা ভালো বুঝিস কর, কিন্তু মায়ের মুখের দিকে চাইলিনে এই বড়ো দুখ্‌খু। একজন তো সন্ন্যাসী হয়ে রইল, তুই কাছে থেকে বিয়ে-থা করে সংসারী হবি দেখব বলে কত আশা ছিল, তা নয়, তুই চললি একেবারে একটু-আধটু দূরে নয়– সাগরপারে দেশান্ত-রে। তোদের আর মায়ামমতা নেই।"'(১খ, ২৯৪ পৃ)

তার এ চাওয়ার মধ্য দিয়ে চিরন্তন বাঙালি মায়ের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। বৃদ্ধ অবস্থায় তাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়েছে। পুত্র সহদেব থেকে না থাকার অবস্থা হয়েছে। এ অবস্থায় সুধীরের বন্ধু ও পাতানো মা মারা যায়। বৃদ্ধ বাবা-মার নিঃসঙ্গতা বর্তমানে বাংলাদেশেও প্রকট হয়ে উঠছে। আজ আমাদের দেশে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় বেশ আগে থেকে। এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যথার্থ মা হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছেন। তাই সুধীরের কোনো সমস্যা তিনি হতে দেন নি। তার স্বামী মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে আমিষের পাট চুকে গিয়েছিল। কিন্তু সুধীরের জন্য আবার তিনি আমিষের ব্যবস্থা করেন।

সুধীরের প্রতি তিনি সুতীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। সুধীরের জামা ছিঁড়ে গেলে তা তার দৃষ্টিতে এড়ায় নি। পাশের বাড়ির মেয়েটিকে দিয়ে তা রিপু করে দিয়েছেন। এই মেয়েটির প্রতিও তিনি বেশ দুর্বলতা দেখিয়েছেন। যেকারণে সুধীরের কাছে বারবার তার প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন, প্রশংসা করেছেন। তিনি হয়তো এই বাল্য বিধবা মেয়েটির একটা গতি করতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তা সফল হয় নি সুধীরের স্বার্থ সচেতন মনের কারণে। সে মেয়েটিকে দেখলেও তার প্রতি কার্যকর অনুরাগ প্রকাশ করে নি। পুত্রের মঙ্গল কামনায় তিনি অত্যন্ত আন্তরিক। সুধীর কাজ শেখার জন্য যেদিন সুভালাভালি যাবে সেদিন তার হাতে নির্মাল্য রাখতে বলেছে। ধর্মের প্রতি রয়েছে তার দৃঢ় বিশ্বাস। সুধীরের বয়সী ছেলেরা যে ধর্মের প্রতি তেমন আকৃষ্ট নয় তাও তার দৃষ্টিতে এড়ায় নি। সমাজের স্বরূপ চেনার ক্ষেত্রে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আচারের যে পরিবর্তন হচ্ছে তা তিনি ধরতে পেরেছেন। তাই সুধীরকে তিনি বলেছেন-

> "সে তোরা যা বলিস, আমরা ঠাকুর দেবতা বলেই মানি। আমি তো নিজে আজ ঘরের কাজ নিয়েই সকাল থেকে আছি, যেতে পারিনি। ও বাড়ির মেয়েটি আজ সকালে ঠাকুরবাড়ি গিয়েছিল, যত্ন করে এই নির্মাল্য নিজে এনে দিয়েছে– দেখিস যেন পায়ে না ঠেকে। ------"(১খ, ২৯৪ পৃ)

মাসিমা চরিত্রের মধ্যে যে আন্তরিকতা ও সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা তাকে অসাধারণ করে তুলেছে। মাসিমা তার আন্তরিকতার কারণে পাঠক হৃদয়ে অতি মর্যাদাকর আসন লাভে সক্ষম হয়েছেন। একই সঙ্গে একটি সুন্দর সংসারের জন্য তার যে হাহাকার তা পাঠক হৃদয়ে ছুঁয়ে যায়। পাঠক হৃদয়েও সেই শূন্যতা ও হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১। সম্পাদক (নাম উল্লেখ নেই), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৮৯)
সম্পাদক (নাম উল্লেখ নেই), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, ২য় খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৯৩)
সম্পাদক (নাম উল্লেখ নেই), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, ৩য় খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৯৩)
এই গ্রন্থগুলো থেকে বর্তমান অধ্যায়ে যে উদ্ধৃতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে এর পর থেকে সেই উদ্ধৃতির পাশে সংক্ষেপে শুধু খণ্ডের সংখ্যা ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হবে।

২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কল্লোল-গোষ্ঠী*, (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ: ১৮৭-১৮৮

৩। সুমিতা চক্রবর্তী : *প্রেমেন্দ্র মিত্র*, (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ: ২৯

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *গল্পগুচ্ছ*, (কলকাতা, ১৯৬৪) পৃ: ১৩৪-১৩৫

৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৯

৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৮

৭। নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদনা) : *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ:৯

৮। সুমিতা চক্রবর্তী : প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ঋজু বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যকর্মের, বিশেষত গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি মানুষ ও সমাজকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন একজন শল্য চিকিৎসকের মতো। মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর আস্থা ও বিশ্বাসবোধ ছিল অবিচল। প্রেমেন্দ্র মিত্র আত্মপীড়ন জাগিয়ে তোলার অসাধারণ রূপচিত্র বিনির্মাণ করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। মার্কসীয় সাম্যবাদ তাঁর অধ্যয়নে ছিল, গান্ধীর সমকালীন হরিজন-তত্ত্বও তিনি জানতেন। তবে সাহিত্যে তিনি মানুষকে নির্মাণ করেন নিজস্ব বোধ দিয়েই। এই বোধের সঙ্গে মার্কসবাদ কিছুটা মেলে, গান্ধীর হরিজন তত্ত্বের মিলও আছে। কিন্তু তা শুধুই মার্কস বা গান্ধীবাদ নয়। মধ্যবিত্তের আত্মজটিলতায় তিনি অনেক সময় ক্লান্তিবোধ করেছেন। অন্যদিকে নিম্নবর্গের মানুষের জটিলতাহীন সরল জীবনের প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন পরম দুর্বলতা। অসাধারণ মানবিকতা তাঁর শিল্পীমনে ক্রিয়াশীল ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র অসাধারণ এবং তুলনারহিত। তাঁর গল্পে শঠ ও প্রতারক শ্রেণির মানুষ এসেছে কিন্তু তাদের কেউই চূড়ান্তভাবে মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জিত নয়। তিনি তাঁর প্রতারক ও শঠ শ্রেণির মানুষের মধ্যেও মানবিকতার সন্ধান করেছেন। সাহিত্যের কর্মময় জগতে তিনি ক্লান্তিহীন। দীর্ঘ শিল্পী জীবনে তিনি কুলি-মজুরের মতো সন্ধান করে ফিরেছেন গোটা মানুষের মানে এবং পরম নিষ্ঠা ও মমতায় তার শিল্পরূপ দিয়েছেন। মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা অন্তহীন, এর যেন কোনো শেষ নেই। জানার আগ্রহ ও ইচ্ছার ঘোড়া যেন আরো বেশি শক্তিমান ও অদম্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য সমগ্রতাবোধ, মানবিকতা ও চরম নিরাসক্তি দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মানুষকে বিচার করেছেন দেশ, কাল ও সমাজের প্রবহমান শক্তির উপর নির্ভর করে। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে টানাপড়েন ছিল। তিনি মানুষের মধ্যে অশুভবোধের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। এ হলো তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা। সাহিত্যে-শিল্পে তিনি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারান নি কখনো। তিনি মানুষের অন্তর্লোকের যে জটিল দ্বন্দ্ব ঘূর্ণমান তা চমৎকারভাবে রূপায়ণ করেছেন। মানুষের রূপের চেয়ে স্বরূপ আবিষ্কারের প্রতিই তাঁর প্রবল ঝোঁক। বিশ্লেষিত তাঁর গল্পসমূহ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে আমাদের এই প্রতীতি জন্মেছে।

পার্থিব জগতে মানুষ স্বপ্ন, প্রত্যাশা, আত্মিকজটিলতা নিয়ে জীবনকে এগিয়ে নেয়। এই পথে অধিকাংশ হৃদয়ে রক্তক্ষরণ মানুষকে ব্যথিত ও হতাশ করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের মানুষ জীবন-জটিলতায় হয়েছে রক্তাক্ত। আবার কিছু মানুষ আছে যারা এই আত্মিকজটিলতাকে এড়িয়ে যাওয়ার সচেতন প্রয়াস চালিয়েছে। তাঁর শিল্পীসত্তাকে এ বিষয়টিও স্পর্শ করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য পাওয়া গেছে। তাঁর সমগ্র ছোটগল্প বিশাল এক ক্যানভাস। তেমনি তাঁর চরিত্ররা এসেছে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে। তিনি নিম্নবিত্ত,

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণ করেছেন। তাঁর নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ আর্থিকসংকটে জর্জরিত। আর্থিকসংকটে জর্জরিত হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে নীতি ও নৈতিকতাবোধ নেই বললেই চলে। দুই-একটি চরিত্র অবশ্য ব্যতিক্রম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে কিছু উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ এসেছে। তারা সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজের।

প্রেমেন্দ্র মিত্র যেখানে সর্বোচ্চ পরিমাণে অনুসন্ধানী এবং আত্মনিষ্ঠ তা হলো গল্পে মধ্যবিত্ত চরিত্রের রূপায়ণ। প্রেমেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্তের সংকটকে অসাধারণ দক্ষতায় শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পে সব ধরনের মধ্যবিত্ত চরিত্রের অস্তিত্ব আমরা পেয়েছি। এই মধ্যবিত্তের একটি অংশ আর্থিকসংকটে বিপর্যস্ত। এই জটিল পরিস্থিতিতে অনেকেই নীতি ও নৈতিকতা হারিয়েছে। তবে তারা চূড়ান্তভাবে নীতি ও নৈতিকতাকে বিসর্জন দেয় নি। আবার অন্য একটি অংশ রয়েছে যারা আর্থিকসংকটে পড়ে জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে কিন্তু সাহসী হয়ে সংকটের শৃঙ্খল ভাঙতে পারে না। এরা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম ও অনৈতিক নির্দেশ অমান্য করার সাহস যেমন দেখায় নি তেমনি নীতি ও নৈতিকতাকে বিসর্জন দেয় নি। তারা মেনে নিয়েছে যা ঘটছে তাকে। এ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা ছাড়া যেনো তাদের বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়ার উপায় নেই। অন্য একটি অংশ মানসিক সংকটের ঘূর্ণিজালে অসহায়ভাবে আবর্তিত হয়েছে। এই সংকট তাদের মানসভুবন রক্তাক্তপ্রান্তরে পরিণত হয়েছে। পরিণত জীবনবোধের কারণে এই সংকট উজ্জ্বলরূপে প্রাণ পেয়েছে। এছাড়া মধ্যবিত্তের জীবনে সংকট এসেছে বিচিত্র বিষয়ে, সামান্য তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই সংকটসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে সেগুলো আর ব্যক্তির বলে মনে হয় না, মনে হয় তা সমাজের প্রতিটি মধ্যবিত্ত মানুষের। এখানেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপস্থাপনা সর্বজনীনতা পায়।

বাংলা ছোটগল্পের যে পর্যায়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প লেখায় সফল হয়েছেন, সে সময় স্মরণীয় গল্পকারের অভাব ছিল না। এরই মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে ভিন্নতা যেমন ছিল বিষয়ে, বিষয়ের গভীরে প্রবেশের মানসিকতায়; তেমনি বিশ্লেষণেও। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত চরিত্রের জীবনসংকট রূপায়ণে যে স্ব-বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেন তত্ত্ব, তথ্য, উপস্থাপনায় তা সমকালে অনন্য এবং এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ॥ এক

আকর গ্রন্থাবলি :

১। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা

২। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা

৩। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা

পরিশিষ্ট ॥ দুই

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত গল্পগ্রন্থসমূহ :

গ্রন্থ	প্রথম প্রকাশকাল	প্রকাশক
পঞ্চশর	১৯২৯	প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নাম নেই
বেনামী বন্দর	১৯৩০	প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নাম নেই
পুতুল ও প্রতিমা	১৯৩২	প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নাম নেই
মৃত্তিকা	১৯৩৫	প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নাম নেই
অফুরন্ত	১৯৩৬	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি
প্রজাপতির পক্ষপাত	১৯৩৬	কেনো তথ্য পাওয়া যায় নি
মহানগর	১৯৩৭	পূর্বাশা প্রাইভেট লিমিটেড
নিশীথ নগরী	১৯৩৮	গুপ্ত ফ্রেন্ডস এ্যান্ড কোম্পানি
ধূলিধূসর	১৯৩৮	প্রথম সংস্করণ প্রকাশকের নাম নেই
কুড়িয়ে ছড়িয়ে	১৯৪৬	বেঙ্গল পাবলিশার্স
সামনে চড়াই	১৯৪৭	স্টুডেন্টস বুক সাপ্লাই
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	১৯৫২	নাভানা
স্বনির্বাচিত গল্প	১৯৫৪	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি
সপ্তপদী	১৯৫৫	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি
জলপায়রা	১৯৫৮	ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রেমই ধন্বন্তরি	১৯৫৯	নিউ স্ক্রিপ্ট
যখন বাতাসে নেশা	১৯৬২	উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

ক্বচিৎ কখনো	১৯৬২	বাক্‌সাহিত্য
শ্রাবণে ফাল্গুনে	১৯৬৫	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
সালঙ্করা	১৯৬৬	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
হাতে হাত রাখো	১৯৬৭	উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
		(গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। গ্রন্থাগারে নথিভুক্ত হওয়ার সাল ১৯৬৭)
অষ্টপ্রহর	১৯৭৩	মিত্র ও ঘোষ
সবুজে সোনায়	১৯৭৫	উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
নির্বাচিতা	১৯৬৭	এম সি. সরকার
সংসার সীমান্তে	১৯৭৭	সাহিত্যম্

পরিশিষ্ট ॥ তিন

বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচিত গল্পসমূহ
(পাশে উল্লেখিত খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা; ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড,
কলকাতা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।)

গল্পের নাম	**গল্প সমগ্রর খণ্ড / পৃষ্ঠা**
অনাবশ্যক	১খ / পৃ: ১১৩
অমীমাংসিত	২খ/ পৃ: ১০৬
অমোঘ	২খ/ পৃ: ৫৮
অরণ্যপথ	২খ/ পৃ: ৪০
অরণ্য স্বপ্ন	১খ/পৃ: ১২৭
আদ্যাক্ষর	৩খ/ পৃ: ১
আয়না	২খ/ পৃ: ২৪৭
একাট রাত্রি	২খ/ পৃ:৬৯
একটি অমানুষিক আত্মহত্যা	২খ/ পৃ:১৭৪
এটম	১খ/পৃ:১৭৪
কল্পনায়	১খ/পৃ: ১৯৭
ক্বচিং কখনো	৩খ/পৃ: ৯১
কুয়াশায়	১খ/পৃ: ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

কালো জল	৩খ/পৃ: ৯৮
চুরি	২খ/পৃ: ১৮১
জনৈক কাপুরুষের কাহিনী	২খ/ পৃ:২২১
জ্বর	২খ/ পৃ:১৬৫
জলপায়রা	২খ/ পৃ:১৪৫
তেলেনা পোতা আবিষ্কার	২খ/ পৃ:১৯৪
থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ	২খ/ পৃ:১১৯
দাতা	২খ/ পৃ:২৬০
দিবা স্বপ্ন	২খ/ পৃ:১২
দৃষ্টি	২খ/ পৃ:১৫৩
নিরুদ্দেশ	১খ/পৃ: ৩০৩
নিশাচর	২খ/ পৃ:১১২
পটভূমিকা	২খ/ পৃ:২০১
পরিত্রাণ	২খ/ পৃ:১০০
পরোপকার	২খ/ পৃ:২২৮
পান্থশালা	১খ/পৃ: ৩১০
পাশাপাশি	১খ/ পৃ:২৩৮
পাহাড়	২খ/ পৃ:২৭৬
পিস্তল	২খ/ পৃ:১৮৬
পুনর্মিলন	১খ/পৃ: ১৭৬
পুন্নাম	১খ/ পৃ:৫
পুনরুক্তি	১খ/ পৃ:১৪০
পোনাঘাট পেরিয়ে	২খ/ পৃ:৯০
প্রতিবেশিনী	১খ/পৃ: ১৬২
প্রত্যাগত ২খ/ পৃ: ৫৮	১খ/ পৃ:২১
পঞ্চশর	২খ/ পৃ:২৮০
বাঘ	৩খ/পৃ: ৫০
বিদেশিনী	৩খ/পৃ: ২৯৮
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে	১খ/ পৃ:৬৫
ব্যাহত রচনা	২খ/ পৃ:৯৭
বৃষ্টি	২খ/ পৃ:২৮
ভস্মশেষ	২খ/পৃ: ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যতের ভার	২খ/ পৃ:১
ভিজে বারুদ	২খ/ পৃ:২৬৭
ভির	২খ/ পৃ:১২৫
ভূমিকম্প	২খ/ পৃ:৬৪
মন্দির	৩খ/পৃ:১৬১
মহানগর	২খ/ পৃ:৫১
মল্লিকা	২খ/ পৃ:২৩৩
মৃত্তিকা	১খ/ পৃ:২১৩
মোট বারো	১খ/ পৃ:২৪৭
যাত্রাপথ	২খ/ পৃ:৮৩
যূথিকা	২খ/পৃ: ২৫৪
রোদ	৩খ/ পৃ:১১২
লজ্জা	১খ/ পৃ:৬৫
লাল তারিখ	১খ/ পৃ:১১৯
লেভেল ক্রসিং	১খ/ পৃ:২৯৬
শকুন্তলা	১খ/ পৃ:৬৩
শরতের প্রথম কুয়াশা	২খ/ পৃ:৯৩
শবযাত্রা	১খ/পৃ:২৬৯
শুরু ও শেষ	১খ/ পৃ:২৫৪
শুধু কেরাণী	১খ/ পৃ:১
শৃঙ্খল	২খ/পৃ: ১৩৬
সত্যমিথ্যা	১খ/ পৃ:৮৩
স্টোভ	২খ/ পৃ:১৫৮
সংক্রান্তি	১খ/ পৃ:৫৫
সংসার সীমান্তে	১খ/ পৃ:৭৪
সামনে চড়াই	১খ/ পৃ:৩১৮
সাগর সঙ্গম	১খ/ পৃ:২৫

Dhaka University Institutional Repository

সহযাত্রিনী	২খ/ পৃ:৮৮
সিদ্ধিকল্প	২খ/পৃ: ৭৬
হয়তো	১খ/পৃ: ৪১

পরিশিষ্ট ॥ চার

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের পুত্তলিকা,*(কলকাতা, ১৯৯৯)

২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কল্লোল-গোষ্ঠী,* (কলকাতা, ১৯৯৫)

৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ,* (কলকাতা, ১৩৯৫)

৪। অশ্রুকুমার শিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* (কলকাতা, ১৯৮৮)

৫। আনোয়ার পাশা : রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা, (ঢাকা, ১৩৭৬)

৬। আবুল কাসেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্য শ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য,* (ঢাকা, ১৯৮৮)

৭। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস,* (কলকাতা, ১৩৭২)

৮। এম, এম, আকাশ : *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি : সাম্প্রতিক প্রবণতাসমূহ,* (ঢাকা, ১৯৮৭)

৯। কাল মার্কস : *ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জি,* (মস্কো, ১৯৭১)

১০। কাজী খলিকুজ্জামান : *বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বিকাশ : পথের সন্ধানে,* (ঢাকা, ১৯৯৩)

১১। কামরুদ্দীন আহমেদ : *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ,* (ঢাকা, ১৩৮২)

১২। ক্ষেত্র গুপ্ত : *রবীন্দ্র গল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ,* (কলকাতা, ১৯৮৪)

১৩। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প,* (কলকাতা, ১৯৮৯)

১৪। *জগদীশ ভট্টাচার্য* : বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প,(কলকাতা, ১৯৯৯)

১৫। জীবেন্দ্র সিংহরায় : *কল্লোলের কাল,* (কলকাতা, ১৯৮৭)

১৬। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সম্পাদক) : *গল্প লেখার গল্প,* (কলকাতা, ১৩৫০)

Dhaka University Institutional Repository

১৭। নাজমুল করিম : *চেঞ্জিং সোসাইটি ইন ইনডিয়া পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ*, (ঢাকা, ১৯৯৬)

১৮। নান্টু রায় (সম্পাদক) : *ভারত বিচিত্রা*, (ঢাকা, মে-২০০৫)

১৯। নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদনা): *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, (কলকাতা, ১৯৮৯)

২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প, (কলকাতা, ১৩৬৩)

২১। নীরদচন্দ্র চৌধুরী : *বাঙালী জীবনে রমণী*, (কলকাতা, ১৯৮৮)

২২। প্রমথনাথ বিশী : *বঙ্কিম সরণী*, (কলকাতা, ১৩৭৩)

২৩। প্রমথনাথ বিশী : *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*,(কলকাতা,১৩১৮)

২৪। বুদ্ধদেব বসু : *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮২)

২৫। বিনয় ঘোষ : *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, (ঢাকা, ১৯৬৮)

২৬। বিনয় ঘোষ : *বাংলার নব জাগৃতি*, (কলকাতা, ১৩৫৫)

২৭। ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, (কলকাতা, ১৯৮৯)

২৮। মুহম্মদ ইদরিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, (ঢাকা, ১৯৮৫)

২৯। মুহম্মদ ইদরিস আলী : *আমাদের উপন্যাসের বিষয়চেতনা বিভাগোত্তর কাল*, (ঢাকা, ১৯৮৮)

৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *গল্পগুচ্ছ*, (কলকাতা, ১৯৬৪)

৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রবীন্দ্র- রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, (কলকাতা, ১৩৪৯),

৩২। রতন সিদ্দিকী (সম্পাদক) : *কালান্তর*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ঢাকা, ১৯৯৭)

৩৩। শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প*, (কলকাতা, ১৯৮৩)

৩৪। সেলিনা হোসেন (সম্পাদক) : একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯ : বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৯১)

৩৫। সুধাকর চট্টোপাধ্যায় : *কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*, (কলকাতা, ১৩৮৯)

৩৬। সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (ঢাকা, ১৯৮৫)

৩৭। সৈয়দ আকরম হোসেন : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, (ঢাকা, ১৯৮১)

৩৮। সুমিতা চক্রবর্তী, *প্রেমেন্দ্র মিত্র*, (কলকাতা,১৯৯৮)

৩৯। হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদক) : *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা* ,(ঢাকা ,১৯৯৭)